শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতি

বিশ্বনাথ দে
সম্পাদিত

পরিবেশক
অনির্বাণ প্রকাশনী
৩এ, গঙ্গাধরবাবু লেন
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
১লা আষাঢ় । ১৩৭১

প্রকাশক
নির্মলকুমার সাহা
১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
অজিতকুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা

ব্লক, চিত্র ও প্রচ্ছদ মুদ্রন
ন্যাশনাল হাফটোন কোম্পানী
৬৮, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

শ্রীঅরবিন্দ-অনুরাগিণী লোকমাতা নিবেদিতার
স্মৃতির উদ্দেশে—

সূচীপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অরবিন্দ ঘোষ : ১
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় : মানস সরোবরে অরবিন্দ : ১৭

শ্রদ্ধার্ঘ্য :

নিশিকান্ত : তর্পণ : ৯
দিলীপকুমার রায় : তর্পণ : ১১
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী : অর্ঘ্য : ১৪

স্মৃতিকথা :

চারুচন্দ্র দত্ত : যেমন তাঁকে দেখেছি : ১৯
দিলীপকুমার রায় : শ্রীঅরবিন্দ : ২৩
আর. এন. পাটকার : বরোদায় শ্রীঅরবিন্দ : ৫৫
বাসন্তী চক্রবর্ত্তী : অরোদাদার কথা : ৫৭
দীনেন্দ্রকুমার রায় : অরবিন্দ প্রসঙ্গে : ৫৮
অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য : একদিনের ঘটনা : ৬৭
বলাই দেববর্মা : শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতি : ৭১
সুধীরকুমার সরকার : শ্রীঅরবিন্দ সান্নিধ্যে : ৭৫
নলিনীকান্ত গুপ্ত : আলিপুর কোর্টে : ৮৩
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : আলিপুর কোর্টে : ৮৫
অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : প্রথম দর্শন : ৮৭
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী : আমার স্মৃতিকথা : ৮৯
মতিলাল রায় : পণ্ডিচেরীতে : ৯৪
সুধীরঞ্জন দাস : শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতিকথা : ১৪৬
সাহানা দেবী : স্বদেশী যুগের স্মৃতিকথা : ১৬০
নলিনীকান্ত সরকার : মহাপ্রয়াণ : ২২০
নীরদবরণ : এই যে আমি, আমি এখানে : ২৪৫
ডাঃ প্রশান্ত সান্যাল : মহানির্বাণ : ২৮১

জীবনকথা :

বিপিনচন্দ্র পাল : বন্দেমাতরম্-এর অরবিন্দ : ৬৮

নগেন্দ্রকুমার গুহরায় : বন্দেমাতরম্ : ৭৩

শিশিরকুমার মিত্র : বোমার মামলার একটি ঘটনা : ৭৪

ভূপেন্দ্রনাথ বসু : ঋষি অরবিন্দ : ৯৬

প্রমোদকুমার সেন : ভারতের জাতীয় নেতারূপে শ্রীঅরবিন্দ : ১১৮

মহেন্দ্রনাথ সরকার : শ্রীঅরবিন্দের সাধনা : ১৩৯

বিনয়কুমার সরকার : অরবিন্দ ঘোষ : ১৪১

মণি বাগচী : স্বদেশী আন্দোলনে নিবেদিতা ও শ্রীঅরবিন্দ : ১৮৪

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : শ্রীঅরবিন্দ : ২১৪

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ : শিক্ষাবিদ শ্রীঅরবিন্দ : ২১৮

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় : শ্রীঅরবিন্দ-কথা : ২২৬

অমিতাভ বসু : 'কারাকাহিনী' ২৩৯

সুধা বসু : ২৪শে এপ্রিল : ২৭৫

এই প্রসঙ্গে

মহাবিপ্লবী ও পরম যোগী ভারতবরেণ্য মহামনীষী শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব সমাসন্ন। সেই উপলক্ষে প্রকাশিত হলো 'সাহিত্যম্'-এর শ্রদ্ধার্ঘ্য এই 'শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতি'। দশ বছর আগে, ১৩৬৮ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষপূর্তির সময় আমার সম্পাদনায় এই স্মৃতি পর্যায়ের প্রথম গ্রন্থ 'রবীন্দ্র স্মৃতি' প্রকাশিত হয়েছিল, সংকলনখানি এখনও জনসমাদৃত। যদিও ইতিমধ্যে ওই 'রবীন্দ্র স্মৃতি' নামেই আর একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে গেছে (দীর্ঘ দশ বছর ধরে একটি বহুল প্রচলিত গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও আবার ওই একই নামে কি করে আর একটি বই প্রকাশ হয় তা আমার বোধগম্যের বাইরে)। 'রবীন্দ্র স্মৃতি'র পরে আমার সম্পাদনায় ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে 'নজরুল স্মৃতি' এবং তার পরে-পরে 'সুভাষ স্মৃতি', 'শরৎ স্মৃতি' প্রকাশিত হয়েছে। আমার সম্পাদিত 'স্মৃতি' পর্যায়ের গ্রন্থগুলি পাঠক সমাজে অভূতপূর্ব সমাদর লাভ করার জন্ম বিভিন্ন প্রকাশক মহলে ওই একই ধরনের 'স্মৃতি' পর্যায়ের গ্রন্থ প্রকাশ করার প্রচেষ্টা দেখা গেছে। ভালো বই প্রকাশ হওয়া সব সময়েই আনন্দের বিষয়। কিন্তু একই ধরনের বই একই নামে প্রকাশ করাটা কি ধরনের শালীনতাবোধ তা আমার জানা নেই। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকের চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন 'কী বিচিত্র এই দেশ!'—আমি সামান্য পাঠান্তর করে বলতে পারি, 'কী বিচিত্র এই বাংলাদেশ, আর কী বিচিত্র এই বাংলাদেশের কিছু প্রকাশকের মনোভাব!'—'স্মৃতি' পর্যায়ে গ্রন্থ প্রকাশ করার মতো বাংলাদেশের মনীষীর অভাব নেই, তবু আমার প্রণীত সংকলনগুলিকে পায়ে-পায়ে অনুসরণ করে গ্রন্থ প্রণয়ন করার স্পৃহা বুদ্ধিমান মানুষের কি করে হয় তা আমি বুঝি না। সতর্ক পাঠক হয়তো লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, 'স্মৃতি' পর্যায়ে আমার তু'টি গ্রন্থ 'স্মৃতি' নাম না দিয়ে আমি 'বিচিত্রা' নাম দিয়েছি, বই তু'টির পুরো নাম 'সুকান্ত বিচিত্রা' ও 'মানিক বিচিত্রা'। এই নাম বদলের কারণ হলো আমাদের অজান্তেই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ও সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়ে 'স্মৃতি' পর্যায়ের তুটি সংকলন-গ্রন্থ অন্যত্র প্রস্তুত হচ্ছিলো এবং আমাদের বইয়ের ছাপা অনেক দূর এগিয়ে যাবার পর বই তুটি প্রকাশিত হয়। সে জন্ম 'বিচিত্রা' নাম দিয়ে আমরা আমাদের বই তুটি প্রকাশ করি। ছাপার কাজ না এগুলে ওই বই তুটি অবশ্যই দু-

আমরা প্রকাশ করতাম না, একথা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি শুনছি সামান্য একটু নামের রদ-বদল করে নজরুল ও সুভাষচন্দ্রের ওপরও দুটি একই ধরনের সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। সে জন্য আমি আশা করছি শ্রীঅরবিন্দের ওপরও অদূর ভবিষ্যতে 'স্মৃতি' পর্যায়ে আর একটি গ্রন্থ হয়তো প্রকাশিত হয়ে যাবে।

শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে এই সংকলন-গ্রন্থ সম্পাদনা করাটা আমি একটি মহান কর্তব্য হিসাবেই গ্রহণ করেছিলাম। তাই অত্যন্ত নিষ্ঠা নিয়ে এই সংকলন-গ্রন্থ প্রণয়ন করার চেষ্টা করেছি। কতোখানি সফল হয়েছি, তা আমার অনুরাগী পাঠকগণই বিচার করবেন।

বাংলাদেশে এমন একটি সময় ছিলো যখন 'বয়কট' নীতির প্রবর্তক স্বদেশী আন্দোলনের পরম পুরোহিত শ্রীঅরবিন্দের আদর্শে বাংলার তরুণ-যুবসমাজ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তারপর হঠাৎই একদিন আকস্মিকভাবে সেই মহর্ষি বৃহত্তর জীবন-জিজ্ঞাসায় আরো অনেক বৃহত্তর পথের সন্ধানে বাংলাদেশ ছেড়ে পণ্ডিচেরীতে চলে যান ও জনতার চোখের অন্তরালে যোগী-জীবন যাপন করতে প্রবৃত্ত হন।

এই সংকলনে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক ও যোগী-জীবনের সহকর্মী ও শিষ্য-বৃন্দের অনেক লেখা থেকে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিকের ছবি পাওয়া যাবে, জানা যাবে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের নানা অন্তরঙ্গ ঘটনাবলী। পুরোপুরি শ্রীঅরবিন্দ মানুষটিকে যাতে বোঝা যায়, সেই চেষ্টাই আমি করেছি এই সংকলনের লেখাগুলি নির্বাচনের সময়। এখন, পাঠকদের যদি ভালো লাগে এবং তাঁরা যদি উৎসাহিত হয়ে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কিত মূল প্রামাণ্য-গ্রন্থগুলি পাঠ করতে প্রবৃত্ত হন, তাহলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করবো।

শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতি সংকলনের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নকালে আমার পরম স্নেহাস্পদ সন্ধ্যা আইচ্ ও শেখর চৌধুরী নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। আর এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই 'সাহিত্যম্'-এর কর্ণধার শ্রীনির্মলকুমার সাহাকে, যাঁর কাছে শুধু এই ব্যাপারে নয়, আরো নানা বিষয়ে আমি আজীবনকাল ঋণী থাকবো।

বিশ্বনাথ দে

অরবিন্দ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনেক দিন মনে ছিল অরবিন্দ ঘোষকে দেখব। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। তাঁকে দেখে যা আমার মনে জেগেছে সেই কথা লিখতে ইচ্ছা করি। খৃস্টান শাস্ত্রে বলে বাণীই আদ্যাশক্তি। সেই শক্তিই সৃষ্টিরূপে প্রকাশ পায়। নবযুগ নবসৃষ্টি, সে কখনও পঞ্জিকার তারিখের ফর্দ থেকে নেমে আসে না। যে যুগের বাণী চিন্তায় কর্মে মানুষের চিত্তকে মুক্তির নূতন পথে বাহির করে তাকেই বলি নবযুগ।

আমাদের শাস্ত্রে মন্ত্রের আদিতে ওঁ, অন্তেও ওঁ। এই শব্দটিকেই পূর্ণের বাণী বলি। এই বাণী সত্যের অয়মহং ভো—কালের শঙ্খকুহরে অসীমের নিঃশ্বাস। ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের বান ডেকে যে যুগ অতল ভাবসমুদ্র থেকে কলশব্দে ভেসে এল তাকে বলি য়ুরোপের এক নবযুগ। তার কারণ এ নয়, সেদিন ফ্রান্সে যারা পীড়িত তারা পীড়নকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই বাধালে। তার কারণ, সেই যুগের আদিতে ছিল বাণী। সে বাণী কেবলমাত্র ফ্রান্সের আশু রাষ্ট্রিক প্রয়োজনের খাঁচায় বাঁধা, খবরের কাগজের মোড়কে ঢাকা, ইস্কুল-বইয়ের বুলি আওড়ানো টিয়ে পাখী নয়। সে ছিল মুক্তপক্ষ আকাশবিহারী বাণী, সকল মানুষকেই পূর্ণতর মনুষ্যত্বের দিকে সে পথ-নির্দেশ করে দিয়েছিল।

একদা ইতালির উদ্‌বোধনের তৎকালীন দূত ছিলেন মাট্‌সীনি, গারিবাল্ডি। তাঁরা যে মন্ত্রে ইতালিকে উদ্ধার করলেন সে ইতালির তৎকালীন শত্রু-বিনাশের দ্রুতফলদায়ক মারণ উচাটন পিশাচ-মন্ত্র নয় —সমস্ত মানুষের নাগপাশ-মোচনের সে গরুড়মন্ত্র, নারায়ণের আশীর্বাদ নিয়ে মর্ত্যে অবতীর্ণ। এইজন্যে তাকেই বলি বাণী। আঙুলের আগায় যে স্পর্শবোধ তার দ্বারা অন্ধকারে মানুষ ঘরের প্রয়োজন চালিয়ে নিতে পারে। সেই স্পর্শবোধ তারই নিজের। কিন্তু সূর্যের আলোকে

নিখিলের যে স্পর্শবোধ আকাশে আকাশে বিস্তৃত তা প্রত্যেক প্রয়োজনের উপযোগী অথচ প্রত্যেক প্রয়োজনের অতীত। সেই আলোককেই বলি বাণীর রূপক।

সায়ান্স একদিন য়ুরোপে যুগান্তর এনেছিল। কেন, বস্তুজগতে শক্তির সন্ধান জানিয়েছিল ব'লে না, জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের অন্ধতা ঘুচিয়েছিল ব'লে। বস্তুসত্যের বিশ্বরূপ স্বীকার করতে সেদিন মানুষ প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে। আজ সায়ান্স সেই যুগ পার করে দিয়ে আর-এক নবতর যুগের সম্মুখে মানুষকে দাঁড় করালে। বস্তুরাজ্যের চরম সীমানায় মূল তত্ত্বের দ্বারে তার রথ এল। সেখানে সৃষ্টির আদিবাণী। প্রাচীন ভারতে মানুষের মন কর্মকাণ্ড থেকে যেই এল জ্ঞানকাণ্ডে, সঙ্গে সঙ্গে এল সৃষ্টির যুগ। মানুষের আচারকে লঙ্ঘন করে আত্মাকে ডাক পড়ল। সেই আত্মা যন্ত্রচালিত কর্মের বাহন নয়, আপন মহিমাতে সে সৃষ্টি করে। সেই যুগে মানুষের জাগ্রত চিত্ত বলে উঠেছিল, চিরন্তনের মধ্যে বেঁচে ওঠাই হল বেঁচে যাওয়া, তার উল্টোই মহতী বিনষ্টি। সেই যুগের বাণী ছিল: য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

আর একদিন ভারতে উদ্‌বোধনের বাণী এল। সমস্ত মানুষকে ডাক পড়ল, বিশেষ সংকীর্ণ পরামর্শ নিয়ে নয়, যে মৈত্রী মুক্তির পথে নিয়ে যায় তারই বাণী নিয়ে। সেই বাণী মানুষের চিত্তকে তার সমগ্র উদ্‌বোধিত শক্তির যোগে বিপুল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করলে।

বাণী তাকেই বলি, যা মানুষের অন্তরতম পরম অব্যক্তকে বাহিরে অভিব্যক্তির দিকে আহ্বান করে আনে, যা উপস্থিত প্রত্যক্ষের চেয়ে অনাগত পূর্ণতাকে বাস্তবতর সত্য বলে সপ্রমাণ করে। প্রকৃতি পশুকে নিছক দিনমজুরি করতেই প্রত্যহ নিযুক্ত করে রেখেছে। সৃষ্টির বাণী সেই সংকীর্ণ জীবিকার জগৎ থেকে মানুষকে এমন জীবনযাত্রায় উদ্ধার করে দিলে যার লক্ষ্য উপস্থিত কালকে ছাড়িয়ে যায়। মানুষের কানে এল: টিকে থাকতে হবে, এ কথা তোমার নয়; তোমাকে বেঁচে

থাকতে হবে, সেজন্যে মরতে যদি হয় সেও ভালো। প্রাণযাপনের বদ্ধ গণ্ডির মধ্যে যে আলো জ্বলে সে রাত্রির আলো ; পশুদের তাতে কাজ চলে। কিন্তু মানুষ নিশাচর জীব নয়।

সমুদ্রমন্থনের দুঃসাধ্য কাজে বাণী মানুষকে ডাক দেয় তলার রত্নকে তীরে আনার কাজে। এতে করে বাইরে সে যে সিদ্ধি পায় তার চেয়ে বড় সিদ্ধি তার অন্তরে। এ যে দেবতার কাজে সহযোগিতা। এতেই আপন প্রচ্ছন্ন দৈবশক্তির 'পরে মানুষের শ্রদ্ধা ঘটে। এই শ্রদ্ধাই নূতন যুগকে মর্ত্যসীমা থেকে অমর্ত্যের দিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই শ্রদ্ধাকে নিঃসংশয়ে স্পষ্টভাবে দেখা যায় তাঁর মধ্যে যাঁর আত্মা স্বচ্ছ জীবনের আকাশে মুক্ত মহিমায় প্রকাশিত। কেবলমাত্র বুদ্ধি নয়, ইচ্ছাশক্তি নয়, উদ্যম নয়, যাঁকে দেখলে বোঝা যায় বাণী তাঁর মধ্যে মূর্তিমতী।

আজ এইরূপ মানুষকে যে একান্ত ইচ্ছা করি তার কারণ, চার দিকেই আজ মানুষের মধ্যে আত্ম-অবিশ্বাস প্রবল। এই আত্ম-অবিশ্বাসই আত্মঘাত। তাই রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধিই আজ আর-সকল সাধনাকেই পিছনে ঠেলে ফেলেছে। মানুষ বস্তুর মূল্যে সত্যকে বিচার করছে। এমনই করে সত্য যখন হয় উপলক্ষ্য, লক্ষ্য হয় আর-কিছু, তখন বিষয়ের লোভ উগ্র হ'য়ে ওঠে, সে লোভের আর তর্ সয় না। বিষয়-সিদ্ধির অধ্যবসায়ে বিষয়বুদ্ধি আপন সাধনার পথকে যতই সংক্ষিপ্ত করতে পারে ততই তার জিত। কারণ, তার পাওয়াটা হল সাধনা পথের শেষ প্রান্তে। সত্যের সাধনায় সর্বক্ষণেই পাওয়া। সে যেন গানের মতো, গাওয়ার অন্তে সে গান নয়, গাওয়ার সমস্তটার মধ্যেই। সে যেন ফলের সৌন্দর্য, গোড়া থেকেই ফুলের সৌন্দর্যে যার ভূমিকা। কিন্তু লোভের প্রবলতায় সত্য যখন বিষয়ের বাহন হ'য়ে উঠল মহেন্দ্রকে তখন উচ্চৈঃশ্রবার সহিসগিরিতে ভর্তি করা হল, তখন সাধনাটাকে ফাঁকি দিয়ে সিদ্ধিকে সিঁধ কেটে নিতে ইচ্ছে করে, তাতে সত্য বিমুখ হয়, সিদ্ধি হয় বিকৃত।

সুদীর্ঘ নির্বাসন ব্যাপ্ত করে রামচন্দ্রের একটি সাধনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। যতই দুঃখ পেয়েছেন ততই গাঢ়তর করে উপলব্ধি করেছেন সীতার প্রেম। তাঁর সেই উপলব্ধি নিবিড়ভাবে সার্থক হয়েছিল যেদিন প্রাণপণ যুদ্ধে সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করে আনলেন।

কিন্তু রাবণের চেয়ে শত্রু দেখা দিল তাঁর নিজেরই মধ্যে। রাজ্যে ফিরে এসে রামচন্দ্র সীতার মহিমাকে রাষ্ট্রনীতির আশু প্রয়োজনে খর্ব করতে চাইলেন,—তাঁকে বললেন, সর্বজনসমক্ষে অগ্নিপরীক্ষায় অনতি-কালেই তোমার সত্যের পরিচয় দাও। কিন্তু এক মুহূর্তে যাদুর কৌশলে সত্যের পরীক্ষা হয় না, তার অপমান ঘটে। দশ জন সত্যকে যদি না স্বীকার করে তবে সেটা দশ জনেরই দুর্ভাগ্য। সত্যকে যে সেই দশ জনের ক্ষুদ্র মনের বিকৃতি অনুসারে আপনার অসম্মান করতে হবে এ যেন না ঘটে। সীতা বললেন: আমি মুহূর্তকালের দাবি মেটাবার অসম্মান মান্‌ব না, চিরকালের মতো বিদায় নেব। রামচন্দ্র এক নিমিষে সিদ্ধি চেয়েছেন, এক মুহূর্তে সীতাকে হারিয়েছেন। ইতিহাসের যে উত্তরকাণ্ডে আমরা এসেছি এই কাণ্ডে আমরা তাড়াতাড়ি দশের-মন-ভোলানো সিদ্ধির লোভে সত্যকে হারাবার পালা আরম্ভ করেছি।

বন্ধু ক্ষিতিমোহন সেনের দুর্লভ কাব্যরত্নের ঝুলি থেকে একদিন এক পুরাতন বাউলের গান পেয়েছিলুম। তার প্রথম পদটি মনে পড়ে:

নিঠুর গরজী, তুই কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে।

যে মানসমুকুলের বিকাশ সাধনাসাপেক্ষ, দশের সামনে অগ্নিপরীক্ষায় তার পরিণত সত্যকে আশুকালের গরজে সপ্রমাণ করতে চাইলে, আয়োজনের ধুমধাম ও উত্তেজনাটা থেকে যায়, কিন্তু তার পিছনে মানসটাই অন্তর্ধান করে।

এই লোভের চাঞ্চল্যে সর্বত্রই যখন সত্যের পীড়ন চলেছে তখন এর

বিরুদ্ধে তর্কযুক্তিকে খাড়া করে ফল নেই। মানুষকে চাই, যে মানুষ বাণীর দূত, সত্যসাধনায় সুদীর্ঘকালেও যাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না, সাধনপথের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সত্যেরই অমৃত পাথেয় যাঁকে আনন্দিত রাখে। আমরা এমন মানুষকে চাই যিনি সর্বাঙ্গীণ মানুষের সমগ্রতাকে শ্রদ্ধা করেন। এ কথা গোড়াতেই মেনে নিতে হবে যে, বিধাতার কৃপাবশতই সর্বাঙ্গীণ মানুষটি সহজ নয়, মানুষ জটিল। তার ব্যক্তিরূপের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহুবিচিত্র। কোনো বিশেষ অপ্রশস্ত আদর্শের মাপে ছেঁটে একঝোঁকাভাবে তাকে অনেক দূর বাড়িয়ে তোলা চলে। মানুষের মনটাকে যদি চাপা দিই তবে চোখ বুজে গুরুবাক্য মেনে চলার ইচ্ছা তার সহজ হতে পারে। বুঝিয়ে বলার পরিশ্রম ও বিলম্বটাকে খাটো করে দিতে পারলে মনের শক্তি বাড়ানোর চেয়ে মনের বোঝা বাড়ানো, বিদ্যালাভের পরিবর্তে ডিগ্রি-লাভ, সহজ হয়। জীবনযাত্রাকে উপকরণশূন্য করতে পারলে তার বহনভার কমে আসে। তবুও সহজের প্রলোভনে সবচেয়ে বড়ো কথাটা ভুললে চলবে না যে, আমরা মানুষ, আমরা সহজ নই।

তিব্বতে মন্ত্রজপের ঘূর্ণিচাকা আছে। এর মধ্যে মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় বলেই আমাদের মনে অবজ্ঞা আসে। সত্যকার মন্ত্রজপ একটুও সহজ নয়। সেটা শুদ্ধমাত্র আচার নয়, তার সঙ্গে আছে চিত্ত, আছে ইচ্ছাশক্তির একাগ্রতা। হিতৈষী এসে বললেন: সাধারণ মানুষের চিত্ত অলস, ইচ্ছাশক্তি দুর্বল, অতএব মন্ত্রজপকে সহজ করবার খাতিরে ঐ শক্ত অংশগুলো বাদ দেওয়া যাক, কিছু না-ভেবে না-বুঝে শব্দ আউড়ে গেলেই সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট ; সজীব ছাপাখানার মতো প্রত্যহ কাগজে হাজার বার নাম লিখলেই উদ্ধার। কিন্তু সহজ করবার মধ্যেই যদি বিশেষ গুণ থাকে তবে আরও সহজই বা না করব কেন? চিত্তের চেয়ে মুখ চলে বেগে, মুখের চেয়ে চাকা। অতএব চলুক চাকা, মরুক চিত্ত।

কিন্তু মানুষের পন্থা সম্বন্ধে যে গুরু বলেন 'দুর্গং পথস্তৎ' তাঁকে

নমস্কার করি। চরিতার্থতার পথে মানুষের সকল শক্তিকেই আমরা দাবি করব। বহুলতা পদার্থটিই মন্দ এই মতের খাতিরে বলা চলে যে, ভেলা জিনিসটাই ভালো, নৌকোটা বর্জনীয়। এক সময়ে অত্যন্ত সাদাসিধে ভেলায় অত্যন্ত সাদাসিধে কাজ চলত। কিন্তু মানুষ পারলে না থাকতে, কেননা সে সাদাসিধে নয়। কোনোমতে স্রোতের উপর বরাত দিয়ে নিজের কাজ সংক্ষেপ করতে তার লজ্জা। বুদ্ধি ব্যস্ত হয়ে উঠল, নৌকোয় হাল লাগালে, দাঁড় বানালে, পাল দিলে তুলে, বাঁশের লগি আনলে বেছে, গুণ টানবার উপায় করলে, নৌকোর উপর তার কর্তৃত্ব নানা গুণে নানা দিকে বেড়ে গেল, নৌকোর কাজও পূর্বের চেয়ে হল অনেক বেশী ও অনেক বিচিত্র। অর্থাৎ মানুষের তৈরী নৌকো মানবপ্রকৃতির জটিলতার পরিচয়ে কেবলই এগিয়ে চলল। আজ যদি বলি 'নৌকো ফেলে দিয়ে ভেলায় ফিরে গেলে অনেক দায় বাঁচে' তবে তার উত্তরে বলতে হবে : মনুষ্যত্বের দায় মানুষকে বহন করাই চাই। মানুষের বহুধা শক্তি, সেই শক্তির যোগে নিহিতার্থকে কেবলই উদ্‌ঘাটিত করতে হবে, মানুষ কোথাও থামতে পাবে না। মানুষের পক্ষে নাল্পেসুখমস্তি। অধিককে বাদ দিয়ে সহজ করা মানুষের নয়, সমস্তকে নিয়ে সামঞ্জস্য করাই তার। কলকারখানার যুগে ব্যবসা থেকে সৌন্দর্যবোধকে বাদ দিয়ে জিনিসটাকে সেই পরিমাণে সহজ করেছে, তাতেই মুনাফার বুভুক্ষা কুশ্রীতায় দানবীয় হয়ে উঠল। এ দিকে মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল ঘানি ঢেঁকি থেকে বিজ্ঞানকে চেঁচে মুছে ফেলায় ওগুলো সহজ হয়েছে, সেই পরিমাণে এদের আশ্রিত জীবিকা অপটুতায় স্থাবর হয়ে রইল; বাড়েও না, এগিয়ে চলেও না, নড়বড় করতে করতে কোনোমতে টিকে থাকে। তার পরে মার খেয়ে মরে শক্ত হাতের থেকে। প্রকৃতি পশুকেই সহজ করেছে, তারই জন্য স্বল্পতা; মানুষকে করেছে জটিল, তার জন্যে পূর্ণতা। সাঁতারকে সহজ করতে হয় বিচিত্র হাত-পা নাড়ার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে, হাঁটুজলে কাদা আঁকড়ে অল্প পরিমাণে হাত-পা ছুঁড়ে নয়।

ধনের আড়ম্বর থেকে গুরু আমাদের বাঁচান, দারিদ্র্যের সংকীর্ণতার মধ্যে ঘের দিয়ে নয়, ঐশ্বর্যের অপ্রমত্ত পূর্ণতায় মানুষের গৌরববোধকে জাগ্রত ক'রে।

এই সমস্ত কথা ভাবছি এমন সময় আমাদের ফরাসি জাহাজ এল পণ্ডিচেরী বন্দরে। ভাঙা শরীর নিয়ে যথেষ্ট কষ্ট করেই নামতে হল। তা হোক্। অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম—ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য ক'রে চেয়েছেন, সত্য ক'রে পেয়েছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বাল্‌বেন। কথা বেশি বল্‌বার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম তারি মধ্যে মনে হল, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। কোনো খরদস্তুর মতের উপদেবতার নৈবেদ্যরূপে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব করেন নি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা। মধ্যযুগের খৃস্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেন নি। আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন: যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাঁকে ব'লে এলুম, আত্মার বাণী বহন ক'রে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে: শৃণ্বন্তু বিশ্বে।

প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্‌বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তাঁর বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়—আজও তাঁকে মনে মনে ব'লে এলুম—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

শান্তিলি জাহাজ : ২৯শে মে, ১৯২৮

[প্রবাসী। শ্রাবণ, ১৩৩৫]

'বিশ্বভারতী'-র সৌজন্যে

যেদিন তিমির-বারিধি মথিল তব সাধনার উদয়াদিত্য,
জাগিল সোনার সরণী শোভিয়া বসুন্ধরার ধূলার তীর্থ।
সেদিন মুক্তি লভিল করাল পাষাণ কারার অযুত বন্দী,
তব অসিধার চেতনে খসিল অসুর-বাধার রুধির-গ্রন্থি॥
ধন্য হইল ধরণীকমল যুগল চরণ তপনে দীপ্ত,
বাজিল বিজয় শঙ্খবিষাণে নবজাগ্রত নিখিল চিত্ত।

সুনীল স্ফটিক মূর্ত নয়নে সুদূর সুপ্তি জাগর স্বপ্ন,
উদার ললাট অচল অভ্রে পূর্ণ শশীর বিকাশ লগ্ন।
গগনে পবনে নব উৎসব আলোক ধারায় বহে আনন্দ,
মন্ত্রমুগ্ধ জগৎজলধি উথলিয়া তোলে জ্যোতির্মন্ত্র॥
ধন্য হইল ধরণীকমল যুগল চরণ তপনে দীপ্ত,
বাজিল বিজয় শঙ্খবিষাণে নবজাগ্রত নিখিল চিত্ত।

খর্ববিজয়ী প্রগতি তোমার জিনিল সৌর শৈল জঙ্ঘা,
তুষার শুভ্র কুন্তলে দোলে কল্প কল্প বাহিনী গঙ্গা।
তব তপস্যা মিটালো মর্ত্যে ভীষণ মরুর উষর তৃষ্ণা,
ভাসিল অনল-সুধাতরঙ্গে পাতালবাসিনী কামিনী কৃষ্ণা॥
ধন্য হইল ধরণীকমল যুগল চরণ তপনে দীপ্ত,
বাজিল বিজয় শঙ্খবিষাণে নবজাগ্রত নিখিল চিত্ত।

যুগের প্রলয় প্রবল স্বননে হানে সংগ্রাম অবিশ্রান্ত,
তারি মাঝে তুমি ধ্যান-নিমগ্ন, হে নির্বিচল! হে মহাশান্ত

তারি মাঝে তুমি বিতরিছ তব শীতল করুণা সলিল বৃষ্টি,
চুম্বনে যার শ্মশান মেদিনী লভে জীবনের নবীন সৃষ্টি ॥
ধন্য হইল ধরণীকমল যুগল চরণ তপনে দীপ্ত,
বাজিল বিজয় শঙ্খবিষাণে নবজাগ্রত নিখিল চিত্ত।

তুমি ছাড়া আর কাহারো কণ্ঠে ধ্বনিয়া ওঠে না অভয় উক্তি,
তুমি ছাড়া আর কেহ তো আনে না তৃষিতের প্রাণে প্লাবন মুক্তি ;
হে অখিল গুরু ! হে বিশ্বকবি ! জপিয়া তোমার পাবক মন্ত্র,
বসুধাবক্ষে শত সন্তান বহ্নি-পুলক লভি' অতন্দ্র ॥
ধন্য হইল ধরণীকমল যুগল চরণ তপনে দীপ্ত,
বাজিল বিজয় শঙ্খবিষাণে নবজাগ্রত নিখিল চিত্ত।

এনেছ আকাশ-আলো তারাহারা চিত্তকুঞ্জে তুমি।
তোমারি বসন্তবরে পুষ্পসিন্ধু মোর বন্ধ্যা ভূমি।
জীবনে জানি না যারে—চেতনায় তুমি তার বাণী
বিছালে তোমার শান্ত কণ্ঠরাগে। তুমি দিলে আনি,
দুর্লভ নির্ভর-দীক্ষা বিদ্রোহ-উদ্ধত সুপ্রখর
মনের উষর-চূড়ে। জানিত না কভু যে নির্ঝর,
নম্রকান্তি স্নিগ্ধ প্রেম তুমি তারে শিখালে তোমার
নীলিমা-আনত স্নেহনেত্র-করুণার। বন্দনার
মন্দাকিনী নামালে—কঙ্কর যেথা ছিল ছত্রপতি।
তাই তো উচ্ছ্রিত অভিমান মোর মানিল প্রণতি
রাতুল চরণে তব। দিনে দিনে তিলে তিলে তুমি
আঁধার-বন্দিনী বনস্থলী মোর তুলিলে কুসুমি,
মলয়-দাক্ষিণ্যে তব। আবর্জনা করিলে নিয়োগ
সুরশস্য-উদ্বোধনে। সহযোগে ভুলালে বিয়োগ।
আশীর্বাদী প্রস্রবণে অনুর্বর বালুকাবিলাসী
প্রাণে মোর বাজালে তোমার প্রীতি-বাঁশি।
অকিঞ্চনে কাঞ্চনের কৃতার্থ উজ্জ্বল উপহার
দিলে কত হে পরশমণীশ্বর! তোমার ঝঙ্কার
কাঁপিয়া কাঁপিয়া তাই ধীরে…অতি ধীরে…মর্মমূলে
ঐশ্বর্যের আলোবাণী দিল আনি' তপস্যা বিপুলে।
অচিহ্নিত পথে ঋষি, চরণ তোমার অগ্রগামী
অভিযানে পথ কেটে চলিল অশঙ্কে দিনযামী

অন্তহীন ব্যাকুলতা-আলোকের পরম প্রয়োগে।
তাই তো সন্ধ্যার কূলে মিলিল তোমার মন্ত্রযোগে
নব অরুণিমা-ভাতি—অস্ত-সাগরের পারে যার
অম্বর-ওঙ্কার-ছটা আনিল অলক্ষ্য অঙ্গীকার।

ছন্দহারা পেল ছন্দ। তৃষাতুর অধর মানিল
তৃষার ইঙ্গিতপথে জ্বলে দিশা। অন্তর জানিল
অজানার লীলাভঙ্গি। মিলনের মোহানার ডাক
শুনিতে শিখিল ধীরে। ধূসর বর্ণের অনুরাগ
জ্বালিয়া রঞ্জিত রঙে তুমি দিব্যদ্যুতি নিরঞ্জন,
অন্ধ চক্ষে গাঢ় স্নেহে প্রলেপিলে তোমারি অঞ্জন
সুদূর-চাহনি-ভরা। বৃথা কলরব-সুখোৎসবে
কাটিত অলীক সমারোহে মোর দিন অগৌরবে।

মানব-জনম লভি' ছিলাম ভুলি' যে, দেবতার
শরণে নবীন দেবজন্ম-লাভ বিনা নাহি আর
লক্ষ্য এ-জীবনে। বৃথা যশ-মান-ধন-অহংকার
যদি চিরন্তন পানে নাহি ধায় স্বপ্ন-অভিসার।

অন্তরে প্রতীতি ছিল অমুকুলি'—যাদুকর, তারে
তুমি বনস্পতি-রূপ দিলে তব আশিস-ঝঙ্কারে
শাখানেত্রে ফুলমণি উদ্দীপিয়া মাধুরী-প্রদীপ
জ্বালায়ে আমার অনীশ্বর বনে হে আলো-অধিপ।
তারি অগ্রদৌত্যে মোর অন্ধকারে কিরণ-কাঁপন
প্রথম উঠিল জেগে নাশি' যুগান্তরের বাঁধন
রূপের কৃপাণ-বরে। খুলিল অযুত বাতায়ন
গগন-বঞ্চিত দেবালয়ে মোর, তাই নারায়ণ
জেনেছি তোমারে গুরু। "বন্ধু" বলি' দুঃসাহসে তাই
তোমারে বন্দিয়া তব গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা চাই।

তোমার মূরতি-মাঝে চাহে তাই নয়নের তৃষা
হেরিতে অমূর্ত সুধাসুন্দর সঙ্গীরে—চিরদিশা
লাবণ্য-লীলায় যার আপনারি তমিস্রার মাঝে
দেখি অস্তহীন রবিচ্ছবি—যার বহ্নিমন্ত্র বাজে
অঙ্গারের অন্তঃপুরে—কণ্টকের অন্তরালে যার
অদৃশ্য আনন্দকর পুষ্পলিপি লেখে অনিবার,—
অন্তরের বৃন্দাবনে রজ হয় যার পদধূলি
মন্থর বিষণ্ন আশা অশ্রুধন্য হ'য়ে ওঠে দুলি'।
তোমারে বরিলে তাই জানি নিষ্ঠা হবে অচঞ্চল,
অরবিন্দ-বাণীবরে স্বপ্নবৃন্তে ফুটিবে কমল।

আজি হ'তে
উনসপ্ততি বরষ-কাল আগে
আগস্টের পঞ্চদশ দিনে
এ-ভারতে বঙ্গদেশে
নেমেছিল একটি জ্যোতির শিখা অতি উর্ধ্ব হ'তে
কোকনদ-কোরকে আবৃত—
যে-দেহ আশ্রয় করি সেই জ্যোতিশিখা
ভুবনে ভূমিষ্ঠ হ'ল, সে-দেহেরে
তাই পিতামাতা দিল অরবিন্দ নাম।
আজি হ'তে উনসপ্ততি বরষ-কাল আগে
আগস্টের পঞ্চদশ দিন—
সেদিন কি দেবতারা অমরাবতীর যত বাতায়ন খুলি'
চেয়ে দেখেছিল এই বঙ্গদেশ পানে
ঈর্ষাতুর নয়ন বিস্ফারি'?
সেদিন কি অপ্সরীরা—রাগরঙ্গ-ভরা যত অপ্সরীর দল—
রঙ্গরাগ ত্যজি' ক্ষণকাল
নন্দনকানন হ'তে অজস্র কুসুমরাশি করিয়া চয়ন
করেছিল পুষ্পবৃষ্টি বঙ্গের আকাশে?
সৌরভে সৌরভে তার ব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছিল বঙ্গের বাতাস
হিমাদ্রি-কিরীট হ'তে দক্ষিণে যেথায় দোলে সমুদ্র সুনীল?
নাহি জানি—শুধু জানি একটি জ্যোতির শিখা
—অচঞ্চল অকম্পিত একটি জ্যোতির শিখা মহা উর্ধ্ব হ'তে—
সেদিন নামিয়াছিল নশ্বর এ ধরণীর বুকে

অমৃতের সন্দেশ বাহিয়া,
আগস্টের পঞ্চদশ দিনে
আজি হ'তে উনসপ্ততি বরষ-কাল আগে।
তাই আজি প্রয়োজন
—ভারতের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন—
হে ধীমান্! শ্রীমান্! শ্রীঅরবিন্দ!
তোমার আত্মার স্পর্শ,
অমর বাণীর তব।
হে চরম জ্ঞানের ভাণ্ডারী!
তোমার জ্ঞানের স্পর্শে
এ-ভারতে ফিরে পাবে মর্যাদা আপন
ফিরে পাবে আরবার আপন সম্বিৎ…
দেখিবে সে জননীর আসল স্বরূপ,
বুঝিবে সে জননী তাহার
নহে দীনা কাঙালিনী কিম্বা কারো করঙ্ক-বাহিনী—
হেরিবে সে তারে
রাজ-রাজেশ্বরীরূপে সমাসীনা রত্ন-সিংহাসনে…
হেরিবে সে এ-বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবেরা
জ্ঞান তরে ভক্তি তরে অমৃতের তরে
জননী-চরণে তার নত আসি' আত্মার রহস্যে
আর আত্ম-নিবেদনে;
সে-সম্বিতে ভারতের কোটি-কোটি মানব-মানবী
বুঝিবে এ-ভারতের স্থান কোথা বিশ্বের সভায়—
স্থান তার পরম জ্ঞানের গুরুরূপে,
অমৃতের পথের দিশারী
স্থান তার বিশ্ব-মানবের মাঝে গুরুর আসনে।…
হে শক্তি-আধার!

তোমার শক্তির স্পর্শে
ক্ষণিকের তরে যেন পাই মোরা অমৃত-নিশানা।
হে ধীমান্! শ্রীমান্! শ্রীঅরবিন্দ!
হে চরম জ্ঞানের ভাণ্ডারী!
হে দিশারী অমৃত-পথের!
আজি মনে পড়ে
পার্থিব মুক্তির তরে একদিন গিয়েছিলে ছুটে
ভারতের স্বাধীনতা তরে তুমি নেমেছিলে দারুণ সংগ্রামে,
কিন্তু আজি হে পরম শক্তির আধার!
মনে জানি—তোমার বাণীর মাঝে
রহিয়াছে ভারতের সত্য স্বাধীনতা;
প্রতীচ্যের মায়াবীরা যেই ইন্দ্রজালে
বেড়িয়াছে ভারতেরে
মন চিত্ত বেঁধেছে শৃঙ্খলে
আবৃত করেছে তার আত্মার ঐশ্বর্যে,
তোমার বাণীর স্পর্শে সে-শৃঙ্খল চূর্ণ হবে
তোমার মন্ত্রের আগে মায়াবীর সেই ইন্দ্রজাল
অবনত হবে দন্তে তৃণখণ্ড ধরি'
হীনতা-বোধের হবে সত্য অবসান,
ভারতের আত্মা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে তার ভাস্বর-গৌরবে।
ফিরে পাবে আপনার বিপুল সাম্রাজ্য
জ্ঞান ও প্রেমের—
আরো সুনিশ্চিত জানি,
তোমার বাণীর কাছে
ভারতের অমৃত-বাণীর কাছে
বিশ্ব-মানবেরে একদিন আসিতেই হবে—
আজ কিম্বা কাল কিম্বা অন্য কোনোদিন।

মানস সরোবরে অরবিন্দ

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

অমল-শুভ্র অরবিন্দ দেখিয়াছ কি? ভারত-মানস-সরোবরের প্রস্ফুটিত শতদল। এ ফিরিঙ্গীর আঁদাড়ে-পাঁদাড়ের লিলি ড্যাফোডিল নহে নির্গন্ধ! শুধু রঙের বাহার। কেবল বর্ণবিলাস!! দেবতার পূজায় লাগে না। যাগ-যজ্ঞে অনাবশ্যক। শুধু সাহেব বিবির সাহেবিয়ানার আড়ম্বর!! আমাদের এই অরবিন্দ জগৎদুর্লভ। হিমশুভ্র বর্ণে সাত্ত্বিকতার দিব্য শ্রী। বৃহৎ ও মহৎ!! হৃদয়ের প্রসারতায় বৃহৎ! হিন্দুর স্বধর্ম মহিমায় মহৎ!! এমন একটা গোটা ও খাঁটি মানুষ—এমন বজ্রের মত বহ্নিগর্ভ, আবার কমল পর্ণের ন্যায় কান্ত-পেলব, এ হেন জ্ঞানাঢ্য, এমন ধ্যান-সমাহিত মানুষ তোমরা ত্রিভুবনে খুঁজিয়া পাইবে না। দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য ইনি ফিরিঙ্গীর সভ্যতার মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়া, ইহলোকের সুখ-সাধ বিসর্জন দিয়া মায়ের-ছেলে-অরবিন্দ "বন্দেমাতরম্" পত্রের সম্পাদনায় ব্রতী হইয়াছেন। ইনি ঋষি বঙ্কিমের ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ স্বামী।

তোমরা ঐ ঢ্যাপঢেপে, প্যানপেনে, ফিরিঙ্গীর পোঁ-ধরা মদরতদের কাগজগুলা আর ছুঁইয়ো না। ঐ অরবিন্দ ভাব-বিন্যাস বুকে স্বদেশপ্রীতির বান ডাকাইয়া দিবে। মাতৃসেবার উত্তেজনা জাগাইবে। "বন্দেমাতরমের" কথা শুনিলে ভয় ঘুচিবে। বাহুতে বজ্রবল আসিবে। শিরায়-শিরায় অগ্নিস্রোত বহিবে। আর মরণকে মনে হইবে বসন্তবিলাস। সাপের ওঝারা মন্ত্র পড়িয়া যেমন বিষ ঝাড়ায়, বন্দেমাতরমের মন্ত্রে তেমনি ফিরিঙ্গীয়ানার বিষ-জর্জরতা ঘুচিয়া যাইবে। বুঝিবে ঐ কামান বন্দুক, ঐ জেল কারাগার, ঐ আইন আদালত, ঐ লাটবেলাট সব ফক্কিকার! ফিরিঙ্গীর হুড়ুম-হুড়ুম দুদিনেই অক্কা পাইবে।

বিলেতে লেখাপড়া শিখিলেও বিলিতি অবিদ্যার পুতনা মায়া অরবিন্দকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। অরবিন্দ শরতের সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের মত আপনার স্বদেশের স্বধর্ম ও সভ্যতার মহিমায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়া জননী-জন্মভূমি শ্রীচরণপদ্মে শ্রদ্ধার্ঘ্যের মত শোভা পাইতেছেন। আহা! এমন কি আর হয়? অরবিন্দ ফিরিঙ্গীর আঁস্তাকুড়ের বাবু নহেন। তাই তিনি খাঁটি মায়ের ছেলে হইয়া ভবানীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐখানে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে মাকে প্রণাম কর। স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আর বিলম্ব নাই।

যেমন তাঁকে দেখেছি

চারুচন্দ্র দত্ত

আমার দেবতার সঙ্গে আমার দেখা জীবনে এই প্রথম নয়। যুগ থেকে যুগে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে, তাঁকে আমি জেনেছি, ভালবেসেছি, তাঁর সেবা করেছি। পিতৃরূপে, প্রিয়রূপে, বন্ধুরূপে তিনি বারবার আমার কাছে এসেছেন। এ গ্রহে আমার এই লক্ষ্যহীন ভ্রমণ বারবার তাঁর কৃপাধন্য হয়েছে। মাঝে-মাঝে মেঘে আচ্ছন্ন হয়েছে দৃষ্টি, হারিয়ে ফেলেছি ধ্রুবতারকার লক্ষ্য; কিন্তু সে বেশীক্ষণের জন্য নয়; আত্মদর্শনের নির্জন পথের যাত্রী, দুর্বল, স্বল্পদৃষ্টি, নগণ্য এ পথিক কখনও তাঁর অনন্তকরুণায় বঞ্চিত হয়নি। তাঁর শক্তি আমাকে কর্দমের গ্লানি থেকে মুক্ত করেছে, অন্ধকার থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে, শিখিয়েছে—কেমন করে তাঁকে খুঁজতে হয়। তাঁকে দেখতে শিখিয়েছে—তাঁর স্বর্গীয় ভূমিতে নয়, এই অনন্ত পরিবর্তনশীল যে ভূলোক আমায় ঘিরে রয়েছে—সেখানেই। এইভাবে আমি তাঁর কৃপার স্বাদ পেয়েছি, সত্যের চকিত দর্শন পেয়েছি বারবার। মনোদিগন্ত মাঝে-মাঝে আধো-ছায়ায় ঝাপসা হয়েছে বটে, কিন্তু এখন আর সে দুঃখ নেই। প্রভু যে আমায় আদিত্য-বর্ণ পরম-পুরুষের জ্যোতির্ময় আনন দেখিয়েছেন!

আমার এ নশ্বর দেহ, মন ও জীবন আর আমার কাছে বোঝা মনে হয় না, কারণ, এখন জানি, তারা আমার অবিনশ্বর আত্মারই ধারক। এবং স্ব-রূপে আমার আত্মা বিশ্বের আত্মা। আমার দেবতার আত্মা। এই একই আত্মা বিশ্বকে ও বিশ্বাতীতকে ছেয়ে রয়েছে। সুতরাং আমার এ দেহ, এ জীবন, এই মন আমার কাছে মায়াবাদীর বর্ণিত পিঞ্জর নয়। সেই অদ্বিতীয়, অনন্ত আনন্দে আত্মপ্রসারী অখণ্ডের মন্দির।

পাছে আমি ভুলে যাই—হে সার্বভৌম, তুমি তাই তোমার দ্বৈতরূপে আমার কাছে এসেছ। পুরুষরূপে ও প্রকৃতিরূপে, প্রভুরূপে ও মাতৃরূপে। নিয়ে এসেছ তোমার বিশ্বব্যাপী শান্তির বাণী, দিতে এসেছ তোমার মধ্যে সংহত বিশ্বাত্মার বার্তা।

বহু বহুদিন মানুষ তার জ্যোতির্ময় সত্তা ও উজ্জ্বল পরিণতির কথা ভুলে ছিল, তার হৃদয়পদ্মের সেই দ্যুতিময় মণি গিয়েছিল হারিয়ে, বহুদিন সে অহংবোধের জটিল পথে-পথে ঘুরেছে, পরিবেশকে স্বীকার করে নিয়ে বেঁচেছে, আক্রমণ করেছে একে অপরকে। ঊর্ধ্বলোক থেকে মাঝে মাঝে দূত এসেছে, তাদের আত্মবিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে। তাদের কথা মানুষ শুনেছে কিছুক্ষণ, কিন্তু হায়! আবার ভুলেছে সব। যাঁরা দিব্যপ্রেরণা লাভ করেছেন, নিজেদের মুক্তিসাধন করে চলে গেছেন তাঁরা। কিন্তু পৃথিবীর দৈন্য দশা ঘোচেনি। বিবর্তনের পথে প্রকৃতির আপন গতিবেগ নির্দিষ্ট, সে ত্বরা সয় না।

মানুষ অবশ্য আর আদরের ধন। তার এই প্রিয় সৃষ্টির মধ্য দিয়েই বিবর্তনের গতিপথ চিহ্নিত হবে। গুরুদেবের ভাষায়—ব্যক্তিসত্তাই বিবর্তনের চাবিকাঠি। মহাশূন্যের একটি ধূলিকণা থেকে আরম্ভ করে ধাপে-ধাপে সে মানবত্ব লাভ করেছে। তারপর শুরু হয়েছে তার অগ্নিপরীক্ষা। সে হার মানেনি। জটিল অরণ্য ও শুষ্ক মরু, দুরন্ত নদীস্রোত ও দুরারোহ পর্বত পার হয়ে, ঝড়-ঝঞ্ঝা তুচ্ছ করে নিয়তই সে সামনে এগিয়ে চলেছে। আজ উঠেছে প্রচণ্ড ঝড়, দৃষ্টিরোধী তুষারবাত্যা তাকে কাদার দহে এসে আক্রমণ করেছে। দলগত অহংকারে, শক্তি ও রক্তের লালসায় সে এখন আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

তবু মানুষ এর হাত থেকে বাঁচতে পারে, যদি সে ইচ্ছা করে, যদি নিজের মধ্যে দিব্যমানবকে চিনতে পারে। কারণ, অন্তরের জ্যোতি ছাড়া আর কিছু দিয়েই পথ দেখা যাবে না। সে বেছে নিতে পারে অজ্ঞান, বেছে নিতে পারে পঙ্কসায়রে গলিভাষ্মি হবার

নিদারুণ ভবিতব্য। সে স্বাধীনতা তার আছে। কারণ, তাকে যুক্তি ও বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির বিবর্তন সে বন্ধ করতে পারে না। সে যদি সরে দাঁড়ায়, প্রকৃতি তাহলে অন্য মাধ্যম বেছে নেবে। গুরুদেবের সাবধান বাণী এই ঃ

"যদি মানুষ পথে পিছিয়ে পড়ে থাকতে না চায়, সৃষ্টিব্যাকুল জননীর নব-নব সৃজনের হাতে বিজয়বৈজয়ন্তী তুলে দিতে না চায়, তাহলে তাকে এই ঊর্ধ্বায়নের অভীপ্সায় একাগ্র হতে হবে। সে ঊর্ধ্বায়ন প্রেমের মধ্য দিয়ে, আন্তর উদ্ভাসনের মধ্য দিয়ে, প্রাণের অধিকার ও আত্মদানের মধ্য দিয়েই ঘটবে বটে, কিন্তু অতিমানস ঐক্যের দিকেই হবে তার গতি। এই সব কিছুকেই তা ছাড়িয়ে যায় ও চরিতার্থ করে।"

এই সাবধানবাণী আমাকে ব্যাকুল করে না। তাঁর প্রেম তাঁর অসীম করুণায় আমার প্রত্যয় এতই গভীর। তিনি মানুষকে পথের পাশে পড়ে বিনষ্ট হতে দেবেন না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন ঃ "ধর্ম যখনই ম্লান হয়ে আসে, ঘটে অন্যায়ের প্রকোপ, তখনই আমি মানবজন্ম নিই। সাধুর রক্ষার জন্য, দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য, সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য, যুগে যুগে আমি সম্ভব হই।"

এই ধরনের সঙ্কটগুলির পিছনে অবশ্য সব সময়েই একটা আধ্যাত্মিক বীজ ও সঙ্কল্প থাকে। শুধুমাত্র বহিরঙ্গ কর্মের জন্য অবতারের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয় না। ইউরোপের রিফর্মেশন বা ফ্রান্সের বিপ্লবের মত যুগান্তকারী ঘটনাও গণচেতনার মধ্যে একটা অচল মানসিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল মাত্র। আধ্যাত্মিক কিছু নয়। সুতরাং দিব্য অবতারের প্রত্যক্ষ পরিচালনার তাতে প্রয়োজন হয়নি।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে ভারতে যে সংকটকাল এসেছিল তা নিঃসন্দেহে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ। ঈশ্বর মানুষের প্রতি তাঁর অপরিমেয় প্রেমবশতঃ পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন, পাপীর ধ্বংস,

সাধুর মুক্তি ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য। আজ মানুষের যে সংকট উপস্থিত, তা আরও বহুগুণে গুরুতর। আজ মনে হচ্ছে মানুষ এতদিন পর্যন্ত যা সঞ্চয় করতে পেরেছে সবই নিঃশেষে গলিত। তার আদর্শ, তার মানদণ্ড, তার মূল্যবোধ সবই আজ বিকৃত। এখন অবিচারের রাজত্ব, ধর্ম এখন মুমূর্ষু। এখনই তাঁর আবির্ভাবের শুভলগ্ন। এবং তিনি এসেছেন। তাঁর পদপ্রান্তে যারা প্রণত, ভাগ্যবান তারা।

যে প্রভুর আমি পূজা করি—এই তাঁর রূপ। এখনও তিনি নিজেকে প্রকাশ করেননি। এখনও তিনি বলেননি—"অজ্ঞ মোহগ্রস্ত মানুষ নররূপী আমাকে চেনে না, নিখিল বিশ্বের অধীশ্বর বলে এখনও তারা আমায় জানে না।" কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। ওই নয়ন! সেখানে যে অনির্বচনীয় প্রশান্তি, মহত্তম আশিসের স্বীকৃতি। ওই আনন! প্রতিটি রেখায় তার সার্বভৌম শক্তি, অপরিসীম করুণার স্বাক্ষর। স্বচ্ছ ওই দেহাধারে জ্ঞান-অজ্ঞান, স্বর্গ-মর্ত্য সব কিছুর অতীত সেই চিরন্তনের কোমল-উজ্জ্বল দৈব জ্যোতির আবেশ!

প্রভু, জানি, তুমি দুষ্টের ধ্বংস ও শিষ্টের মুক্তির জন্য এসেছ। কিন্তু তুমি আরও এসেছ আমাদের দেখাতে—যে আমরা কি হয়ে উঠতে পারি। সাধারণতম মানুষ কেমন করে এই পার্থিব দেহে ঈশ্বরকে ধারণ করতে পারে। মানুষের মধ্যে তোমার অবতরণ মানুষকে ঈশ্বর পদবীতে উত্তীর্ণ করবে। তোমার অবতরণই আমার উত্তরণ।

এই হল প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ণ তাৎপর্য। বিক্ষিপ্তাত্মা পৃথিবী উপলব্ধি করুক এই সত্য; পূর্ণ আত্মসমর্পণের সঙ্গে অকুতোভয়ে ঝাঁপ দিক সে ঊর্ধ্বে, ওই অতি-মানসলোকের দিকে।

"The Master as I See Him' নামে লেখকের ইংরাজী রচনা থেকে অনূদিত। অনুবাদ: শ্রীমতী বাণী বসু।

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কিছু লিখতে যাওয়া আমার পক্ষে স্পর্ধার কথা সন্দেহ কি? তবে তিনি আমার গুরু দীক্ষাদাতা। তাই অকৃতার্থ প্রয়াসেরও আছে চরিতার্থতা। মানুষ যার কাছে পায় চরমপথের আলো তার কথা বলতে তৃষ্ণা জাগে। কিন্তু আত্মসমর্থনের পালা থাকুক। সবাই এটুকু অন্তত বুঝবেন যে শ্রীঅরবিন্দের মহত্ত্বের কোনো ছবি আঁকার প্রযত্ন এ নয়—সে অসম্ভব: শ্রীঅরবিন্দ আমাকেই একটি পত্রে লিখেছিলেন কয়েক বৎসর পূর্বে: "No one can write about my life because it has not been on the surface for man to see." আমার চেষ্টা হোক শুধু তাঁর কথা যা পারি কিছু বলতে—যতটা পারি ব্যক্তিগতভাবেই। এক্ষেত্রে সেই পন্থাই সবচেয়ে নিরাপদ—যেহেতু যোগ সম্বন্ধে নির্ব্যক্তিক কথা বলার অধিকারী আমি নই। শ্রীঅরবিন্দের পত্রগুলির মধ্যে বিশেষ ক'রে ব্যক্তিগত পত্রগুলি নির্বাচন করেছি আরো এই জন্যেই।

শ্রীঅরবিন্দের গীতার কথা প্রথম শুনি বন্ধুবর শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কাছে। এঁর নাম আগে ছিল রোনাল্ড্ নিক্সন। এখন ইনি সন্ন্যাসী—আলমোড়ায় সাধনা করেন। তিনি বলেন আমাকে যে, এমন উজ্জ্বল ও গভীর ব্যাখ্যা তিনি আর কখনো পড়েন নি। সে আজ বছর বারো হবে। তারপর আমি শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজি "Essays on the Gita", "Synthesis of Yoga", "Future Poetry", "Life Divine" ও "Mother" পড়ি। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও একথা সত্য যে আমার স্বদেশী বন্ধু সংখ্যায় প্রায় অগুন্তি হ'লেও তাঁদের কারুর মুখেই সে সময়ে শ্রীঅরবিন্দ বা তাঁর বইয়ের

কথা শুনিনি—শুনলাম প্রথম এক বিদেশী বন্ধুর কাছে। সেই আমার প্রথম যোগী শ্রীঅরবিন্দের দিকে ফেরা।

তারপর তাঁকে চিঠি লিখি। না, তিনি দেখা করতে পারবেন না। বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁকে প্রশ্ন করি। উত্তরে তিনি যা বলেন, আমাকে লেখেন শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

* * *

সে-সময়ে যোগের প্রশ্ন সবে মনে উদয় হয়েছে। তাই শ্রীঅরবিন্দকে আবার লিখলাম আমার নানা সমস্যা জানিয়ে। হঠাৎ চিঠি পেলাম—আচ্ছা দেখা করবেন তিনি, যদি পণ্ডিচেরি আসি।

তখন সারা ভারতবর্ষে বেড়াচ্ছি গায়ক-গায়িকার খোঁজে, লিখছি "ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা"—গানের বক্তৃতা দিচ্ছি, গান গাইছি। সব ফেলে গেলাম ছুটে পণ্ডিচেরি। ছিলাম একটি হোটেলে।

এখানে ব'লে রাখি আমাদের কথাবার্তা হয়েছিল ইংরাজিতে। কথা শেষ হ'তেই তখনি তখনি সেসব লিখে রাখি ইংরাজিতেই। পরে তাঁকে পাঠাই। তিনি স্বহস্তে (অল্পই) সংশোধন ক'রে দেন। এখানে দেওয়া হ'ল তারই বাংলা অনুবাদ।

আরো একটু ভূমিকা আছে। শ্রীঅরবিন্দ আমার প্রশ্নের উত্তরে এমন অনেক কথা বলেছিলেন যার সবটা সে-সময়ে আমার বোধগম্য হয় নি, পরে পত্রাদি থেকে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল সাধনার নানা অবস্থায়। সে-সব অংশ পাদটীকায় কিছু কিছু দিলাম—কথাবার্তাগুলিকে পূর্ণতা দিতে। সবটুকুই ইংরাজিতে উদ্ধৃত করতে পারলাম না স্থানাভাব বশে। পাদটীকায় উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে যে-সব কথা থাকবে সবই শ্রীঅরবিন্দের স্বহস্ত-লিখিত—আমার নানা প্রশ্নের উত্তরে। এক এক সময়ে মনে হয় এ-ধরনের পাদটীকার বাহুল্যে রচনাটির সহজগতিকে ভারাক্রান্ত করা হয়ত ভালো হ'ল না—কিন্তু ভেবে-চিন্তে স্থির করলাম যে শ্রীঅরবিন্দের অনুপম ভাষার কিছু কিছু

এভাবে পাদটীকায় দেওয়া সবদিক দিয়েই বাঞ্ছনীয়। আমার সাধক-সাধিকা সতীর্থরাও তাই বললেন।

* * *

১৯২৪ সাল, ২৫শে জানুয়ারী। সকাল বেলা। বারান্দায় শ্রীঅরবিন্দ একটি কেদারায় আসীন। প্রণাম ক'রে বসলাম। মাঝে টেবিল।

সৌম্য প্রশান্ত মূর্তি। এমন স্থির অতলস্পর্শী শান্তির আভা কারুর চোখে ফুটতে দেখি নি কখনো। শ্মশ্রুর প্রাচুর্য নেই, কিন্তু চুল আস্কন্ধ-এলায়িত। গায়ে একটি চাদর শুধু, খালি পা। মনে এমন সম্ভ্রমের ভাব এল! বুকের মধ্যে ছুরু ছুরু করে। যোগী! এর আগে মঠের সন্ন্যাসী—বড় জোর দু-একজন তান্ত্রিক দেখেছি, কিন্তু নির্জন-বিলাসী যোগীতপস্বীর এত কাছে কোনোদিন আসিনি--বিশেষত এমন যোগী যিনি আমার সম্বন্ধে কিছু খবর রাখেন। পরে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন আমাকে যে আমার সঙ্গীত-সন্ধিৎসার কথা তিনি শুনেছিলেন ও আমার এ-উৎসাহে সাড়াও দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময়ে আমি ভাবিও নি আমার সম্বন্ধে তাঁর কণিকা-প্রমাণও ঔৎসুক্য আছে।

* * *

শ্রীঅরবিন্দ খানিকক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন—স্থির প্রেক্ষণে। কী রকম সব ভাবের ঢেউ যে জেগে উঠল প্রকাশ ক'রে বলতে পারব না—কেবল এইটুকু বলি যে তেমন ধারা দৃষ্টি কখনো আমার চোখে পড়েনি আজ অবধি। যাহোক প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম: "আমি এসেছি জানতে—আমি আপনার যোগে কোনো রকম দীক্ষা পেতে পারি কি না।"

শ্রীঅরবিন্দ শান্তকণ্ঠে বললেন: "আমাকে আগে গুছিয়ে বলো ঠিক কী চাও তুমি, আর কেনই বা আমার যোগে দীক্ষা চাইছ।"

কী চাই? কেনই বা—? আমি নিজেই কি জানি যে গুছিয়ে

বলব? এলোমেলো চিন্তাদেরকে তবু কোনোমতে সাজিয়ে বাগ মানিয়ে বললাম: "যদি বলি আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন কি না—অর্থাৎ—মানে—জীবনের লক্ষ্য কী—শুধু জানতে নয়—পেতেও।"

"এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়", তিনি বললেন মৃদুকণ্ঠে, "আমি এমন কোনো ঈপ্সিত বস্তুর কথা জানি না সবারই জীবনে লক্ষ্য হিসেবে স্বীকৃত হ'তে পারে। জীবনের লক্ষ্য বহু ও বিচিত্র—না হ'য়ে পারেই না। যোগপন্থীরাও নানা লক্ষ্য নিয়ে আসে যোগ করতে। কেউ বা যোগ চায় এ-জীবন থেকে মুক্তি পেতে—যেমন মায়াবাদীরা। এরা বলে এ ইন্দ্রিয়ের জগৎ হ'ল মায়া, কি না পরম-লক্ষ্যকে ঢাকে। আবার কেউ কেউ যোগ চায় প্রেম বা মৈত্রীর আকাঙ্ক্ষায়, কেউ চায় আনন্দ, কেউ বা চায় দিব্য-শক্তি, কেউ জ্ঞান। কাজেই তোমায় আগে মনস্থির ক'রে আমাকে বলতে হবে তুমি যোগ করতে চাও কিসের জন্যে।"

বিপন্নকণ্ঠে বললাম: "আমি জানতে চাই—জীবনের—সংসারের—মানে—নানা অসঙ্গতি ও স্বতোবিরোধের—দুঃখদৈন্য আধিব্যাধির—কোনো মীমাংসা যোগে মেলে কিনা।"

"অন্য ভাষায়, তুমি চাও জ্ঞান—প্রজ্ঞা?"

"হ্যাঁ—না, শুধু জ্ঞানই নয়—আনন্দও চাই অবশ্য।"

"জ্ঞান ও আনন্দ তুমি যোগে নিশ্চয়ই পেতে পারো।"

উৎসাহ পেয়ে বললাম: "তাহ'লে—আপনার কাছে দীক্ষা পাবার আশা করতে পারি কি?"

শ্রীঅরবিন্দ তেমনি শান্তকণ্ঠে শুধু বললেন: "পারো, যদি যোগের সর্তে তুমি রাজি থাকো এবং তোমার যোগতৃষ্ণা প্রবল হয়।" (শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন provided your call is strong.)

"যোগের সর্ত কী কী যদি একটু বুঝিয়ে বলেন—আর যোগের তৃষ্ণা—call—বলতেই বা ঠিক কী বোঝায়?"

তিনি উত্তর দিতে যাবেন এমন সময়ে আমি বললাম : "আপনার 'Yogic Sadhan' বইটিতে আপনি নিজেকে 'তান্ত্রিক' বলেছেন—অর্থাৎ মায়াবাদী বৈদান্তিক নন, লীলাবাদী সাধক। আপনার 'Life Divine' বইটিতেও লিখেছেন : To fulfil God in life is man's manhood. We must accept the manysidedness of the manifestation even while we assert the unity of the Manifested. All problems in life are essentially problems of harmony."

"আমি লীলাবাদী একথা সত্য। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?"

"আমার জিজ্ঞাস্য এই যে আপনার যৌগিক সাধনের যোগ করতে গেলে জীবন থেকে পেন্‌শন নিয়ে সব ঐহিক কর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে গুহাপন্থী তাপস মতন হ'য়ে পড়তে হবে না তো?—আপনি মায়াবাদী নন বলছেন ব'লেই একটু ভরসা হয়।"

শ্রীঅরবিন্দ একটু হাসলেন : "আমি মায়াবাদী নই বটে, কিন্তু যৌগিক সাধন বইটির প্রণেতা আমি নই।"

"তবে?"

"অটোম্যাটিক লেখা কাকে বলে জানো?"

"প্ল্যান্‌চেট?"

"ঠিক প্ল্যান্‌চেট নয়। আমি কলম ধ'রে থাকতাম, বইটি লিখে যেত কোনো শক্তি সেই কলমের মুখে।"

"একথা শুনেছি বটে কার কাছে। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—আপনি এ ধরনের লেখা লিখতেন কেন?"

"আমি এ-সময়ে নির্ণয় করতে চাইছিলাম—এ ধরনের ঘটনার মধ্যে কতখানি সত্য আছে, আর মগ্নচৈতন্য থেকে কতখানিই বা ইঙ্গিত আসে অন্তর্লীন চেতনা থেকে।"

(শ্রীঅরবিন্দ এটুকু স্বহস্তে লিখে দিয়েছিলেন এই ভাষায় : "At the time I was trying to find out how much of

truth and how much of subliminal suggestion from the submerged consciousness there might be in phenomena of this kind".)

"কিন্তু সে কথা থাক", বললেন তিনি, "তোমার আসল প্রশ্নেই আসি।"

"পার্থিব স্তরে যে-সব কর্মের মূল্য তোমার কাছে আছে", বললেন তিনি, "সে-সব যে ছাড়তেই হবে এমন কোনো কথা নেই। তবে সে স্তরের সব কিছুতেই তোমার আসক্তি থেকে মুক্ত হ'তে হবে —তা তুমি কর্মচক্রের মধ্যেই থাকো বা বাইরেই থাকো। কারণ এ-আসক্তিকে যদি তুমি পুষে রাখো তাহ'লে উপরের আলো অব্যাহতভাবে তোমার মধ্যে দিয়ে তোমার প্রকৃতির রূপান্তর সাধন করতে পারবে না।"

"এ কথার মানে কি এই দাঁড়ায় যে আমাকে, ধরুন, দরদ, বন্ধুত্ব বা স্নেহ ভালোবাসার আনন্দও ছাড়তে হবে?"

"তা নয়, স্নেহ দরদ বা বন্ধুত্ব থেকে দূরে না থাকলে যে ভগবানকে কাছে পাওয়া যাবে না এমন কোনো কথা নেই। বরং উল্টো: ভগবানের সান্নিধ্য ও ঐক্যবোধের ফলে সাধক যে দিব্যচেতনা লাভ করেন তার একটা আনুষঙ্গিক হবে—অন্য সবাইকারও কাছে আসা ও তাদের সঙ্গে ঐক্যবোধ। [মায়াবাদীদের যোগে এবং সন্ন্যাসযোগে চরম লক্ষ্য হচ্ছে—বন্ধুত্ব ও স্নেহের সব রকম সম্বন্ধ পরিহার, এ-বিশ্বজগতের জীব ও অন্য সব কিছুরই প্রতি আসক্তি থেকে মুক্তি —যার নাম মোক্ষ; যদিও সেখানেও শেষের দিকে নির্বাণের আগেই জীবের প্রতি একটা করুণা বা অনুকম্পার ভাব আসে—যেমন বৌদ্ধ সাধনায়। কিন্তু অন্যের সঙ্গে ঐক্যবোধ বা অন্যের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার বিশ্বভৌম আনন্দ হ'ল জীবন্মুক্তির ও সর্বাঙ্গীন পরিণতির গোড়াকার কথা—আর এ-মুক্তি ও পরিণতি হ'ল পূর্ণযোগের লক্ষ্য।"

আমি বললাম: "আমার হয়েছে কী বলি একটু শুনুন দয়া

ক'রে। জীবন আমার বরাবরই খুব ভালো লাগে। কিন্তু ছেলেবেলায়—তের বৎসর বয়সে আমি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাবে পড়ি, মনে দৃঢ় নৈশ্চিত্য জন্মায় যে 'ঈশ্বর দর্শনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য'। বিলেতে গিয়ে ওদেশের জাঁকজমকে প্রথমে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ক্রমে ফের সেই ছেলেবেলাকার সুরই উঠল ফুটে। মনে হল এসব নয়, নয়, নয়,—যশমান ধনজন খ্যাতি কর্ম সেবা শিল্প কিছুই কিছু নয়—ভগবানকে পেলে তবেই এসবের অর্থ থাকে, নৈলে সবই ফাঁকি, ছায়াবাজি।

"দেশে ফিরে বন্ধুবান্ধব হ'ল অগুন্তি—বোধহয় টাকাকড়ি অবসর ও মেশবার ক্ষমতা ছিল ব'লে। কিন্তু আশ্চর্য, ভগবানকে নিয়ে 'আধ্যাত্মিক' ভারতীয় বন্ধুদের মধ্যে বড় কাউকে মাথা ঘামাতে দেখলাম না। আমার চেনাশোনাদের মধ্যে ভগবানকে চাইতে দেখলাম শুধু এক ইংরাজ বন্ধুকে—রোনালড্ নিক্সন। সেই আমাকে প্রথম বলল যে আপনি মস্ত যোগী, পড়ালো আপনার বইটই। তারপর থেকে কেবলই মনে হয় আপনার কাছে যদি দীক্ষা পাই তবেই এ দুর্গম পথের পথিক হ'লেও হ'তে পারি—নইলে—অসম্ভব। কিন্তু ওদিকে জীবনও যে আবার টানে। যেমন ধরুন বলছিলাম সামাজিক আদান-প্রদান, বন্ধুত্ব স্নেহ-ভালোবাসা এইসব। প্রশ্ন জাগে—যোগ করতে হ'লে কি এসব ছাড়তেই হবে? মুস্কিল হয়েছে এই যে এসবে মন ভরেও না অথচ এসবই ছাড়তে হবে ভাবতে বাজে। কেন বুঝি না।"

শ্রীঅরবিন্দ খুব মন দিয়ে শুনলেন, শুনতে শুনতে তাঁর মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি—কিন্তু এত করুণায় ভরা। খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন আমার পানে। পরে ধীরকণ্ঠে বললেন:

"কি জানো? (সামাজিক আদান-প্রদান, বন্ধুত্ব, স্নেহ-ভালোবাসা দরদ এইসবের ভিত্ হ'ল প্রাণগত—আর এসবের কেন্দ্র হ'ল আমাদের অহংবুদ্ধি। সচরাচর মানুষ পরস্পরকে ভালোবাসে অন্যে আমায়

ভালোবাসছে এতে সুখ আছে ব'লে, অন্যের সঙ্গে মাখামাখি হ'লে আমাদের অহং যে ফুলে ওঠে তাতে মনটা খুশি হয় ব'লে—প্রাণশক্তির দেওয়া-নেওয়ায় আমাদের ব্যক্তিরূপ খোরাক পায়—উৎফুল্ল হয় ব'লে। এছাড়া আরো স্বার্থসঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য মিশেল থাকে। অবশ্য উচ্চতর আধ্যাত্মিক, আন্তর, মানসিক ও প্রাণিক উপাদানও থাকে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ নমুনার মধ্যেও পাঁচমিশেলি থাকেই থাকে। এইজন্যেই হয় কি, অনেক সময়ে হয়ত দেখা গেল কারণে বা অকারণে সংসার, জীবন, সমাজ, প্রিয়পরিজন, লোক-হিতৈষণা—সবই ঠেকল বিস্বাদ—জাগালো অতৃপ্তি। মনে রেখো, লোক-হিতৈষণার মধ্যেও অহংবুদ্ধি বেশ কায়েমি হ'য়ে থাকতে পারে)

"কখনো", বললেন শ্রীঅরবিন্দ, "এ-বিতৃষ্ণার মূলে ধরা-ছোঁওয়া-যায় এমন কারণও থাকে—যেমন ধরো, হয়ত প্রাণের কোনো মূল কামনা ঘা খেল, কিম্বা হয়ত প্রিয়জনের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হ'তে হ'ল, কিম্বা হয়ত হঠাৎ দেখতে পাওয়া গেল যে যাদের ভালোবেসেছি তাদের চিনতে পারিনি, বা মানুষকে সচরাচর যা ভেবে এসেছি সে মোটেই তা নয়। আরো রকমারি হেতু থাকতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ স্থলেই বিতৃষ্ণা আসে তখনই যখন আমাদের আন্তর চেতনা একটা ঘা খায় কেন না সে আভাষ পায়—যদিও হয়ত অনেক সময়ে আবছায়াভাবে—যে এসব থেকে সে এমন কিছু আশা করেছিল যা এরা দিতেই পারে না। ফলে কেউ কেউ হয়ত ঝোঁকে বৈরাগ্যের দিকে—আঁকড়ে ধরে কঠোর ঔদাসীন্যকে, মোক্ষকে। আমাদের পূর্ণযোগে আমরা বলি কি, এই মিশেলকে হবে তাড়াতে, (চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে কোনো শুদ্ধতর স্তরে—যেখানে এই সব গ্লানির ছায়াও থাকবে না। তাহ'লেই স্নেহ-ভালোবাসা দরদ সখ্য ঐক্যবোধ—এই সবের নির্ভেজাল আনন্দ পরিচয় মিলবে—যার বনেদ হ'ল আধ্যাত্মিক ও স্বয়ংসিদ্ধ। এ হ'তে গেলে একটা অদলবদল হওয়া চাই বৈকি—যেভাবে এসব প্রবৃত্তির লীলাখেলা আগে চলত

তাদের জায়গায় গোড়াপত্তন করতে হবে আমাদের মধ্যেকার বড়-আমি-কে। সে এসবের মধ্যে দিয়ে তার নিজস্ব ঢঙে প্রকাশ করবে আত্মোপলব্ধিকে—কি না, ভগবানকে। যোগের ভিতরকার কথা হ'ল এই।

"তাই", বললেন তিনি, "এই আদর্শকে তোমার সামনে রাখতে হবে—এইটে জেনে যে, কোনো কিছুতেই বাঁধা পড়লে চলবে না।"

"সেটা কি সম্ভব আমার পক্ষে?"

"প্রথমেই সম্ভব নয়। হ'লে তো বলতাম তুমি এখনি মুক্তপুরুষ ব'নে গেছ। আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, যদি তুমি যোগ করতে চাও তা'হলে এই অন্তর্মুক্তির আদর্শ তোমাকে সর্বদাই নিজের চোখের সামনে ধ'রে রাখতে হবে—মানে, যদি তোমাকে কিছু ছাড়তে বলা হয় তার জন্যে তোমাকে হবে তৈরি থাকতে।"

"ছাড়তে বলা কি হবেই হবে?"

"বাইরের দিকে হয়ত অনেক কিছু না-ও ছাড়তে হ'তে পারে—কিন্তু তাতে বিশেষ আসবে যাবে না—কারণ ভিতরে ভিতরে তোমাকে পুরোপুরি নির্লিপ্ত থাকতেই হবে। অন্তরে যদি তুমি আসক্তিশূন্য হতে পারো তা'হলে বাইরে যা-কিছু বন্ধন আনে তাদের না ছাড়তেও হ'তে পারে। কিন্তু যা-কিছু অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায় তাকে বিদায় দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হ'তেই হবে—যদি দরকার হয়। যোগের এ একটা প্রধান সর্ত তো বটেই।"

বললাম: "সূক্ষ্মতর স্তরের জিনিসের সম্বন্ধেও কি একথা খাটে—যেমন ধরুন গান? গান আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাকেও কি ছাড়তে হবেই হবে?"

শ্রীঅরবিন্দ মৃদু হাসলেন: "হবেই হবে এমন কথা তো আমি বলি নি। তবে যোগ যদি তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিস হ'ত তাহ'লে তার জন্যে গানকে ছাড়তে হ'তে পারে ভাবতেও তুমি এতটা উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠতে কি?"

আমি অপ্রতিভ হয়ে মাথা হেঁট করলাম। তারপর বললাম কুণ্ঠিতস্বরে: "আপনি ভাববেন না যে আমি গান ছাড়তে অক্ষম। কেবল—কি জানেন?—কেমন ক'রে নিঃসংশয় হব যে যোগে গান ছাড়ার ক্ষতিপূরণ মিলবেই মিলবে?—আমার সমস্যাটা সরল—সোজাসুজি বললে দাঁড়ায় এই যে একটা বড় কিছুর জন্যে ছোটকে ছাড়া আমার কাছে দুরূহ মনে হয় না যদি এই বড় কিছুর পূর্বাস্বাদ মেলে। কিন্তু যখন যৌগিক আনন্দের সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণাই আমার নেই তখন অধ্রুবের জন্যে ধ্রুবকে আগে থেকেই ছাড়তে হবে—বাধে এইখানে। কূলের মায়া কাটাবার আগে অকূলের কিছু স্বাদ অন্তত পেতে চাওয়া—এও কি খুব অসঙ্গত—অযৌক্তিক?"

শ্রীঅরবিন্দ বললেন: "আমি তোমাকে বলেছি যে তোমাকে সঙ্গীত বা অমূনিধারা ধ্রুব কিছুকে যে ছাড়তে হবেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যেটা আবশ্যিক সেটা হচ্ছে এই যে যদি দরকার হয় তা'হলে যা ছাড়া তোমার যোগের পক্ষে অনুকূল তাকে বিদায় দিতে তুমি গররাজি হবে না।"

"কিন্তু এ-যোগ দেবে কী—যদি জিজ্ঞাসা করি ছাড়বার আগে? মন যদি হয় কৌতূহলী, যদি চায় জানতে? সেটা কি নিষিদ্ধ?"

"নিষিদ্ধ নয়, তবে যোগ ঠিক মানস কৌতূহলের ব্যাপার নয়। যোগ হ'ল উপলব্ধির ব্যাপার—জীবন দিয়ে উপলব্ধি, সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি। ক্ষতিপূরণের কথা বলছিলে? ক্ষতিপূরণ আছে বৈকি। সে স্থায়ী—গভীর। কিন্তু তাকে দাবি করলে যে সে ধরা দেবে এমন কোনো কথাও সে দেয় না আগে থেকে। তাছাড়া হয় কি জানো? যে-সব আনন্দ নিম্নতর স্তরের জিনিস, সে-সব যতক্ষণ তোমার কাছে খুব বেশি আদরণীয়, খুব বেশি ধ্রুব ব'লে মনে হয় ততক্ষণ সে-সবকে তুমি ছাড়তেই পারবে না যে। এদের বাসনা মানুষ ছাড়ে কেবল তখনই যখন এরা আনে একটা গভীর তীব্র অতৃপ্তি। যেখানে পার্থিব সুখের শেষ সেখানেই পারমার্থিক আশ্বাসের শুরু।"

একটু চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম : "কিন্তু যতক্ষণ পার্থিব বাসনা থাকে ততক্ষণ পারমার্থিক আনন্দের স্বাদও পাওয়া যায় না কেন ?"

শ্রীঅরবিন্দ বললেন : "একেবারেই পাওয়া যায় না একথা সত্য নয়। জীবনে খুব সুখের মুহূর্তেও অতৃপ্তির ফাঁক দিয়ে তো কত সময়েই উপরের আলোর ডাক আসে। তবে সে-ডাক মিলিয়ে যায় আধার তৈরি না হ'লে। তখন ফের আঁধার আসে ছেয়ে। তাই যোগ আমাদের ঠেলে দেয় উপর দিকে যেখানে আলো সহজে নেভে না। হয় কি, বাসনার পিছুটানকে কাটিয়ে উঠতে না পারলে সে হ'য়ে দাঁড়ায় একটা শৃঙ্খলের মতন, আমাদের বেঁধে রাখে যেন নিম্নতর জগতের অনেক-কিছুর সঙ্গে। যোগের রাজ্য বুদ্ধি বা শিল্পরাজ্যের চেয়েও অনেক ঊর্ধ্বে ব'লে এ-সব রাজ্যের কামনাও কোনো না কোনো সময়ে হ'য়ে দাঁড়ায় বাধা।"

"তা-ই যদি হয়, তা'হলে আপনার নানা বিচারে বুদ্ধি বা শিল্পের আনন্দকে আপনি প্রশংসা করেন কেন ? আপনার লেখায়ই বা বুদ্ধির দীপ্তি এমন উজ্জ্বল কেন, আপনার Future Poetry-তে কাব্যরসের সুখ্যাতিই বা করেন কেন ?—আপনার Psychology of Social Development-এও তো আপনি লিখেছেন : The highest aim of the æsthetic being is to find the Divine through beauty."

শ্রীঅরবিন্দ বললেন : "বুদ্ধি বা শিল্পকে প্রশংসা করব না কেন ; কিছুদূর অবধি ওরা আমাদের এগিয়ে দেয় তো বটেই। আসলে এ হ'ল ক্রমবিকাশ—ইভল্যুশনের কথা। আমি একবার লিখেছিলাম Reason was the helper ; Reason is the bar : বুদ্ধি খানিকদূর অবধি সহায় হয় পথ দেখায়, কিন্তু তারপর, যেখানে সে দেখতে পায় না সেখানেও দিতে যায় উপদেশ। তখনই হয় বিপদ, কেন না তখন সে যে শুধু ঠকায় তাই নয়—নিজেও ঠকে। তাছাড়া

আলাদা আলাদা আধার আলাদা আলাদা সাধনার অধিকারী, মানে সেই পথেই তাদের স্বভাব সহজ পরিণতি খোঁজে। অন্যভাবে বলতে গেলে, যারা বুদ্ধিজগতের আলোর জন্যে ভালো আধার, তারা একদিক দিয়ে অন্য অনেকের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে যারা মানবজগতের বাসিন্দাই নয়। কিন্তু একথা বলার মানে এই নয় যে বুদ্ধিজগতের উপলব্ধির চেয়ে বড় উপলব্ধি নেই। নিশ্চয়ই আছে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্বাদ পেতে না পেতে সেটা আমরা বুঝতে পারি। তাই জন্যেই তো মানসজগতের আনন্দ কিছুদিন পর্যন্ত আমাদের আনন্দ দিলেও ক্রমে যেন ফুরিয়ে আসে—বিস্বাদ ঠেকে। তখন উচ্চতর লোকের রস আনন্দের তৃষ্ণা হ'য়ে ওঠে নিবিড়,—উদারতর রাজ্যের সৌন্দর্য ভোগ করতে সাধ জাগে। বুঝতে পারছ ?"

"মানে, আপনি বলতে চাইছেন যোগ আমাদের চেতনাকে আরো বিস্তীর্ণ করে, গভীর করে ?"

"হ্যাঁ। আর ক্রমবিকাশ বলতে আমি এই-ই বুঝি—এই ধীরে ধীরে চেতনার বিকাশ। মানুষের অন্তর্বিকাশে এর পরের স্তরে যোগপথেই ঊর্ধ্বতর আলোক ও শক্তির অবতরণ হবে।"

* * *

একটু পরে আমি প্রশ্ন করলাম: "সবই তো বুঝলাম, কেবল আমার যোগ করা সম্বন্ধে কী ?"

"প্রত্যেকেই কোনো না কোনো যোগ করতে পারে।"

"আমি বলছি আপনার পূর্ণযোগের কথা।"

"কি জানো ?" বললেন শ্রীঅরবিন্দ—যেন একটু ভাবিত: "আমার যোগে তোমাকে দীক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে কি না এখন বলতে পারছি না।"

"কেন, জানতে পারি কি ?"

"কারণ আমি যে-যোগপথে চলেছি তার লক্ষ্য হ'ল আমাদের সমগ্র প্রকৃতির রূপান্তর—দেহ পর্যন্ত। এ বড় কঠিন পথ। এর লক্ষ্য

সহজলভ্য নয়—বিপদও যথেষ্ট আছে। তাই আমি কাউকেই এ-যোগ নিতে বলি না যদি না তার তৃষ্ণা এত বেশি প্রবল হয়—যে সে এর জন্যে তার যা আছে সবকিছু ছাড়তে রাজি থাকে। অর্থাৎ আমি কেবল তাকে আমার যোগে দীক্ষা দিতে পারি যার কাছে এ-যোগ ছাড়া অন্য কিছুই করণীয় মনে হয় না। তোমার মধ্যে এমন তৃষ্ণা তো এখনো জাগে নি। তুমি চাও জীবন-সমস্যার খানিকটা সমাধান। অর্থাৎ তোমার জিজ্ঞাসা—seeking—হ'ল আসলে মনের তৃষ্ণা অন্তরাত্মার নয়।"

একটু দুঃখ হ'ল বৈকি। বললাম: "শুনুন, আমার মনে হয় আপনি হয়ত ঠিক বুঝতে পারেন নি আমার কোথায় বাধছে। কারণ সত্যি বলছি আমার এ কৌতূহল নিছক মানসিক নয়—"

"আমি তো 'কৌতূহল' বলি নি, বলেছি 'জিজ্ঞাসা'। তাছাড়া আমি বলেছি তোমার 'এখনকার' কথা। তার মানে এই নয় যে আন্তরতৃষ্ণা তোমার পরে জাগতে পারে না।"

"বুঝেছি। কিন্তু আমার কথাটা বলি আর একটু শুনুন দয়া ক'রে। ১৯১৯ থেকে ১৯২২ অবধি আমি ছিলাম য়ুরোপে। বহু লোকের সঙ্গেই দেখা হয়েছে—মনস্বী, গুণী, জ্ঞানী, ভাবুক, নানা লোকের কাছেই গিয়েছি আমি—সত্য কী এই জিজ্ঞাসা নিয়ে। কারণ গীতার কথায় বরাবরই আমার সমগ্র মন সাড়া দিয়েছে যে 'প্রণিপাত প্রশ্ন ও সেবা ক'রে তত্ত্বদর্শীদের কাছে যাবে সত্যজিজ্ঞাসু হয়ে।' গিয়ে আমার লাভও হয়েছে প্রচুর—মহাত্মাজি, রাসেল, রেঁালা, দুহামেল, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, ভাতখণ্ডে—আরও কত অখ্যাত মহাত্মা মানুষের সংস্পর্শে। এঁদের সবারই কাছে তাই আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তবু জীবনের দুঃখ-শোক অবিচার নিষ্ঠুরতা —হাজারো শোকাবহ দৃশ্যে—প্রকৃতির অর্থহীন অপচয়ের দৃশ্যে—মানুষের ভালো না চেয়ে মন্দটাই চাওয়ার দৃশ্যে—আমি বারবারই অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে উঠেছি। কেবল মনে প্রশ্ন জেগেছে—"এসবের

প্রতিকার কি নেই? যদি থাকে তবে কেন পাওয়া যায় না—কেন এত খুঁজে বেড়াতে হয়? মানুষ যদি 'অমৃতের পুত্রই' হবে, তবে যুগ ধ'রে কেনই বা তার বিষের 'পরে এত টান—তাছাড়া, আমার প্রায়ই মনে প্রশ্ন জাগত—"

"ব'লে যাও, আমি শুনছি মন দিয়ে।"

আমি বললাম: "যখনই কোনো মহৎ মানুষের কাছে এসেছি মনে প্রশ্ন জাগত—ইনি কি সত্য পেয়েছেন? শান্তি? অন্তরের অতল থেকে পরিষ্কার একটা স্বর উঠত—না তো। এযুগে একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সম্বন্ধে—অন্তর বলত—হ্যাঁ, তিনি পেয়েছিলেন 'যং লব্ধা পরমং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'—মিলেছিল তাঁর সেই পরমধন যা পেলে আর কিছু পাওয়ার থাকে না। হয়ত একটু বেশি আত্মজীবনীর মতন শোনাচ্ছে—"

"না না—বলো।"

"আমার মনে হ'ত ক্রমাগতই কী ক'রে সে-অবস্থা মেলে—'যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'—যেখানে প্রতিষ্ঠা পেলে জীবনের সব স্বতোবিরোধের হানাহানি যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়—আপূর্যমান অচলপ্রতিষ্ঠ হওয়া যায় আনন্দে শান্তিতে! গান আমি অত্যন্ত ভালোবাসি বলেছি আপনাকে। কিন্তু কেবলই মনে হ'ত এহেন আত্মপর ফুলের ব্রত কি ভালো যখন দেখছি এ জনারণ্যে এত বেশি দুঃখের কাঁটাবন? ঠেলে ঠেলে ভিতর থেকে সত্যি কান্না উঠত—এ জগতকে কি বদলানো যায় না?"

বলতে বলতে কেমন এক ধরনের লজ্জা এসে আমার কণ্ঠরোধ করল। এত গুছিয়ে বলা কি ভালো? রবীন্দ্রনাথের কথা ভেবে তবু একটু ভরসা পেলাম। গুছিয়ে বলায় দোষ তো কিছু থাকতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দও তো কম গুছিয়ে বলেন না—কাজেই ক্ষমা করবেন না কি আর?

শ্রীঅরবিন্দের মুখ-চোখে এক অপরূপ স্নিগ্ধতার আভা ফুটে উঠল।

দীপ্ত হ'য়ে। আমার দিকে রইলেন একদৃষ্টে চেয়ে। এমন করুণাভরা চাহনি কখনো দেখিনি জীবনে। অন্তরে শান্তি গেল বিছিয়ে।

বললেন: "তোমার কথা আমি বুঝেছি। আমার নিজেরও এক সময়ে ইচ্ছা হ'ত—যোগবলে জগৎটাকে মুহূর্তে দিই বদলে—মানবপ্রকৃতিটাকে ঢেলে সাজাই—জগতে মন্দ যা কিছু আছে, শোচনীয় যা কিছু আছে এই দণ্ডে লুপ্ত ক'রে দিই আমার সাধনবলে।"

বুকের মধ্যে রক্ত উঠল দুলে। প্রথম দর্শনে শ্রীঅরবিন্দ এমন ভঙ্গিতে কথা বলছেন? আর কার সঙ্গে? আমার মতন এক অজ্ঞাতকুলশীল অজ্ঞান যুবকের সঙ্গে? কৃতজ্ঞতায় মন ভ'রে উঠল। ইংরাজিতে বলে না—drinking every word? শুনতে লাগলাম সেই ভাবে।

"আমি প্রথমে এসেছিলাম এখানে", বললেন শ্রীঅরবিন্দ, "এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য নিয়ে—যদিও আমার পণ্ডিচেরিতে আসার প্রধান কারণ—আমি এইখানেই সাধন করবার আদেশ পেয়েছিলাম।"

"জানি, আপনার স্ত্রীর পত্রেও পড়েছি আপনি যোগসাধনায় নেমেছিলেন দেশোদ্ধার করতে।"

"সত্যি কথা। লেলে-কে আমি তাই বলি যে যোগসাধনা করতে আমি রাজি কিন্তু কর্মসাধনা ছেড়ে নয়। দেশ ও কাব্য দুই-ই আমি অত্যন্ত ভালোবাসতাম।"

"তারপর?"

"লেলে রাজি হ'ল, দিল আমাকে দীক্ষা। কিছুদিন পরে আমাকে শুধু নিজের অন্তরনির্দেশ মেনেই চলতে ব'লে বিদায় নিল।

আমি পণ্ডিচেরি এসে পূর্ণযোগসাধনায় বসলাম। কিন্তু সাধনা করতে করতে আমার দৃষ্টিভঙ্গিই গেল বদলে। আমি দেখলাম যে আমি এখনি এখনি এসব করা সম্ভবপর ভাবতাম শুধু আমার অজ্ঞানের জন্যে।"

"অজ্ঞান?"

"হ্যাঁ, কেন না আমি এই সত্যটা তখন জানতাম না যে জগতের মানুষকে উদ্ধার করতে হ'লে একজন মানুষের পক্ষে বিশ্বসমস্যার চরম সমাধানে পৌঁছনই যথেষ্ট নয়—তা সে মানুষ যতই কেন অসামান্য হোক না। শুধু নিজে অমৃতলোকে পৌঁছলেই হবে না—বিশ্বমানবকেও হ'তে হবে অমৃতলাভের অধিকারী। কিন্তু তার জন্যে কালও অনুকূল হওয়া চাই। আসল সমস্যাটা হ'ল ঐখানে। শুধু উপরের আলো নামতে রাজি হ'লেই হবে না—সে নামতেও পারে থেকে থেকে—কিন্তু তাকে সুপ্রতিষ্ঠ করা যাবে না যদি নিচের আধার—গ্রহীতা আধার ধারণ করতে না পারে। কাজেই যা তুমি করতে পারো তা হচ্ছে এই যে যা-কিছু উপলব্ধি করেছ তাকে আংশিকভাবে বিলোতে পারো—মানে, কেবল তাদেরকে দিতে পারো যারা কমবেশি গ্রহিষ্ণু (receptive)—যদিও এ-ও খুব সহজ মনে কোরো না। তুমি নিজে পেতে পারলেই যে যা পেলে তা বিলোতে পারবে এমন কোনো কথা নেই। কারণ গ্রহণের ক্ষমতা এক ধরনের শক্তি, দানের ক্ষমতা অন্য ধরনের শক্তি। বলতে কি, দিতে পারা একটা বিশেষ শক্তি। কেউ হয়ত পারে ধারণ করতে, কিন্তু যা পেল তা বিলোতে পারে না —কেউ বা আবার কিছু পেতে চাইলেও ধারণ করতে পারে না। শেষকথা, সেইসব মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে কম যারা গ্রহণ করতেও সক্ষম আবার দান করতেও পটু। কাজেই দেখছ, সমস্যাটা আদৌ সহজ নয়, তুমি করবে কী? সবাই কি আনন্দ বা জ্ঞান চায় যে তুমি দেবে? সবাইয়ের আন্তর বিকাশ বা অধিকার তো সমান নয়। সুতরাং এ-বিশ্বজগতের দুর্দৈবের কোনো আশু সমাধান বা অমোঘ ঔষধ চমৎকার ক'রে বাৎলে দেওয়া অসম্ভব। ইতিহাসের পাতায়-পাতায় এ-কথার সাক্ষ্য মিলবে।"

শ্রীঅরবিন্দের কথা শুনতে মনে পড়ল বুদ্ধের এক গল্প। একজন সংশয়ী তার্কিক এসে তাঁকে বলেছিল: "নির্বাণ যদি আধিব্যাধি এমনি অমোঘ ওষুধ তবে সবাইকে দেন না কেন এ-বর?" বুদ্ধ

ওকথার উত্তর না দিয়ে শুধু বললেন: "ঘরে ঘরে একবার গিয়ে শুধিয়ে এসো—কে কী চায়?" সে ফিরে এসে বলল: "কেউ চাউল টাকা, কেউ যশ, কেউ স্ত্রী, কেউ ছেলে, কেউ স্বাস্থ্য—" বুদ্ধ বললেন: "নির্বাণ কি কেউ চেয়েছিল?" "কই না তো।" বুদ্ধ হেসে বললেন: "যে-বস্তু কেউ চায় না সে-বস্তু কেমন ক'রে তারে দেব বল দেখি?"

* * *

নিস্তব্ধতা ভাঙলাম আমিই, বললাম: "কিন্তু এই ব্যাপক দুঃখশোক ভয় কষ্ট—"

"এ সবের হেতু যদি হয় অজ্ঞান, আর যদি মানুষ জ্ঞান না চায়, তবে তাদের দুঃখ নিবারণ করবে তুমি কী ক'রে শুনি? যতদিন তারা অন্ধ আসক্তির কবলেই থাকতে চাইবে ততদিন তাদের ভুগতেই হবে—উপায় কী বলো? কর্ম করলে তার ফলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে কোন্ কৌশলে?"

"তাহ'লে আপনি সাধনা করছেন কিসের জন্যে? নিজের মুক্তি বা সিদ্ধির জন্য?"

"না। তাহ'লে আমার এত সময় লাগত না। আমি কিসের সাধনা করছি বললেও তুমি এখন বুঝতে পারবে না বা ভুল বুঝবে। তবে এইটুকু জেনে রাখো যে আমি চাই ঊর্ধ্বতর লোকের এমন কোনো আলো এজগতে আনতে, এমন কোনো শক্তি এখানে সক্রিয় করতে—যার ফলে মানবপ্রকৃতির মধ্যে হবে একটা খুব বড় রকমের অদলবদল, ওলটপালট: এমন কোনো দিব্যশক্তি যা এ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রকাশ্যভাবে সক্রিয় হয় নি।"

"আপনার নানা লেখায় এই শক্তিরই কি নাম দিয়েছেন অতিমানস—Supramental-শক্তি?"

"হ্যাঁ। তবে নাম নিয়ে কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে এমন কোনো দিব্যশক্তি যে এ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কাজ করতে পারে নি নানা কারণে।"

"যুগ অনুকূল ছিল কিনা?"

"তা-ও বটে, আরো অনেক কারণ আছে, কিন্তু সে-সব বললে ফের ভুল-বোঝারই সৃষ্টি হবে, কারণ যাকে আমি সুপ্রামেণ্টাল বলছি মন দিয়ে তার নাগাল পাওয়া যায় না ব'লেই ভাষা দিয়ে তার বিষয়ে বলতে গেলে জিনিসটা শোনাবে যেন হেঁয়ালি।"

"আগেকার যুগের যোগীরাও কি এ-অতিমানস শক্তির কথা জানতেন না?"

"কেউ কেউ জানতেন। কিন্তু—কী ক'রে তোমাকে বোঝাব—তাঁরা এ শক্তির সঙ্গে মিলিত হ'তেন নিজেরা তার রাজ্যে উঠে—তাকে আমাদের রাজ্যে নামিয়ে এনে নয়। এ শক্তি আমাদের চেতনায় অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে থাকুক এ চেষ্টাও হয়ত তাঁরা করেন নি। তবে এ সব কথা নিয়ে বেশি বলতে আমি চাই না এইজন্যে যে এ ধরনের আলোচনা শুধু পণ্ডশ্রম, কেননা মন দিয়ে এ সব তত্ত্বের নাগাল পাওয়া তো দূরের কথা আভাষ পাওয়াও সম্ভব নয়।"

"কিন্তু জগতের যে হাল হচ্ছে দিন দিন! আমি এসব বিষয়ে যুক্তিবাদী—rationalist—ক্ষমা করবেন তো?"

শ্রীঅরবিন্দ একটু হাসলেন, বললেন: "করব, কারণ আমি নিজেও জগতের শোচনীয় অবস্থার কথা বলেছি বহুবার। শুধু তাই নয়, অবস্থা যে আরো খারাপ হবে এ-ও আমি জানি। অনেক বড় বড় গুহ্যবিৎ যোগীরা বলেন যে জগতের অবস্থা যতই খারাপ হবে উপর থেকে এই প্রকাশ বা অবতরণের লগ্নও ততই কাছে আসবে। তবে আমাদের লৌকিক মন এসব জানবে কী ক'রে? সে হয় বিশ্বাস করবে, নয় অবিশ্বাস—দেখবে, হয় কি না হয়।

গীতার কথা মনে পড়ল: "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্" (যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখনই আমি অবতীর্ণ হই)। কিন্তু এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন রেখে শুধু বললাম: "এ শক্তির কাজ হবে কার ওপরে?"

"আমাদের দৈনন্দিন জীবনে—দৈহিক জগতে (Physical) বস্তুর (matter) 'পরে।"

"এ চেষ্টা কি আগেকার যোগীরা করেন নি?"

"অতিমানস শক্তির সাহায্যে না। তাঁরা দেহ ও বস্তুকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামান নি কেননা অধ্যাত্মশক্তি দিয়ে দেহের, বস্তুর রূপান্তর ঘটানো সবচেয়ে শক্ত। কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই এ কাজ করতে হবে।"

"ভগবান কি সত্যি চান বড় রকমের এমনি একটা কিছু ঘটুক?"

"চান বৈকি। এও আমি নিশ্চিত জানি যে অতিমানস—সত্য, তার আবির্ভাবও যথাসময়ে হবেই হবে। প্রশ্ন হচ্ছে কখন হবে ও কেমন ক'রে। সেটাও উপরওয়ালারা ঠিক ক'রে রেখেছেন—তবে নিচে আমরা তার জন্যে লড়ছি হাজারো বিরুদ্ধ শক্তির হানাহানির মধ্যে।"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না—ক্ষমা করবেন।"

শ্রীঅরবিন্দ বললেন: "কথাটা একটু কঠিন। হয়েছে কি জানো? এই পার্থিব জগতে যা হবে তা অনেক সময়েই প্রচ্ছন্ন থাকে, আমরা যা চাক্ষুষ করি সে-সব হ'ল হাজারো সম্ভাবনার সাজসজ্জা—দেখি নানান শক্তি চেষ্টা করছে কোনো কিছু ঘটাতে বা পেতে—যদিও এসবের লক্ষ্য-পরিণতি যে কী—মানুষের দৃষ্টি তার দিশা পায় না। তবে এটা বলা যায় যে এ যুগে অনেকগুলি মানুষ জন্মেছে—যাদেরকে পাঠানো হয়েছে—যাতে ক'রে এ যুগেই এ অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এই হ'ল ব্যাপার। আমার বিশ্বাস ও ইচ্ছা বলে যে এ যুগেই ঘটবে এ অঘটন। অবশ্য এখানে আমি বুদ্ধির পরিভাষারই কথা বলছি—মিস্‌টিক র‍্যাশনাল ভঙ্গিমায়।"

"কিন্তু আরো একটু না বললে—"

শ্রীঅরবিন্দ হাসলেন: "আর বললে সেটা হবে বেশি বলে ফেলা।"

"কিন্তু কবে হবে এ অঘটন ?"

"তুমি চাও আমি গণককারের ঢঙে কথা বলি ? রাশনাল হ'য়ে এ তোমার সাজে না।"

আমি বললাম : "তাই হয়ত আপনি আপনার Synthesis on Yoga বইটিতে লিখেছেন যে বাস্তব জগত আধ্যাত্মিকতার পথে বাধা ব'লেই যে বাস্তব জগতকে বিদায় দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই, কারণ অদৃশ্য নিয়তির বিধানে আমাদের সবচেয়ে বড় বাধাই হ'য়ে দাঁড়ায় আমাদের সবচেয়ে বড় সুযোগ।"

শ্রীঅরবিন্দ একথার উত্তর দিলেন না—শুধু একটু হাসলেন।

আমি বললাম : "কিন্তু বাস্তবজগতের এই যে আমূল রূপান্তর ঘটাতে আপনি চাইছেন, এ চেষ্টা কি কোনো যুগের কেউই করেন নি ?"

"চেষ্টা হয়ত হ'য়ে থাকতেও পারে, কিন্তু আজো কিছুই হয়নি।"

"কেমন ক'রে জানলেন ?"

"হ'য়ে থাকলে পরে যে-সব সাধক এসেছেন তাঁরা সে-সাধনার কিছু না কিছু ফল পেতেনই। কোনো আধ্যাত্মিক উপলব্ধি যদি একবার মানব চেতনায় পুরোপুরি অবতীর্ণ হয়—তাহ'লে পরে ফের হারিয়ে যেতে পারে না।"

"এ-শক্তিকে তা'হলে আপনার আগে তো নিজে উপলব্ধি করতে হবে ?"

"তা তো বটেই। যুগে যুগে সবদেশেই তো নূতন ভাব বলো, আলো বলো, আইডিয়া বলো নামে একজনেরই মধ্যে। তার থেকে দুজন—চারজন—দশজন—এমনি ক'রে ছড়িয়ে পড়ে। গীতাও তাই বলেছে 'যৎ যৎ আচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ'—শ্রেষ্ঠরা যা করবেন কনিষ্ঠেরা তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে। কিন্তু আমার যোগে ব্যক্তিগত উপলব্ধি থেকে হ'ল আমার কাজের আরম্ভ। অন্য অনেক যোগে উপলব্ধি—realisation—হ'ল চরম লক্ষ্য। আমার যোগে প্রকাশ

—manifestation-ই হ'ল মুখ্য উদ্দেশ্য। তার জন্যে, বলেছি আগে এই অতিমানস শক্তির নাগাল আমার পাওয়া চাই-ই। মানে সেখানে আমায় উঠতে হবে—কেবল সে-ওঠার লক্ষ্য হচ্ছে এ-শক্তিকে নামিয়ে আনা। আরোহণ চাই অবতরণের জন্যে।"

"এ-অবতরণের ফল ফলবে কী ভাবে?"

"আমাদের সত্তায় এ-শক্তির ছোঁয়াচ লাগলে আমাদের চেতনা আলো-আঁধারী মানসের কোঠা ছেড়ে উঠবে ধীরে ধীরে অতিমানসের মুক্ত আলোর কোঠায়। ফলে তার প্রভাবে মন প্রাণ ও দেহের হবে রূপান্তর। কারণ সে তার বস্তুজগতের উপর প্রভাব ফেলে ধীরে ধীরে আনবে যুগান্তর।

একথা বলতে আমাকে ভুল বুঝো না যেন। আমি বলছি না যে এই শক্তির অবতরণ হ'তে না হ'তে এ-জগতটা হয়ে উঠবে অতিমানস জগৎ বা সব মানুষের হ'য়ে যাবে পূর্ণ রূপান্তর। তা অসম্ভব।"

"আমরা পূর্ণ রূপান্তরের জন্যে এখনো প্রস্তুত নই ব'লে?"

"শুধু তাই জন্যে নয়—এ-রূপান্তরের পথে নানান দুস্তর বাধা আছে ব'লে। জড়জগৎ বস্তুর জগৎ হ'ল অন্ধকারের অচলায়তন—দুর্জয় দুর্গ, যুগ যুগ ধ'রে যেখানে তামসিকতা রাজত্ব ক'রে এসেছে—সেখানে আলোর সাড়া পৌঁছে দেওয়া সহজ কথা নয়। তবু এই অতিমানস শক্তি নিজের পথ নিজে ক'রে নিতে পারে যদি সে একবার নামতে পারে—অর্থাৎ যদি পার্থিব চেতনা তাকে একবার ধারণ করতে পারে।"

"পারলে এ-শক্তি সক্রিয় হবে প্রথমটায় কোথায়?"

"প্রথমে কয়েকজনের ওপর—এমন দু'চারজন, যারা খানিকটা প্রস্তুত হয়েছে, এ-শক্তির বাহন হবার সামর্থ্য অর্জন করেছে। তারা অনেকটা দেখাবে মানুষ কী হ'তে পারে—যদি তার সত্তার রূপান্তর ঘটে। বুঝতে পারছ কি?"

"একটু একটু পারছি বোধহয়। কেবল জিজ্ঞাসা করতে পারি

কি—এ-শক্তির কাজ হবে কি শুধু ঐ মুষ্টিমেয় জনকয়েকের ওপর, না অনেকের ওপর?”

“অনেকের ওপর তো বটেই। পূর্ণযোগ যদি মাত্র আমার মতন দু’একজনের জন্যে হ’ত, তা’হলে তার মূল্যও হ’ত খুবই কম। কেননা আমি তো আর এই বাস্তব জীবনকে ছাড়তে চাইছি না—চাইছি তার একটা আমূল গভীর পরিবর্তন।”

“কিন্তু, এ-পরিবর্তনের জন্যে আপনার পরবর্তীদেরও আপনার মতন অমানুষিক সাধনা করতে হবে না তো?”

শ্রীঅরবিন্দ হাসলেন: “না। আর করতে হবে না ব’লেই আমি বলেছিলাম অনেকদিন আগে যে, আমার যোগ শুধু আমার জন্যে নয়—সব মানুষের জন্যে। যাকে অচিন বনের মধ্যে দিয়ে প্রথম পথ কেটে চলতে হয় তাকে অনেক দুঃখই সইতে হয় পরবর্তীদের পথ সুগম করতে।”

আমার মনে পড়ল পরমহংসদেবের উপমা: আগুন যে করে তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়—কিন্তু সে-আগুন পোহায় যারা তারা বলে, কী আরাম!

মনে হঠাৎ গভীর সম্ভ্রম এল। মনে হ’ল এতবড় একজন রয়েছেন আমাদেরই মধ্যে অথচ জানে ক’জন? পরমহংসদেবের যুগে তাঁকেই বা চিনেছিল ক’জন? হঠাৎ প্রবল ইচ্ছা হ’ল ফের প্রণাম করতে। কিন্তু প্রাণপণে সে-উচ্ছ্বাসকে রাখলাম দাবিয়ে। শ্রীঅরবিন্দ একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে।

কেন জানি না এর পরেই ফের এল সন্দেহ, বললাম: “কিন্তু এ কি সত্যি সম্ভব?”

“এক আধজনের পক্ষে সম্ভব। আমি প্রত্যক্ষ করেছি”, ব’লে শ্রীঅরবিন্দ হাতের একটা ভঙ্গি করলেন জোর দিতে, “কী ভাবে এ প্রবল বিজয়ী শক্তির ক্রিয়া মুহূর্তে সে-সব প্রভাবকে দূর ক’রে দিতে পারে যারা আত্মাকে রাখতে চায় দেহের তাঁবে। উদাহরণত,

যদি কোনো যোগী বাইরের শক্তিজগৎ থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র ক'রে নিভৃতে থাকেন তা'হলে এখনি সবরকম রোগ থেকে তিনি মুক্তি পেতে পারেন।"

"কিন্তু বাইরে এলে পারেন না কেন?"

"কারণ বাইরে সর্বত্রই চারিয়ে রয়েছে রোগের আভাষ ইঙ্গিত—ফুশ্‌লানি।"

"কিন্তু আপনি কি মনে করেন এ একটা মস্ত সিদ্ধি? যদি তাই হ'ত তা'হলে আমাদের আধিব্যাধির শোকতাপের দৈহিক দিকটাকে ধরুন বুদ্ধদেবের মতন দ্রষ্টা পুরুষও এত নগণ্য মনে করতেন কি?"

"তুমি ভুলে যাচ্ছ যে বুদ্ধ জীবনকে দেখতেন সম্পূর্ণ অন্য চোখে, কাজেই তাঁর লক্ষ্যও ছিল ভিন্ন। তিনি চাইতেন নির্বাণ—অর্থাৎ এ ইন্দ্রিয়জগৎ থেকে নিষ্কৃতি। হ'তে পারে অবশ্য যে সে-যুগের পরিবেশে মানুষ নির্বাণের চেয়ে বড় উপলব্ধির অধিকারী ছিল না। কিন্তু হেতু যা-ই হোক না কেন তিনি যা চেয়েছিলেন সেটা জীবনলীলার প্রকাশচক্র থেকে অব্যাহতি। আমি চাই—জীবনের পূর্ণ রূপান্তর। আমার লক্ষ্য নয় বাস্তব জীবনকে পরিহার করা, আমার লক্ষ্য হ'ল বস্তুকে অধ্যাত্মের আলোয় রূপান্তরিত করা। আমাদের এই জড় দেহ আজও আত্মোপলব্ধির অন্তরায়। তাকে হ'তে হবে সহায়। পূর্ণযোগের এ হবে একটা প্রধান লক্ষ্য।"

খানিকক্ষণ কথা কইতে পারলাম না। মনের মধ্যে একটা আগ্রহ প্রবল হ'য়ে উঠল, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কুণ্ঠাও উঁকি দিল। না—কেমন যেন ভয়ও।

তবু বললাম: "কিন্তু—আমার সম্বন্ধে?" কি যে বলব মনস্থির করতে পারলাম না। মনে হ'ল সত্যি কি কিছু জানতে চাইছি? ঠিক যেন ঠাহর পেলাম না।

শ্রীঅরবিন্দ একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, পরে বললেন আরও

স্নিগ্ধ কণ্ঠে : "তোমার এখনো সময় হয় নি। তোমার মধ্যে যে তৃষ্ণা জেগেছে সে হ'ল মনের জিজ্ঞাসা—কিন্তু অন্তত আমার যোগে দীক্ষা পেতে হ'লে এর চেয়ে বেশি কিছু চাই। আরো কিছুদিন যাক না।"

দুঃখ হ'ল বৈকি—কিন্তু সেই সঙ্গে একটা স্বস্তি একটা আনন্দের ভাবও যে অনুভব করিনি একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে।

বললাম উঠে : সময় যদি পরে আসে—তাহ'লে আপনার একটু সাহায্য পাওয়ার আশা করতে পারি কি ?"

শ্রীঅরবিন্দ মৃদু হেসে শুধু একটু ঘাড় নাড়লেন।

* * *

সে সময়ে আশ্রমে সব জড়িয়ে পনের-ষোল জনের বেশি সাধক ছিলেন না। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের কথা হ'ত যথেষ্টই। কয়েকটি পত্রও পেয়েছিলাম, এঁদের কাছেই শ্রীঅরবিন্দের লেখা। তার মধ্যে একটি সেদিন আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে লেখা। পত্রটি শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন তাঁকে ১৯২২ সালে ১৮ই নভেম্বর তারিখে। সে চিঠি থেকে একটু এখানে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

Dear Chitta,

I think you know my present idea and the attitude towards life and work to which it has brought me. I see more and more manifestly that man can never get out of the futile circle the race is always treading, until he has raised himself on to a new foundation. I have become confirmed in a perception which I had, always, less clearly and dynamically then, but which has now become more evident to me, that the true basis of work and life is the spiritual : that is to say, a new consciousness to

be developed only by Yoga. But what precisely was the nature of the dynamic power of this greatet consciousness? What was the condition of its effective truth? How could it be brought down, mobilised, organised, turned upon life? How could our present instruments—intellect, mind, life, body—be made true and perfect channels for the great transformation? This was the problem I have been trying to work out in my own experience and I have now a sure basis, a wide knowledge and some mastery of the secret......I have still to remain in retirement. For I am determined not to work in the external field till I have the sure and complete possession of this new power of action—not to build except on a perfect foundation."

[ভাবার্থ: প্রিয় চিত্ত, তুমি আমার এখনকার ভাবধারা বোধ হয় জানো যার ফলে জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিভঙ্গি গেছে বদ্‌লে। যত দিন যাচ্ছে তত আমার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে এই সত্য যে, মানুষ যে ব্যর্থ চক্রে আবহমানকাল পরিক্রমণ ক'রে আসছে তা থেকে কখনই মুক্তি পাবে না—যতদিন না সে একটা নূতন সত্য ভিত্তির 'পরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমার এখন মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে—যা আমার আগেও ছিল, কেবল এত স্পষ্ট ও সক্রিয়ভাবে নয়—যে, জীবনের ও কর্মের সত্য বনেদ হ'ল আধ্যাত্মিক, কি না এমন একটা নব চেতনা যা কেবল যোগলভ্য। কিন্তু এই মহত্তর চেতনার প্রকৃতি ও সাধনশক্তি কী ধরনের? সে-সত্য সফল হবার সর্ত কী? কেমন ক'রে তাকে নামিয়ে এনে গ'ড়ে তুলে সুসংবদ্ধ ক'রে জীবনের উপর প্রয়োগ করা সম্ভব? কী-উপায়ে আমাদের এখনকার আধার—বুদ্ধি মন প্রাণ

দেহকে—এ মহৎ রূপান্তরের বাহন করা যায়?—এই সমস্ত সমস্যার মীমাংসাই আমি খুঁজছি আমার নিজের অভিজ্ঞতায়। এতদিনে এ সবের প্রতিষ্ঠাভূমি সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত হ'তে পেরেছি, রহস্য খানিকটা ভেদ করতে সক্ষম হয়েছি।...তবু আমাকে এখনো প্রচ্ছন্ন থাকতে হবে। কারণ বহির্জগতে আমি কাজ সুরু করব না যতদিন না এই নব সাধনশক্তির পূর্ণ অধিকার আমি পাই—গড়কে আরম্ভ করব না, যতদিন না গোড়াপত্তন হয় নিখুঁৎ।]

আরো কয়েকটি পত্র ছিল। পড়লাম রাতে পণ্ডিচেরির একটা হোটেলে ব'সে। আনন্দে, নেশায়, উৎসাহে ভালো ক'রে ঘুম হ'ল না। কেবলই মনে ঝল্‌কে উঠতে থাকে শ্রীঅরবিন্দের জ্যোতির্ময় মূর্তি, আর দেশবন্ধুকে লেখা এই পত্রের কথা।

* * *

পরদিন সকালে তাঁর কাছে গেলাম ফের।

বললাম: "কাল রাতে পড়েছিলাম ৺দেশবন্ধুকে লেখা আপনার চিঠিটি। কিছু যদি মনে না করেন তবে এ সম্বন্ধে আমার মনে যে দু'একটি সংশয় উঠেছে তার কথা—"

শ্রীঅরবিন্দ হেসে শুধু একটু হাত নেড়ে ভঙ্গি করলেন।

আমি বললাম: "দেশবন্ধুকে আপনি লিখেছেন যোগশক্তির ফলে একটা নব চেতনা মেলে। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে এ-চেতনার কি কোনো প্রত্যক্ষ ফল ফলে? যদি ফলে—অর্থাৎ যোগ ক'রে যদি কোনো শক্তিলাভ হয়—তবে কি প্রমাণ করা যায় যে অমুক অমুক অঘটন ঘটল শুধু এরই গুণে, নইলে ঘটত না?"

শ্রীঅরবিন্দ একটু হাসলেন: "অর্থাৎ তুমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাও—যে বহির্জগতে অমুক অমুক কার্য ঘটল অন্তর্জগতে যোগবলে অমুক অমুক শক্তির সক্রিয়তায়, এই না? এ-ধরনের প্রমাণ যোগজগতে খুঁজতে যাওয়া বৃথা। এ বিষয়ে প্রত্যেকে তার নিজের ধারণা অনুসারেই চলবে, কারণ এ-কথায় বিশ্বাস আসে যুক্তি ও প্রমাণ

প্রয়োগের ফলে নয়—আসে অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির ফলে, কিম্বা বিশ্বাসের ফলে, না হয় অন্তরে যে-অন্তর্দৃষ্টি আছে তারই ফলে—অথবা সেই গভীর বুদ্ধির আলোয় যে দেখতে শেখায় দৃশ্যমানের যবনিকার পিছনে যা যা ঘটছে। আধ্যাত্মিক চেতনা তো নিজেকে জানান দেবার জন্যে হাঁকডাক করে না—সে অঙ্গীকার করতে পারে সত্য কী—তাকে প্রত্যেকের মানতেই হবে এজন্যে লড়াই করে না।”

“আর একটা কথা কাল মনে হচ্ছিল। যোগের প্রেরণা বিনা আমরা জীবনে যা কিছু করি তার কি কোনো স্থায়ী মূল্য থাকতে পারে না?”

“তোমার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারছি না।”

“আমার প্রশ্নটা ‘আদেশ’ নিয়ে। পরমহংসদেব বলতেন, আদেশ না পেলে কোনো সত্যিকার বড় কাজ করা যায় না। কিন্তু যুগে যুগে দেশে দেশে আদেশ বিনাও তো মানুষ হাজারো কীর্তিকলাপে নিজেকে প্রকাশ করেছে। সে সবের কি কোনো সত্যিকার মূল্যই নেই বলবেন?—যেমন ধরুন, বিজ্ঞানে শিল্পে দর্শনে কাব্যে।”

শ্রীঅরবিন্দ বললেন: “যে কোনো দিকে মানুষ সত্যিকার সৃষ্টি করেছে—তার কিছু-না-কিছু মূল্য থাকবেই। ব্যাপারটা কি রকম বুঝিয়ে বলি।”

শ্রীঅরবিন্দ বাঁ হাতটা মেলে ধরলেন সোজা ক’রে। বললেন: “ধরো আমরা এই স্তরে কোনো কিছু গ’ড়ে তুলছি, কেমন? যখন এ-কাজ সত্যিকার কোনো সৃষ্টি হ’য়ে দাঁড়ায় তখন হয় কি, এর প্রবর্তনা আসে এর চেয়ে উচ্চস্তরের কোনো চেতনা থেকে—(ডান হাতটা বাঁ হাতের খানিকটা উপরে মেলে ধ’রে) অর্থাৎ এখান থেকে—যদিও যেটা গ’ড়ে উঠল সেটা রয়েছে এই (বাঁ হাতটা দেখিয়ে) নিচের স্তরে। কাজেই প্রতি সৃষ্টির কাজকে বলা যায় যোগ—কি না, উপরের স্তরের কোনো চেতনার সঙ্গে নিচের গ্রহীতা চেতনার একটা সেতু গ’ড়ে তোলা। মনের রাজ্যে মনের উপরের লোকের কোনো ধ্যানমূর্তিকে আবাহন করা—প্রতিষ্ঠা করা।”

মনে পড়ল 'Future Poetry'-তে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন: "The voice of poetry comes from a region above us, a plane of our being above and beyond our personal intelligence, a supermind which sees things in their innermost and largest truth by a spiritual identity. It is the possession of the mind by the supramental touch and the communicated impulse to seize this sight and word that creates the psychological phenomenon of poetic inspiration and it is the invasion of it by a superior power to that which it is normally able to harbour that produces the temporary excitement of brain and heart and nerve which accompanies the inrush of the influence."

[ভাবার্থ: "কবিতার স্বর আসে আমাদের উপরের এক রাজ্য থেকে—আমাদের ব্যক্তিগত বুদ্ধির উপরের কোনো স্তর থেকে—যেখানে এক অতিমানস চেতনায় প্রতি জিনিসের অন্তরতম ও বৃহত্তম সত্যকে দেখা যায় অধ্যাত্ম অভেদবোধে। তখন মনকে অধিকার করে এই অতিমানসের স্পর্শ—তার আবেগ এই দৃষ্টি ও শব্দকে নিজকীয় ক'রে নিয়ে সৃষ্টি করে কাব্যপ্রেরণার আন্তর অনুভূতি। আমাদের মস্তিষ্কে হৃদয়ে ও স্নায়ুতে যে-সাময়িক উত্তেজনা এই প্রেরণার অনুষঙ্গী হ'য়ে আসে তার উৎস হ'ল এই মহত্তর শক্তির স্পন্দন যাকে সহজ মুহূর্তে আমাদের মন ধারণ করতে পারে না।"]

মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা আত্মপ্রসাদের ভাব জেগে উঠেছিল। হঠাৎ চমক ভাঙল—তাকাতেই দেখি শ্রীঅরবিন্দের শান্ত দৃষ্টির আলো যেন বিছিয়ে রয়েছে আমার মাথায় চোখে মুখে। কি বলব ভেবে না পেয়ে বললাম: "তাহ'লে—মানে—শিল্প-সৃষ্টির কাজও একেবারে মূল্যহীন নয়?"

"মূল্যহীন হ'তে যাবে কেন? শিল্প যদি সত্যিকার শিল্প হয় তবে সে যে এই ইন্দ্রিয়লোকেই বহন ক'রে আনে অতীন্দ্রিয়ের আভাষ—বাণীতে, মন্ত্রে, ধ্যানে। অর্থাৎ যা জীবনে প্রচ্ছন্নই থেকে যায় বড় শিল্পে কাজ তাকেই উদ্‌ঘাটিত করা।"

মনে পড়ল শ্রীঅরবিন্দের 'Future Poetry'র আর একটি সুন্দর সংজ্ঞা: 'Poetical speech is the spiritual excitement of a rhythmic voyage of self-discovery among the magic islands of form and name in the inner and outer world."

("কবিতার বাণী ছন্দতরণী বাহিয়া চলে
আপনারে চায় নব নব ভায় লভিতে যে সে:
কত রূপ রঙ নামের দ্বীপ যে সমুচ্ছলে
বাহিরে ভিতরে—ফুটাতে সে ধায় সুর-আবেশে।")

"তাছাড়া', শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "প্রতি সত্যিকার সৃষ্টির কাজই তো এই—সে মানুষকে নিচের দৃষ্টি থেকে উত্তীর্ণ করে উপরের ধ্যানলোকে। এ হ'ল মুক্তির কাজ—চেতনার মুক্তি—যেমন যোগের বেলায়ও।"

"একথার মানে কি এই যোগ চেতনার যে-মুক্তি আনে তার ফলে সব মানুষই স্রষ্টা হ'য়ে উঠতে পারে?"

"এক হিসেবে তো বটেই। কারণ যোগ প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাগুলিকে তোলে ফুটিয়ে—যারা অনেক সময়ে আমাদের মধ্যে নিষ্ক্রিয়ই থেকে যায়। ফলে হয় কি, প্রত্যেকে স্পষ্ট দেখতে পায় কী তার করণীয়।"

"একথার তাৎপর্য কি এই যে যোগ না করলে যা যা আমি করতে পারতাম না, যোগ করলে সে সবই ক'রে ফেলতে পারব?"

"অতটা বলা চলে না—যদিও অসামান্য আধারে যোগবলে অসম্ভবও হয় সম্ভব—তবে সেরকম আধার খুবই বিরল। কিন্তু

যোগশক্তি অঘটনঘটনপটিয়সী হ'লেও পূর্ণযোগের আসল লক্ষ্য কিছু মিরাক্‌ল্ ঘটানো নয়—তার লক্ষ্য হ'ল আমাদের প্রতি জীবন-শক্তিকে শুদ্ধ নির্মল ক'রে তার চরম পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়া।"

"এ যদি হয় তবে তো যোগের ফলে শিল্পীর শিল্পকলার উৎকর্ষ হওয়া উচিত।"

"নিশ্চয়ই, আর হয়ও—যদি অবশ্য শিল্প তার সত্যিকার বাণী হয়। তোমাকে বলছিলাম না এইমাত্র যে যোগ মানে হ'ল আত্মোপলব্ধির পূর্ণচেতনা যার আলোয় সে দেখতে পায় সে কিসের জন্যে জন্মেছে—জানতে পারে তার আসল স্বাধিকার।"

"এ কি মানুষ সচরাচর জানতে পারে না—বুদ্ধির বিশ্লেষণ দিয়ে?"

"সব সময়ে নয়। কারণ বাসনামুক্তি না হ'লে অহঙ্কার না গেলে, বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না। যোগ দেয় এ শুদ্ধি—কেননা তার গোড়াকার কথা হ'ল বাসনা ও অহঙ্কারের অন্ধতা থেকে মুক্তি।"

"আর একটি মাত্র প্রশ্ন আছে—যদি অভয় দেন—অর্থাৎ র‍্যাশনালিস্ট ব'লে যদি সংশয় আমায় ক্ষমা করেন।"

শ্রীঅরবিন্দ হাসলেন: "বলো।"

"আচ্ছা, এই যে যোগবলের কথা প্রায়ই শুনি, যে তার ভেল্কি—মিরাক্‌ল্—ঘটাবার ক্ষমতা আছে, সে নয়কে হয় করতে পারে—এসব কি সত্যি আছে, না এসব ফন্দিবাজি—কানপাতলা লোকের গদগদ কল্পনা? কিছু মনে করবেন না, আমি হয়ত একটু ওদেশের প্রভাবে—"

শ্রীঅরবিন্দ স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন: "আমি নিজেও ওদেশের খবর কিছু রাখি হয়ত শুনে থাকবে। ওরা এসব বিষয়ে চায় বেবিকেও বাথ-ওয়াটারের সঙ্গে ফেলে দিতে। ফন্দিবাজি, ভেল আছে ব'লে মনে করে সবই তাই, অতএব দাও ভাগিয়ে।"

"কি জানো? মেকি ঝুটো কোথায় নেই এ-জগতে? কিন্তু ভেল আছে ব'লেই কি প্রমাণ হয় যে সাচ্চা ব'লেও কিচ্ছুই নেই? জনশ্রুতি আছে ব'লে সত্যশ্রুতিও সব নামঞ্জুর? এভাবে দেখতে

গেলে কোনো কিছুরই সত্য-নির্ণয় হয় না। যোগজ্ঞরা সবাই জানেন এসব শক্তি কত প্রত্যক্ষ কত সত্য। এদের সাক্ষ্যও এতই জোরালো যে এদেব অস্তিত্ব নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামানোর কথাও ভাবতে পারেন না।"

"কিন্তু ওদেশের সাক্ষ্যবিৎরা—"

"তাঁরা যে সাক্ষী মানেন শুধু বস্তুকে। বস্তুতান্ত্রিকতার থিওরিতে যার নাগাল পাওয়া যায় না তাকে ওঁরা বলবেন ডিশমিশ। সবাই নয় অবশ্য -তবে অনেকে। তবু হাল আমলে এঁরাও বুঝতে আরম্ভ করেছেন যে জীবন এত বহুবিচিত্র ও প্রকাণ্ড যে এভাবে তাকে না চলে বিচার করা, না যায় মেপে পাওয়া। তাছাড়া যে সব শক্তিকে তাঁরা চলতি ভাষায় ভেস্কিবাজি বলেন তারা আসলে তো ভেস্কি নয়, মানে অঘটন নয়—যদি কেবল তুমি মেনে নাও যে আমাদের অন্তঃশক্তি ইন্দ্রিয়পথে ছাড়াও অন্য পথে সক্রিয় হ'তে পারে। য়ুরোপে আমিও একসময়ে ছিলাম অবিশ্বাসী। কিন্তু এসব অঘটন যখন প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম তখন থেকেই আমি ওদের ভঙ্গিতে এসব ব্যাপারকে বিচার করা ছেড়ে দিলাম।"

"আবার এ-ও শুনতে পাই যে এসব শক্তিকে প্রয়োগ করলে আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষতি হয়?"

"ক্ষতি হবেই এমন কোনো কথা নেই। করছে কে—আর কোন প্রেরণায় তারই উপর সব নির্ভর করে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আত্মাভিমান থেকে, নিজের কোনো স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বা কোনো দেখানেপনার জন্যে যদি কেউ যোগবিভূতিকে জাহির করে তবে তাতে সমূহ ক্ষতি। কিন্তু যে-সব যোগীরা নির্বাসনা, নিরভিমান, গীতার ভাষায় 'সর্বভূতহিতেরতা' তারা এসব শক্তির প্রয়োগ করে—ওপরের আদেশে, নিচের আহ্বানে না। তাই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুরা শিষ্যদের দীক্ষা দেবার সময়ে বলেন সব আগে চাই অহঙ্কারমুক্তি বাসনামুক্তি—নৈলে এসব বিভূতি বিপদই টেনে আনে—হাজারো গুহ্য শক্তির

অপপ্রয়োগে। কিন্তু কোনো শক্তির ব্যভিচার হয় ব'লে যে সে-শক্তিই বর্জনীয় এমন কোনো কথা নেই। তা যদি হ'ত তাহ'লে তো বিজ্ঞানের সব আবিষ্কারই বর্জনীয় হ'ত। বৈজ্ঞানিক শক্তি দিয়ে ভ্রষ্ট বৈজ্ঞানিকরা বহু অন্যায় কাজ করছেন—সেজন্যে শক্তিকে দায়িক করা ভুল। যোগবিভূতির বেলায়ও ঐ কথা। (ভ্রষ্ট যোগীরা এসব বিভূতি ভগবানের কাজে না লাগিয়ে লাগাতে চায় স্বার্থসেবায়। কিন্তু মুক্ত যোগীরা কখনো এমন কাজ করেন না। তাঁদের শক্তি মানুষের ইষ্টই করে—অনিষ্ট কখনো না। কারণ মুক্ত যোগীর তো বাসনা নেই, অহঙ্কার নেই—তিনি যা-ই করেন তার প্রেরণা আসে ভাগবত চেতনা থেকে, মানুষী চেতনা থেকে তো নয়)।'

*　　　*　　　*

প্রণাম ক'রে চ'লে এলাম। রাত্রে ট্রেন ধরলাম মাদ্রাজের। শেক্সপীয়রের একটি কথা কেবলই ভেসে উঠছিল থেকে থেকে :

When he shall die,
Take him and cut him out in little stars
And he will make the face of heaven so fine
That all the world will be in love with night,
And pay no worship to the garish sun.

যেদিন সে পুণ্য দেহখানি রক্ষা করিবেন তিনি
রচিও তাহার প্রতি কণা দিয়ে একেকটি তারা
তাহ'লে নীলিমাননে উদ্ভাসিবে এমন সুষমা
নিরখি' যাহারে সবে সন্ধ্যারে করিবে মাল্যদান
না চাহি' অর্চিতে আর আলোক-উদ্ধত সূর্যরাজে।

অত্যন্ত অনাড়ম্বর ছিল শ্রীঅরবিন্দের জীবন। পান থেকে চুন খসলেই যাদের পিত্তি জ্বলে ওঠে, তিনি তাদের মতো নন। পোশাকে, আহারে, কোনোদিকেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না তাঁর, কারণ এগুলো তাঁর কাছে নেহাৎ গৌণ ছিল। কাপড় কিনতে কোনোদিন তিনি বাজারে যান নি। বাড়িতে তিনি সাধারণ চাদর আর ধুতি পরতেন, আর বাইরে যাবার সময় সাদা ড্রিলের স্যুট। আমাদের মতো কখনোই তিনি নরম বিছানায় শুতেন না, শুতেন নারকেলের ছোবড়ার ওপর মালাবার ঘাসের মাদুর বিছিয়ে।

একদিন আমি ওঁকে জিগ্‌গেস করেছিলাম, অমন শক্ত বিছানায় উনি শোন কেন, তার উত্তরে তিনি স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বললেন, "জানো না, আমি ব্রহ্মচারী? আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মচারীর নরম বিছানা ব্যবহারে নিষেধ আছে।"

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেছিলাম—অর্থ সম্বন্ধে কোনো-রকম আকর্ষণই ছিল না তাঁর। এপ্পটা থলি ভরে তিনি একসঙ্গে তিন মাসের মাহিনা নিয়ে এসে ঢেলে রেখে দিতেন একটা বারকোশের ওপর। টাকা কখনো তালা-চাবি দিয়ে বাক্সে রাখতেন না। খরচপত্রের কোনো হিসেবও রাখতেন না তিনি। একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমি জানতে চাইলাম, উনি অমনভাবে টাকা ফেলে রাখেন কেন? হেসে তিনি বললেন, "আমরা যে সৎ সহৃদয়সঙ্গে রয়েছি, এতেই কি তার প্রমাণ পাই না?" "কিন্তু হিসেব তো আপনি কখ্‌খনো রাখেন না, কী করে টের পান যে সৎসঙ্গেই রয়েছেন?"—আমি ওঁকে জিগ্‌গেস করলাম। প্রশান্ত বদনে উনি বললেন, "আমার হিসেব ভগবান রাখেন। আমার যতটুকু প্রয়োজন ঠিক সেইটুকু দিয়ে, বাকিটা উনি নিজের কাছে রেখে দেন। আর যাই হোক, আমার কোনো অভাব তো ভগবান ঘটতে দেন না; তবে কেন আমি উতলা হব?"

পড়তে-পড়তে তিনি এতদূর তন্ময় হয়ে যেতেন যে আশেপাশের আর সবকিছুই ভুলে যেতেন। একদিন সন্ধ্যেবেলা চাকর এসে তাঁর টেবিলে খাবারের থালা সাজিয়ে রেখে বলে গেল, "সার্, খানা রাখ্খা হ্যায়।" উনি শুধু বললেন, "আচ্ছা।" একটিবার মুখও তুললেন না। আধ ঘণ্টাটেক বাদে এঁটো বাসন নিয়ে যাবে বলে চাকর এসে অবাক হয়ে গেল—টেবিলের থালা যেমন ছিল, তেমনি পড়ে আছে। মনিবকে আর বিরক্ত না করে সে চুপিচুপি এসে আমায় খবর দিল। ওঁর ঘরে গিয়ে আমি ওঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে। মৃদু হেসে টেবিলে গিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলেন, তারপর আবার গিয়ে পড়তে বসলেন।

ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে তাঁর ছাত্র হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অভাবনীয় ছিল তাঁর শেখাবার পদ্ধতি। প্রথমে তিনি পাঠ্য বিষয়বস্তুটির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয়সাধনের উদ্দেশ্যে অনেকগুলি লেকচার দিতেন। তারপর টেক্সট্‌টি পড়া শুরু করতেন, এবং কঠিন শব্দ বা বাক্য থাকলে তার অর্থ বুঝিয়ে দিতেন। তারপর বিষয়বস্তুটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কয়েকটি জেনারেল লেকচার দিতেন।

কিন্তু তাঁর ক্লাস-লেকচারগুলোর চেয়েও উপভোগ্য ছিল মঞ্চের উপর তাঁর ভাষণ। কলেজের বিতর্ক-সমিতির সভায় প্রায়ই তাঁকে সভাপতিত্ব করতে হ'ত। তিনি যখন বলতে শুরু করতেন, কলেজের বিশাল কেন্দ্রীয় হলটিতে তিলধারণের ঠাঁই থাকত না। তিনি বাগ্মী ছিলেন না, কিন্তু অত্যন্ত উঁচুদরের বক্তা ছিলেন: তাঁর প্রতিটি শব্দই শ্রোতারা শুনতেন একাগ্র নিবিষ্টচিত্তে। সামান্যতম অঙ্গভঙ্গীও করতেন না তিনি; ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, আর তাঁর ওষ্ঠ থেকে বাণীর প্রবাহ নেমে আসত সহজ সুন্দরভাবে, সাবলীল সুরের মতো—যা শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত।...যদিও সে বাণী শুনেছি আজ পঞ্চাশ বছরেরও আগে, এখনো তবু মনে পড়ে তাঁর সেই মূর্তি আর তাঁর সুরেলা কণ্ঠের রজত-নিক্বণ।

অরোদাদার কথা — বাসন্তী চক্রবর্তী

প্রতি পূজার ছুটিতে অরোদাদা [শ্রীঅরবিন্দ] বরোদা হতে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হতেন। ছুটি যতদিন না ফুরাতো তিনি দেওঘরে থাকতেন। আমি তখন স্কুলে পড়ি। বয়স কম, সব বিষয়েই আমার কৌতূহল—অরোদাদা দুই-তিনটা ট্রাঙ্ক নিয়ে আসতেন।

আমি ভাবতাম না জানি ঐ বাক্সগুলির মধ্যে কত রকমের সুন্দর সুন্দর দামী সুদ-কোট্ নানারকম শৌখিন জিনিস আছে। তিনি যখন বাক্সগুলি খুলতেন, আশ্চর্য হয়ে দেখতাম—একি! বাক্সের মধ্যে মাত্র কয়েকখানি পরিধেয় বস্ত্র, তা ছাড়া—শুধু বই আর বই। ভাবতাম, বাবা! অরোদাদার এত বই পড়তে ভাল লাগে! ছুটির সময় আমরা শুধু গল্প করতে খেলতে ভালবাসি—এই সুন্দর সময়ে অরোদাদা বই পড়ে দিন কাটাবে! পড়তে ভালও লাগবে!...বই পড়তে তিনি এত ভালবাসতেন বলে তিনি যে আমাদের সঙ্গে গল্প-গুজবে ও হাসিতে যোগ দিতেন না, তা নয়। তাঁর কথার মধ্যে বেশ humour ছিল। তাঁর চিঠিগুলিও বেশ humour-এ ভরা থাকতো।

...মহারাজা গায়কোয়াড় তাঁকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন ও ভালবাসতেন; তাঁর কাছে সর্বদা "my dear feiend" বলে চিঠি দিতেন।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শীতের প্রারম্ভে, বোধ হয় পূজার কয়েক সপ্তাহ পর, আমি অরবিন্দকে বাংলা ভাষা শিখাইবার ভার লইয়া বরোদায় যাই। সে বার বৎসর পূর্বের কথা। অরবিন্দ আবাল্য ইংলণ্ডপ্রবাসী, পাঁচ ছয় বৎসর বয়স হইতে যৌবনারম্ভের পর পর্যন্ত বিলাতেই ছিলেন ; এজন্য মাতৃভাষা শিক্ষার তেমন সুযোগ পান নাই। বাল্যকাল হইতে মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ থাকায় ভাল করিয়া বাংলা শিখিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল। যিনি ইউরোপের নানা ভাষায় সুপণ্ডিত, তিনি মাতৃভাষায় একখানি চিঠি লিখিতে পারেন না, এমন কি বাঙালীর মত বাংলা কথা বলিতেও পারেন না, ইহা বোধ হয় তিনি অমার্জনীয় ত্রুটি মনে করিতেন। সেই জন্য অরবিন্দের মাতুল স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু (প্রাতঃস্মরণীয় ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র) মহাশয় আমাকে অরবিন্দের বাংলা ভাষার "গুরুমশায়গিরি" করিবার যোগ্যপাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে রাজনারায়ণবাবু তাহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। তদনুসারে আমি কলিকাতা হইতে অরবিন্দের সঙ্গেই দেওঘর যাই।...

অরবিন্দকে বাংলা পড়াইতে হইবে ভাবিয়া প্রথমে আমার বড় ভয় হইয়াছিল। অরবিন্দ প্রগাঢ় পণ্ডিত লোক, সিভিল সার্বিসের পরীক্ষায় তিনি লাটীন ও গ্রীকে এত অধিক নম্বর পাইয়া সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন যে তাঁহার পূর্বে দেশী বিলাতী কোনও পরীক্ষার্থীই উক্ত দুই ভাষায় তত বেশী নম্বর (Record mark) পান নাই। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অরবিন্দ রাশি রাশি পুস্তক "প্রাইজ" পাইয়াছিলেন।

অরবিন্দকে দেখিবার পূর্বে তাঁহার যে মূর্তি কল্পনা করিয়া

লইয়াছিলাম তাহা এইরূপ ;—সাহিত্য-সম্পাদক বন্ধুবর সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের ন্যায় প্রকাণ্ড জোয়ান ; চোখে চশমা, অধিকন্তু আপাদ-মস্তক হ্যাটকোটবুটে মণ্ডিত ; মুখে বাঁকা বাঁকা বুলি, চক্ষুতে কট-মট চাহনি, মেজাজ ভয়ঙ্কর রুক্ষ ! মনে হইয়াছিল "পান হইতে চূণটুকু খসিলেই" বুঝি সর্বনাশ ! বিলাত দূরের কথা, বোম্বাই পর্যন্ত না গিয়াই অনেকে যখন "অনুকরণে"র মোহে উৎকট "গোরাত্ব" লাভ করে, তেলাপোকা কাঁচপোকা হইয়া যায়,—তখন আঠারো বিশ বৎসর বিলাতে বাস করিয়া অরবিন্দ না জানি কি বিকট জানোয়ারত্ব লাভ করিয়াছেন ভাবিয়া হৃৎকম্প হইল।

সুতরাং বলা বাহুল্য, অরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতে বড়ই নিরাশ হইয়াছিলাম। তখন কে ভাবিয়াছিল যে, পায়ে শুঁড়ওয়ালা সেকেলে নাগরা জুতা, পরিধানে আহমেদাবাদের মিলের বিশ্রী পাড়ওয়ালা মোটা খাদি, কাছার আধখানা খোলা, গায়ে আঁটো মেরজাই, মাথায় লম্বা লম্বা গ্রাবাবিলম্বিত বাবরীকাটা পাতলা চুল, মধ্যে চেরা সিঁথি, মুখে অল্প অল্প বসন্তের কাগ, চক্ষুতে কোমলতাপূর্ণ স্বপ্নময় ভাব, শ্যামবর্ণ ক্ষীণদেহধারী এই যুবক ইংরেজী, ফরাসী লাটিন, হিব্রু, গ্রীকের সজীব ফোয়ারা শ্রীমান অরবিন্দ ঘোষ দেওঘরের পাহাড় দেখাইয়া যদি কেহ বলিত,—"ঐ হিমালয়", তাহা হইলেও বোধ হয়, ততদূর বিস্মিত ও হতাশ হইতাম না !—যাহা হউক, দুই একদিনের ব্যবহারেই বুঝিলাম, অরবিন্দের হৃদয়ে পৃথিবীর হীনতা ও কলুষতা নাই। তাঁহার হাসি শিশুর হাসির মত সরল তরল ও সুকোমল। হৃদয়ের অটল সঙ্কল্প ওষ্ঠপ্রান্তে আত্মপ্রকাশ করিলেও মানবের দুঃখে আত্মবিসর্জনের দেবদুর্লভ আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন সে হৃদয়ে পার্থিব উচ্চাভিলাষের বা মনুষ্যসুলভ স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই। অরবিন্দ তখনও বাংলায় কথা বলিতে পারিতেন না ; কিন্তু মাতৃভাষায় কথা কহিবার জন্য তাঁহার কী প্রগাঢ় ব্যাকুলতা !—দিবারাত্রি একত্র বাস করিয়া ক্রমে যতই অরবিন্দের হৃদয়ের পরিচয়

পাইতে লাগিলাম, ততই বুঝিতে পারিলাম, অরবিন্দ এ পৃথিবীর মানুষ নহেন; অরবিন্দ শাপভ্রষ্ট দেবতা। ভগবান কি ভাবিয়া তাঁহাকে বাঙালী করিয়া অভিশপ্ত ভারতে নির্বাসিত করিয়াছিলেন তা' তিনিই বলিতে পারেন। বাল্যকালে মাতৃক্রোড়ে আরোহণ করিয়া যিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন এবং যৌবনারম্ভের অনেক পরে স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন, বিলাতী সমাজের ব্যসন ও বিলাসিতা, চাকচিক্য, বিবিধ সংস্কার এবং বিচিত্র মোহ তাঁহার মনুষ্যত্ব-মণ্ডিত উদার হৃদয় স্পর্শও করিতে পারে নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য মনে হইল।...

অরবিন্দ কখনও সাজ-পোশাকের পক্ষপাতী ছিলেন না, বিলাসিতার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না; এমন কি রাজদরবারে যাইবার সময়ে তাঁহাকে সাধারণ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতে দেখি নাই! তাঁহার শয্যাও তাঁহার পরিচ্ছদের ন্যায় নিতান্ত সাধারণ ও আড়ম্বরহীন ছিল। তিনি যে লৌহখট্টায় শয়ন করিতেন, ত্রিশ টাকা মূল্যের কেরাণীও সে খট্টায় শয়ন করা অগৌরবের বিষয় মনে করে! কোমল ও স্থূল শয্যায় শয়নে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। বরোদা মরুসন্নিহিত স্থান বলিয়া সেখানে শীত-গ্রীষ্ম উভয়ই অত্যন্ত প্রবল; কিন্তু মাঘ মাসেব শীতেও অরবিন্দকে কোনও দিন লেপ ব্যবহার করিতে দেখি নাই। পাঁচ-সাত টাকা মূল্যেব একখানি নীল আলোয়ান তাঁহার শীতবস্ত্র ছিল। যতদিন তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছি, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য-নিরত পরদুঃখকাতর আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্য কিছু মনে হইত না; যেন জ্ঞানসঞ্চয়ই তাঁহার জীবনের ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য কর্মকোলাহলমুখরিত সংসারে থাকিয়াও যেন তিনি কঠোর তপস্যায় মগ্ন।

অরবিন্দ চিরদিনই অর্থকে তুচ্ছ মনে করিয়া আসিয়াছেন। আমি যে সময় বরোদায় ছিলাম, সে সময়েও অরবিন্দ অনেক টাকা বেতন পাইতেন। তিনি একা মানুষ, বিলাসিতার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না, একটি পয়সারও অপব্যয় ছিল না; তথাপি মাসের শেষে

তাঁহার হাতে এক পয়সাও থাকিত না। অনেক সময় তাঁহাকে বন্ধুগণের নিকট টাকা ধার করিতে দেখিয়াছি। তিনি বেতন পাইলে সর্বাগ্রে তাঁহার মাতা ও ভগিনীকে খরচের টাকা পাঠাইতেন। কখন কখন অসময়েও তাঁহাদের কাছে অরবিন্দকে মনি-অর্ডার করিতে দেখিয়াছি। মায়ের প্রতি অরবিন্দের অসাধারণ ভক্তির পরিয়ে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এক এক সময় তিনি হাসিয়া বলিতেন, "আমি পাগল মায়ের পাগ্‌লা ছেলে!" তাঁহার সহোদরা, তাঁহার মাস্‌তুতো ভগিনী প্রভৃতি সকলকেই তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; তাঁহাদিগকে পত্রাদি লিখিতেন, টাকা পাঠাইতেন।

এমন অদ্ভুত পাঠানুরাগ আমি আর কাহারও দেখি নাই। অধিক রাত্রি পর্যন্ত কাব্যালোচনায় রত থাকিতেন বলিয়া অরবিন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইতে একটু বেলা হইত। চারি-পাঁচ টাকা মূল্যের একটা মুখখোলা "ওয়াচ" সর্বদাই তাঁহার কাছে থাকিত; পড়িবার টেবিলে একটি ছোট টাইমপীস ঘড়ি থাকিত। অরবিন্দ সকালে চা খাইয়া কবিতার খাতা খুলিয়া বসিতেন। এই সময়ে তিনি মহাভারতের অনুবাদ করিতেছিলেন। বাংলা ভাল বুঝিতে না পারিলেও, সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত তিনি সুন্দর বুঝিতে পারিতেন। তিনি ধারাবাহিকরূপে অনুবাদ করিতেন না। মহাভারতের এক একটি উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিতেন; ইংরেজীর নানা ছন্দে কবিতা লিখিতেন। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার। তাঁহার ইংরেজী কবিতাগুলি সরল ও মধুর; বর্ণনা অতি পরিস্ফুট ও অতিরঞ্জন-বিরহিত। শব্দ-চয়নের শক্তিও তাঁহার অসামান্য। তিনি কখনও শব্দের অপপ্রয়োগ করিতেন না। ছোট আকারের 'গ্রে-গ্রানাইট' রঙের চিঠি-লেখার কাগজে প্রথমে কবিতাগুলি লিখিতেন; প্রায়ই কাটাকুটি করিতেন না। লিখিবার পূর্বে সিগারেট টানিতে টানিতে খানিকটা ভাবিয়া লইতেন; তাহার পর তাঁহার লেখনীমুখে ভাবের মন্দাকিনী প্রবাহিত হইত। তিনি দ্রুত লিখিতে পারিতেন না বটে

কিন্তু লিখিতে আরম্ভ করিয়া লেখনীকে বিরাম দিতেন না। সে সময় কেহ তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে বিরক্ত হইতেন; কিন্তু সে বিরক্তি অন্যে বুঝিতে পারিত না। অরবিন্দকে কখনও রাগ প্রকাশ করিতে দেখি নাই। কোন রিপুকেই তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখা যাইত না। বিস্তর সাধনা ভিন্ন মানুষ এরূপ আত্মজয়ী ও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না। যেদিন তাঁহার কবিতা মনের কত সুন্দর হইত সেদিন তাঁহাকে প্রফুল্ল দেখিতাম। এক একদিন কোন কোন কবিতা আমাকে পড়িয়া শুনাইতেন; তাহা মূলানুগত হইয়াছে কি না বুঝাইবার জন্য রামায়ণ বা মহাভারত খুলিয়া মূল কবিতাও পড়িতেন। ব্যাস অপেক্ষা আদিকবি বাল্মীকির তিনি অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। বাল্মীকির ন্যায় মহাকবি পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই, ইহাই তাঁহার ধারণা। কবিত্বে বাল্মীকির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য একবার তিনি ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; তিনি বলিতেন, "মহাকবি দান্তের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, হোমারের ইলিয়াড্ পাঠে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম; ইউরোপের সাহিত্যে তাহা অতুলনীয়; কিন্তু কবিত্বে বাল্মীকি সর্বশ্রেষ্ঠ। রামায়ণের তুল্য মহাকাব্য পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই।"

বরোদার ইতর-ভদ্র সকলেই মিঃ ঘোষের নাম জানিত। যাহারা তাঁহাকে চিনিত, তাহারা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। বরোদার শিক্ষিত সমাজ তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার সম্মান করিতেন; মারাঠা-সমাজে অরবিন্দ বাঙালীর গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। বরোদার ছাত্র-সমাজে অরবিন্দ দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ অপেক্ষা এই বাঙালী অধ্যাপক ছাত্র-সমাজের অধিকতর সম্মান ও বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনার প্রণালীতে তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিল।...কলিকাতার হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও ভিন্ন এ পর্যন্ত আর কোনও শিক্ষক অরবিন্দের ন্যায় ছাত্র-সমাজের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা ও বিশ্বাস অর্জন করিতে পারিয়াছেন কিনা, জানি না।

খাপ্‌রার ঘরে বাস করা শীত-গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই কষ্টকর। গ্রীষ্মকালে দুঃসহ রৌদ্রে খাপ্‌রা তাতিয়া আগুনের মতো হইত। আমি সেই উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া সর্বাঙ্গে ভিজা গামছা জড়াইয়া বসিয়া থাকিতাম। আবার শীতকালে এমন কন্‌কনে শীত যে, যেন বুকের রক্ত পর্যন্ত জমিয়া যাইবার উপক্রম হইত। কিন্তু অরবিন্দ শীত-গ্রীষ্মে সমান নির্বিকার। কি শীতে, কি গ্রীষ্মে, একদিনও তাঁহাকে কাতর দেখি নাই। এই বাংলোতে দিনে মাছি ও রাত্রে মশার উপদ্রবে আমি অস্থির হইয়া উঠিতাম। রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া মনে হইত মশাগুলা আমাকে মাঠে টানিয়া লইয়া গিয়া শোষণ করিবে। ঘরের খাপ্‌রাগুলি পুরাতন; ঘরখানি বহুদিন অসংস্কৃত অবস্থায় খালি পড়িয়া ছিল। বর্ষাকালে খাপ্‌রার ভিতর দিয়া মেঝেতে টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িত। আমাদের দেশের অনেক বড়লোকের গোশালাও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান। কিন্তু এমন কদর্য গৃহে বাস করিতে অরবিন্দের বিন্দুমাত্র আপত্তি বা কুণ্ঠা দেখি নাই। তিনি নির্বিকারচিত্তে দীর্ঘকাল সেই জীর্ণ গৃহে বাস করিয়াছিলেন; অরবিন্দ রাত্রি একটা পর্যন্ত দুঃসহ মশক-দংশন উপেক্ষা করিয়া, টেবিলের ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া, 'জুয়েল ল্যাম্প'-এর আলোকে সাহিত্যালোচনা করিতেন। তাঁহাকে পুস্তকের উপর বদ্ধদৃষ্টি অবস্থায় একই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া সেই স্থানে উপবিষ্ট দেখিতাম। যোগনিমগ্ন তপস্বীর ন্যায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ঘরে আগুন লাগিলেও বোধ হয় তাঁহার হুঁস হইত না। তিনি এইভাবে প্রতিদিন রাত্রি জাগরণ করিয়া ইউরোপের নানা ভাষার কত কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন পাঠ করিতেন তাহার সংখ্যা ছিল না। অরবিন্দের পাঠাগারে ইউরোপের নানা ভাষায় গ্রন্থ স্তূপীকৃত ছিল। ফরাসী, জার্মান, রুশীয়, ইংরেজী, গ্রীক, লাটিন, হিব্রু প্রভৃতি কত ভাষার কত রকমের পুস্তক, তাহার পরিচয় আমার জানা ছিল না। চসার হইতে সুইন্‌বরণ পর্যন্ত সকল ইংরেজ কবির কাব্যগ্রন্থ তাঁহার

পাঠাগারে সঞ্চিত ছিল। অসংখ্য ইংরেজী উপন্যাস আলমারীতে, গৃহকোণে, স্টীল ট্রাঙ্কে পুঞ্জীভূত ছিল। হোমারের ইলিয়াড্, দান্তের মহাকাব্য, আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের গ্রন্থাবলী—সমস্তই অরবিন্দের পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল। রুশীয় ভাষার তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন—কি চিত্রশিল্পে, কি সাহিত্যে, রুশিয়া একদিন ইউরোপে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। কথাটা আমার নূতন মনে হইত। তিনি কোনও সপ্তাহে দুই-এক দিন বাঙলা পড়িতেন, আবার দশ-পনের দিন ধরিয়া বাঙলা পুস্তক খুলিতেনও না। আমি নিজের কাজে সময় কাটাইতাম।...

বাঙলা একটু ভালরকম শিখিয়া অরবিন্দ "স্বর্ণলতা", ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল", দীনবন্ধুর "সধবার একাদশী" প্রভৃতি পুস্তক পাঠে মনসংযোগ করেন।...

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অরবিন্দ নিজেই পড়িতেন; বেশ বুঝিতে পারিতেন। বঙ্কিমের প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। তিনি বলিতেন, "বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অতীত ও বর্তমানের ব্যবধানের উপর সুবর্ণ-সেতু।" অরবিন্দ ইংরেজীতে একটি সুন্দর সনেট লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বাঙলা প্রবন্ধগুলি পাঠে বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতেন; আমাকে বলিতেন, স্বামীজীর ভাষায় প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, ভাষার ভাবের এরূপ ঝঙ্কার, শক্তি ও তেজ অন্যত্র দুর্লভ। অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীও কিনিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। আমাদের এই কোকিল কবির প্রতিও তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সকল কবিতাই প্রকাশের যোগ্য বলিয়া তাঁহার মনে হইত না। আমার বরোদা গমনের অনেক পূর্ব হইতেই শ্রদ্ধেয় কবিবরের সহিত আমার পত্র-ব্যবহার ছিল। বরোদা হইতেও আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে পত্র লিখিতাম। যথা-নিয়মে উত্তরও পাইতাম। তাহাতে মধ্যে মধ্যে অরবিন্দের কথাও

থাকিত; কিন্তু তখন পর্যন্ত অরবিন্দের সহিত তাঁহার চাক্ষুষ পরিচয়ের সুযোগ হয় নাই, এজন্য তিনি দুঃখও করতেন।...

কলিকাতার গুরুদাসবাবুর পুস্তকালয় হইতে আমি অরবিন্দের জন্য অনেক পুস্তক আনাইতাম। বসুমতী অফিস হইতে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই তিনি গ্রহণ করিতেন। তখনও বসুমতীর বাল্যজীবন অতীত হয় নাই; কিন্তু অন্যান্য সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে বসুমতীর প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। বসুমতীর ভাষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন...পাঁচকড়িবাবুর (বন্দ্যোপাধ্যায়) সরস টিপ্পনী পাঠ করিয়া অরবিন্দ খুব আমোদ পাইতেন।...

বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী আত্মারাম রাধাবাঈ সেগুন ও থ্যাকারে কোম্পানী অরবিন্দকে পুস্তক সরবরাহ করিতেন। তাঁহারা প্রতি মাসে, কখনও কখনও প্রতি সপ্তাহেই নূতন নূতন পুস্তকের সুদীর্ঘ তালিকা অরবিন্দের নিকট পাঠাইতেন; অরবিন্দ সেই তালিকা দেখিয়া পছন্দমত পুস্তকের নাম নির্বাচন করিয়া অর্ডার পাঠাইতেন। বেতন পাইলেই তিনি প্রতি মাসে ৫০৲।৬০৲ টাকা বা ততোধিক টাকা মনি-অর্ডার যোগে পুস্তক বিক্রেতৃগণের নিকট পাঠাইতেন। তাঁহারা Deposit account system-এ অরবিন্দের বরাতী পুস্তকগুলি পাঠাইয়া দিতেন। অরবিন্দের পুস্তক কদাচিৎ 'বুকপোস্টে' আসিত; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্যাকিং-বাক্সে বোঝাই হইয়া 'রেল পার্সেলে' পুস্তকগুলি আসিত। অরবিন্দ সেই সকল কেতাব আট-দশ দিনের মধ্যে পড়িয়া ফেলিতেন। আবার নূতন নূতন পুস্তকের অর্ডার যাইত। এমন সর্বভুক (voracious) পাঠক আর কখনও দেখি নাই। পরে যাঁহারা অরবিন্দকে প্রকাণ্ড রাজদ্রোহী বা বিপ্লববাদের প্রবর্তক মনে করিয়া তাঁহার প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিতেন...শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, অরবিন্দের পুস্তকাগারস্থ সেই অগণ্য গ্রন্থ-স্তূপের মধ্যে বিপ্লববাদের সমর্থক কোনও গ্রন্থ—revolutionary literature—আমি কোনও দিন দেখিতে পাই নাই। মহামহিমান্বিত ব্রিটিশ

রাজশক্তির প্রতি অবজ্ঞাসূচক কোনও উক্তি কোনও দিন তাঁহার মুখে শ্রবণ করি নাই। ইংরাজের সিভিল-সার্ভিসে প্রবেশের অধিকারে বঞ্চিত হইয়া তিনি গভর্নমেণ্টের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন…এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়াই আমার ধারণা।…

প্রত্যহ বহু লোকের ভীড় লাগত অরবিন্দকে দেখবার জন্য। এতে তাঁর সাধনার একটু অসুবিধা হয় বলে তিনি আমায় জানালেন। আমিও একটু-আধটু অসুবিধায় পড়লাম—কি করে তাঁদের মানা করি। বিনীতভাবে অনেককে বিদায় করলাম—সকলকে পারতাম না। বাঙালী ছাড়া অনেক মাড়োয়ারীও আসত।

একদিন বেলা প্রায় বারটার সময় একজন মাড়োয়ারী, বেশ সৌম্যদর্শন, এসে হাজির, অরবিন্দের সঙ্গে কথা কইতে চান। বিনীতভাবে তাঁকে অনুরোধ করলাম এক ঘণ্টা পরে আসবার জন্য। তিনি নাছোড়বান্দা!—'বেশ, এই বৈঠকখানা ঘরে বসে তোমার সঙ্গে কথা কই, এক ঘণ্টা তাতেই কেটে যাবে।' এমন হাসিমুখে তিনি বললেন যে আমি আর তাঁর কথা ফেলতে পারলাম না। অগত্যা তাঁর সঙ্গে বসে কথাবার্তা কইতে লাগলাম। তাঁর সঙ্গে কথা কইতে বেশ আনন্দই লাগছিল। পনের মিনিট আন্দাজ কথা কয়েছি, এমন সময় দেখলাম, অরবিন্দবাবু ধীরে ধীরে নেমে আসছেন এবং দূর থেকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে বলে উঠলেন, 'আরে তিলক!' আমি চমকে উঠলাম, বাল গঙ্গাধর তিলক! আমি তাঁর পায়ের উপর হেঁট হয়ে পড়ে ক্ষমা চাইলাম। আমার হাত ধরে তুলে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, 'তুমি তো অন্যায় কিছু করনি, ক্ষমা কিসের!...অরবিন্দ বিশ্রাম করছেন বুঝতে পেরেই আমার পরিচয় তোমায় দিইনি।'

বন্দে মাতরম্-এর অরবিন্দ বিপিনচন্দ্র পাল

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে বয়সে তরুণতম হ'লেও অবদানে, শিক্ষায় এবং চরিত্রে হয়তো তাঁদের সকলের জ্যেষ্ঠ—অরবিন্দ যেন বিধাতারই চিহ্নিত পুরুষ, যাঁকে এই আন্দোলনে এমন-এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে হবে, যা তাঁর জন্য কোনও সহকর্মী বা সমসাময়িকের অদৃষ্টে লেখা নেই।...তাঁর একমাত্র ধ্যান হ'লেন দেশজননী...যাঁকে তিনি মা বলেই উল্লেখ করেছেন সর্বদা। ...যে-জাতীয়তা আর-দশজনের কাছে বড় জোর মানসিক বিলাস কিংবা নিম্নতমরূপে যা রাজনৈতিক হট্টগোল এবং আকাঙ্ক্ষা...সেই জাতীয়তাই অরবিন্দের কাছে আত্মারই এক উন্মাদনা-বিশেষ। জাতীয়তাবাদী আদর্শের শক্তি ও তাৎপর্য অরবিন্দের মতো গভীরভাবে খুব কম লোকেই হৃদয়ঙ্গম করেছে।...ধন্য তাঁরা, যাঁদের কাছে আদর্শ আর বাস্তবের ব্যবধান গিয়েছে ঘুচে; যাঁদের কাছে সত্যকে জানা অর্থে তাকে উপলব্ধি-গ্রাহ্য করা; যাঁদের কাছে, সময়ে বা মাত্রায়, কোনও প্রভেদই নেই সঙ্কল্প আর সিদ্ধির মধ্যে;...ভগবানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে যাঁদের সংগ্রাম নিজেদের সঙ্গে নয়, অপরের সঙ্গে, যাঁদের বিজয় নিজেদের ওপরে নয়, অপরের ওপর লাভ করতে হয়; ভগবানের রাজত্ব তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন আপন আন্তর জীবনে।...এরাই হলেন ভগবানের নির্বাচিত পুরুষ। মানবতার নেতৃত্বে তাঁদের সহজাত অধিকার। ব্যাপক গণ-সমষ্টির জীবন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এঁদের ওপর, এঁদের সাধনার ওপর নির্ভরশীল; বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে আসেন এঁরা, যাপন করেন এক মন্ত্রদীপ্ত জীবন। এঁদের আঘাত করা চলে, কিন্তু আহত করা অসম্ভব।...তাঁদের গগনচুম্বী আশাবাদ এবং তাতে ভগবানের আশিসই সমস্ত অশিবকে মঙ্গলে শিবে

পরিণত করে, সমস্ত প্রতিকূলতাকে পরিণত করে সাহায্যে, সমস্ত হারানোকে পরিণত করে পরম প্রাপ্তিতে। সমগ্র দেশবাসীর অবিসংবাদী রায়ে অরবিন্দ আজ ভগবানের সেই প্রিয়তম আত্মজদেরই অন্যতম।

…রাজনীতি বলতে তিনি যা বুঝতেন তা ওই শব্দটির সাধারণ অর্থের চেয়ে অনেক গভীরের জিনিস। নিরুপায়ের জুয়ার চাল নয়, চরিত্র-গঠনের বিদ্যাপীঠ। আধুনিক শিক্ষার ঋষি হলেন অরবিন্দ। তাঁর আধুনিক শিক্ষার যে আদর্শ তা ইওরোপে সাধারণত আধুনিক শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তার চেয়ে অনেক উচ্চ। পরম আধ্যাত্মিক এক আদর্শ তা। তার লক্ষ্য হচ্ছে উচ্চতম, গভীরতম দিব্য-চেতনাকে অভিব্যক্ত করা—বাহ্যিক জীবনে, মানব-সমাজের সর্বস্তরে।…জাতীয় কলেজে তাঁকে যদি পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হ'ত, সে-কলেজ তবে ভারতের আধুনিক শিক্ষারই নয়, সমস্ত জগতের শিক্ষার ইতিহাসে সূচিত করত নতুন এক অধ্যায়। আধুনিক সংস্কৃতির ভাবধারার যে বস্তুনিষ্ঠা, তার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের আদর্শবাদের এই সমন্বয় যদি ঘটত, তার সাহায্যে ভারতবর্ষ বিশ্বের শিক্ষাদাত্রীর পদেই কেবল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ত না, আধুনিক সভ্যতাকেও হয়তো রক্ষা করতে পারত নীচ সর্বগৃধ্নু শ্রম-শিল্পজীবীদের চাপ থেকে, সর্বাঙ্গীণ পতন এবং ধ্বংসের হাত থেকে।

…নতুন পত্রিকাটির ('বন্দে মাতরম্') সর্বাধিনায়ক, কেন্দ্রীয় পুরুষ ছিলেন অরবিন্দ। জাতীয় কলেজে যে-সুযোগ তিনি পাননি, তা তিনি পেলেন বন্দে মাতরমের সম্পাদনাকালে, এবং কয়েকশত ছাত্রের আচার্যপদ থেকে তিনি বৃত হলেন সমস্ত জাতির আচার্যপদে।…

অতুলনীয় এই মহামানবের হাত…পত্রিকার সূচনা থেকেই ছিল। দিনের পর দিন সকালে, কেবলমাত্র কলিকাতার নয়, সারা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত, সে-যুগের উদ্দীপনা-

পূর্ণ সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তাঁর বজ্রকঠোর মতামতের পথে চেয়ে। এমন-কি গতানুগতিক আত্মতৃপ্ত বৃটিশ সাংবাদিকদের মনেও তা গভীরভাবে রেখাপাত করল। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা থেকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ যাবৎ উদ্ধৃতি ছাপা হতে লাগল লণ্ডনের The Times হেন পত্রিকার স্তম্ভে···এবং নতুন পত্রিকাটির সর্বাধিনায়ক কেন্দ্রীয় পুরুষ ছিলেন অরবিন্দ।

বিশ্বপূজ্য স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ শ্রীমৎ মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সেদিন অরবিন্দ-তিরোধানের অব্যবহিত পরেই যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—'হ্যাঁরে, তুই তো অরবিন্দবাবুর ছাত্র। তাঁর কথা তুই কিছু লেখ না।' তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'হ্যাঁ, শ্রীঅরবিন্দের অন্তেবাসী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম বটে, তাঁর কথা লিখিতেও সাধ যায় বটে, কিন্তু লিখিব কোথায়? ছাপাইবে কে? শ্রীঅরবিন্দ বাংলার হইয়াও বাঙালীর নহেন, সেই ভাগবত মানবকে বাঙালী—আজকের বাঙালী ভুলিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্তমান বাঙালী জড়তি ভস্মের পূজারী। সে আজ এড়কু মাথায় করিয়া শোভাযাত্রা আরম্ভ করিয়াছে।'

সাল-তারিখের কথা নিখুঁতভাবে মনে নাই; রাষ্ট্ররোষ হইতে মুক্ত হইয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে গিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন হইতেই আমরা ছাত্ররূপে ভর্তি হইলাম। শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষ এবং সাধু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ('ডন্' প্রতিষ্ঠাতা) উহার সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট।...

...দেখিলাম এক সৌম্যমূর্তি যুবক মধ্যকার হলঘরে উপবিষ্ট। একটি শার্ট গায়ে, তাহার উপরে চাদর। সেই চল্লিশ বছর আগেকার কথা যদি আজও মনে থাকে, তবে মনে পড়িতেছে তাঁর চক্ষু দুটি যেন বাহ্যজগৎ হইতে অন্তরের স্বরাজ্য-ভূমিতে অভিনিবিষ্ট।...সেদিন শ্রীঅরবিন্দ অধ্যাপক ও বিদ্যার্থিগণকে সম্বোধন করিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিয়াছিলেন।...দেশীয় ও য়ুরোপীয় চরিত্রের তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন—এই যে কর্মনিষ্ঠা, ইহাই ইংরেজকে জগজ্জয়ী করিয়াছে। এই আসুরিক কর্মশক্তি যেদিন ভারতীয়

আধ্যাত্মিকতার সহিত সম্মিলিত হইবে সেদিন আমাদের জাতীয় চরিত্রের যে বিকাশ হইবে, তাহা হইবে জগতে অতুলনীয়।

শ্রীঅরবিন্দকে আরও নিকটে পাইবার সৌভাগ্য ঘটিল কলিকাতা কংগ্রেসের সময়। দাদাভাই নৌরজী কংগ্রেসের সভাপতি।··· লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক, খাপর্দে, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ব্রহ্মবান্ধব এবং শ্রীঅরবিন্দ 'সন্ধ্যা' কার্যালয়ে পরস্পর সমবেত হইতেছেন। তাঁহাদের সম্মিলিত অভিমত প্রতিদিন প্রত্যুষে 'বন্দে মাতরম্' পত্রের স্তম্ভে অনল অক্ষরে বিঘোষিত হইয়া জাতীয় দলের শক্তি বৃদ্ধি করিত।···

স্বর্গত বিপিনচন্দ্র পাল তখন 'বন্দে মাতরম্'-এর ঘোষিত সম্পাদক।···উপাধ্যায় (ব্রহ্মবান্ধব) বিপিনবাবুর লেখা প্রথম প্রবন্ধরূপে না দিয়া শ্রীঅরবিন্দের লেখাই দিতেন।···'বন্দে মাতরম্' অফিসের একটু চিত্র দিতেছি। সম্ভব স্কট্স্ লেনে সে সময় 'বন্দে মাতরম্' অফিস। রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। কাগজের অন্যান্য কর্ম সম্পূর্ণপ্রায়। অবশিষ্ট আছে কেবল সম্পাদকীয় নিবন্ধ। শ্রীঅরবিন্দ আত্মভোলা কবির মত বসিয়া আছেন, অথবা যোগমগ্ন যোগীর মত আত্মসমাহিত। শ্যামসুন্দরবাবু আসিয়া সম্পাদকীয় চাহিলেন। শ্রীঅরবিন্দ প্যাকিং-এর একটা ছেঁড়া কাগজ টানিয়া লইলেন, এবং সেই টুকরা কাগজের এক কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে তাঁহার রচনাকার্য শেষ করিয়া দিলেন। কোথাও একটু কাটিলেন না, কুটিলেন না, কোথাও একটু থামিলেন না—ভাবিলেন না। পরদিন প্রত্যুষে সেই লেখা জাতীয়তার সামস্তোত্ররূপে প্রকাশিত হইল। স্বৈরশাসক তাহাতে কাঁপিয়া উঠিল, জাতির প্রাণে প্রাণাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, সজলস্নিগ্ধ কর্দমাক্ত বাংলায় বজ্রাগ্নি ঝলকিয়া গেল! অযুতকণ্ঠে গাহিয়া উঠিল—'রত্নাম্বুধি আজ করিয়া মন্থন, তুলিয়া আনিব স্বাধীনতা ধন।'···

সম্পাদক-প্রধান অরবিন্দ এবং তাঁহার সাংবাদিক সহকর্মীরা মুক্তিকামী জাতির সম্মুখে নব-জাতীয়তার আদর্শ স্থাপন করিলেন। 'বৃটিশ নিয়ন্ত্রণমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা'—জাতির লক্ষ্য বলিয়া 'বন্দে মাতরম্' প্রচার করিতে লাগিল। অরবিন্দ সম্পাদিত এই সমাদৃত ও সম্মানিত পত্রিকা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মুমুক্ষু দেশবাসীকে বলিয়া দিল যে জাতীয়তাবাদীর বাঞ্ছিত স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে মধ্যপন্থী (মডারেট) দলের অনুসৃত আবেদন-নিবেদনের পথ ছাড়িতে হইবে। জাতিকে হইতে হইবে আত্মনির্ভরশীল। গড়িয়া তুলিতে হইবে জাতির সংহতি-শক্তি; স্বদেশী-গ্রহণ ও বিলাতী-বর্জনের কার্যক্রমকে সফল করিয়া তুলিতে হইবে পূর্ণমাত্রায়। জাতীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার, গ্রামে গ্রামে সালিশী আদালত স্থাপন, আর্ত ও দুর্গতদের সেবা ইত্যাদি কার্যের মধ্য দিয়া জাতিকে হাতে-কলমে শিখিতে হইবে নিজের দেশ নিজে শাসন করিবার প্রাথমিক কাজগুলি।

স্বদেশী আন্দোলনের সুবর্ণযুগে 'বন্দে মাতরম্'-এ অরবিন্দের লেখনীমুখে নির্গত হইয়াছে আশা ও নির্ভীকতার জ্বলন্ত বাণী। 'বন্দে মাতরম্' জাতিকে দিয়াছে এক নূতন পথের সন্ধান। স্বদেশী যুগের মধ্যপর্বে বিদেশী রাজার অনুসৃত নির্যাতন-নীতির প্রয়োগে যখন জাতির চিত্ত নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন হইতেছিল···আমাদের জাতীয় জীবনের সেই দুর্যোগের দিনে 'বন্দে মাতরম্'-এর মধ্য দিয়া স্বাদেশিকতার ঋষি বজ্রনির্ঘোষে শুনাইয়াছেন অভয় বাণী। সেদিন মুক্তিসেনার অধিনায়ক অরবিন্দ জাতিকে মৃত্যুমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া রণক্ষেত্রে নামিবার জন্য উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার সে আহ্বান নিষ্ফল হয় নাই। তরুণ বাংলা সেনাপতির ডাকে সাড়া দিয়াছিল, বাঙালী যুবক দলে দলে মৃত্যুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মুক্তি-অভিযানে যোগদান করিয়াছিল।···

বোমার মামলার একটি ঘটনা — শিশিরকুমার মিত্র

যখন শ্রীঅরবিন্দের বোন সরোজিনী দেবী মামলার ব্যয়ভার বহনের জন্যে চাঁদা চেয়ে আবেদন জানালেন দেশবাসীর কাছে, সরকারী অত্যাচারের তোয়াক্কা না করে সর্বশ্রেণীর লোকই এগিয়ে গেল সেই আহ্বানে নির্ভীক সহায়তার সঙ্কল্প নিয়ে। চারিদিক থেকে, দূর দূর পল্লীগ্রাম থেকে পর্যন্ত সাহায্য আসতে লাগল অকুণ্ঠভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, চাষী-মজুর থেকে শুরু করে শিক্ষিত সম্প্রদায় পর্যন্ত সকলেরই কাছ থেকে। ইংল্যাণ্ড, কন্‌টিনেণ্ট, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া থেকে পর্যন্ত অর্থসাহায্য আসতে লাগল: এঁদের অনেকেই শ্রীঅরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন। অন্ধ এক ভিখারী—ধন্য তার দান! তার বহুকষ্টে উপার্জিত বহুযত্নে সঞ্চিত পুরো একটি টাকা সরোজিনী দেবীর হাতে তুলে দিল; দরিদ্র এক ছাত্র তার দৈনন্দিন জলখাবারের পয়সা পর্যন্ত তুলে দিল তাঁর হাতে, নিজে অভুক্ত থেকে। পুণার সার্বজনিক সভা থেকেও বেশ-কিছু অর্থ সংগ্রহ করে পাঠানো হল। আর্থিক মূল্যের জন্যে নয়, মহানায়কের প্রতি সমগ্র জাতির ভালবাসাই মূর্ত হয়ে উঠল এই তহবিলের মধ্যে।

শ্রীঅরবিন্দ-সান্নিধ্যে

সুধীরকুমার সরকার

১৯০৭ সালের কথা—তখন আমার বয়স ১৭ বৎসর,…জাতীয় শিক্ষার হুজুগে আমি স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছি—দেশকে ইংরেজের কবল হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য।…

জামালপুরের দুর্গা-প্রতিমা বিসর্জন ব্যাপারে প্রতিমা ভাঙার খবর পাইয়া কলকাতা হইতে আমরা সাতজন রওনা হইলাম অপরাধীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। হাজার হাজার জনতার সভায় হাতাহাতির পর গুলী ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া সঙ্গী ছয়জন খুনের দায়ে গ্রেপ্তার হইলেন—আমি পলাইয়া বাঁচিলাম। ফিরিয়া আসিয়া কলকাতায় পরিচিত-অপরিচিতের কাছে কত বাহবা পাইলাম।… তখনকার দিনের নেতারা আমাকে লইয়া খুব হৈ-চৈ করিলেন—এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর নেতাদের কাছে বিশ্বাসী পরিগণিত হইয়া পরের শ্রেণীতে বোধহয় উন্নীত হইলাম—আমার বাসস্থান হইল শ্রীঅরবিন্দের বাড়িতে তাঁহার পরিচর্যার জন্য।

সেখানে পড়াশুনা করিতাম। অত বড় বিদ্বান ত্যাগী ধীর শান্ত পুরুষের কাছে থাকায় ধন্য মনে করিতাম নিজেকে।…তিনটি কামরার ছোট্ট একটি দোতলা বাড়ির উপরতলায় শ্রীঅরবিন্দ মহাভারত ইংরেজী পদ্যে লিখিতেন, আর অবসরমতো তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ ইংরেজী কাগজ 'বন্দে মাতরম্'-এ প্রবন্ধ দিতেন, আর একই সময়ে আমাকে কার্লাইলের French Revolution, Hero Worship-ও বুঝাইয়া দিতেন। একই সময়ে মনকে তিন-চার ভাগ করা যে সম্ভব, এই প্রথম দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—এ কী প্রকারে সম্ভব? বলিলেন, 'বিশেষ কিছু না, Culture করিলে মন সহজেই আসে।'…

শ্রীঅরবিন্দের সহজ সরল অমায়িকতা, হৃদ্যতা, সমতা আমাকে

একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিত। তখন মনে হইত, ইনি কি এই জগতের মানুষ, না আর কিছু। এ-রকম মানুষ তো একটিও আর দেখিনি। তবু কিন্তু দুষ্ট মনের আস্পর্ধা হইত পরীক্ষা করিবার জন্য। দৈনন্দিন সাংসারিক অভাব-অনটনের সংসারে অভিমান, হিংসা, লুকোচুরি, সদর-মফঃস্বল আচার-ব্যবহারের মধ্যে লালিত-পালিত আমি, কিছুতেই নিজেকে বুঝাইতে পারিলাম না যে মানুষ এত উচ্চ হইতে পারে। এও কি সম্ভব? অথচ শ্রীঅরবিন্দকে কেন যেন এত ভাল লাগিত। কতদিন কত দুষ্টু চোখ দিয়া আঁতিপাঁতি করিয়া খুঁজিয়াছি মানুষসুলভ দুর্বলতা ধরিবার জন্য, পরে লজ্জায় ক্ষোভে নিজের উপর ধিক্কারই লাভ করিয়াছি। শয়ন, আহার, হাসি-তামাসা, খেলা অবাধে তিনি আমাদের সাথে করিতেন। এতটা মেশা তখনকার দিনে আমার বাধ-বাধও ঠেকিত।

একদিন বলিয়াই বসিলাম (যেহেতু একখানি চিঠিতে ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসকে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আমার বন্ধু সুধীরকুমার যাইতেছেন' ইত্যাদি)। যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার আমি বন্ধু কি হিসাবে? বিদ্যায়, বয়সে, ধনে, মানে, সর্বাংশে আপনি কত উচ্চে। কোথায় আমি আপনাকে সম্ভ্রম করিয়া চলিব, উপদেশাদি গ্রহণ করিব—না, আমি আপনার বন্ধু?...' তিনি আমাকে না বুঝাইয়া ছাড়িলেন না—তাঁর সেই সুমিষ্ট আধ-আধ ইংরেজি জিহ্বায় বাংলা কথায়। 'যেহেতু লক্ষ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা উভয়েরই এক, অতএব আমি তোমার বন্ধু বই আর কি? আর তোমার যে বাধ-বাধ ভাব উহা এদেশের সংস্কারের জন্য।...'

তাঁহার মহাভারত লেখা দেখিয়া মতলব করিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি মহাভারতের সব কথা বিশ্বাস করেন? উহাতে নাকি অনেক প্রক্ষিপ্ত আছে?' তিনি যে এ রকম প্রশ্ন আমার কাছে শুনিবেন যেন কখনও আশা করেন নাই। লজ্জায় আমার কথা বাধ-বাধ হইল। শ্রীঅরবিন্দ আমার সলজ্জভাবে যেন কত ব্যথা বোধ করিয়া

ধীর স্বরে বুঝাইয়া বলিলেন, 'বাসুকীর পৃথিবীধারণ, এ-কথা তোমার আমার অস্তিত্বের মতোই সত্য—তবে যে দৃষ্টিতে উহা দেখা যায়, তাহা আমরা হারাইয়াছি। আর যে দৃষ্টিতে নানা প্রতিক্রিয়ার ফলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগৎ দেখিতেছি উহাই মানুষের সমগ্র দৃষ্টি নয়। বাসুকী represents vital rower, সমগ্র প্রাণশক্তির প্রতীক। হিন্দুর বিশ্বাস মিথ্যা ছিল না, এখন আবার সেই দৃষ্টি আমাদের অর্জন করিতে হইবে। সেইজন্যই এত অভাব-অভিযোগ, জাগিবার জন্য এত আন্দোলন !'

প্রিন্সিপ্যাল পদে ন্যাশনাল কলেজের প্রাপ্য ৭৫৲ টাকার মধ্যে বাড়িভাড়া ২৩৲ টাকা বাদে আমাদের চার-পাঁচ জনের ভরণপোষণ তখন তাঁকে করিতে হয়। একদিন তো বলিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পড়িতে। তখন তার মূল্য ১৮৲ টাকা। ভাবিলাম, উনি তো খাওয়া-পরার হিসাব না করিয়াই বই খরিদ করিতে বলিলেন। আর একেবারে অত বড় বই পড়িবার ধৈর্যও আমার ছিল না। বইয়ের দোকানে গিয়া ছোটখাট···মহাভারত পাইলাম সাড়ে সাত টাকায়। উহা কিনিয়া আনিয়া উপর উপর পড়িয়া লইলাম। কয়েকদিন পর আবার মহাভারতের কথা উঠিলে বইখানা ধীরে সন্তর্পণে হাতে দিতেই আমার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া ছোট্ট হাসির সাথে বলিলেন, 'এ মহাভারত পড়িয়া তো লাভ নাই। ইহা আধুনিক ইতিহাসযোগ্য করিয়া লেখা। এসব উপরের খোলস। Spirit বাদ দিয়া খোলস পড়িলে যা হয়, তাই।' ফেরত দিয়া বদলাইয়া অন্তত কালীপ্রসন্ন সিংহের বাংলাখানা আনিতে বলিলেন। যেন সংস্কৃতও আমি পড়িলেই বুঝিব।···

চন্দননগরে সফর করে করে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতাম বলিয়া শ্রীঅরবিন্দ আমাকে সাথে করিয়া স্ত্রী, ভগ্নী ও এক ঠাকুরসহ তাঁর দাদামশায়ের বৈদ্যনাথস্থ বাড়িতে গেলেন। একটা বড় হল্-এ মেঝেতে সতরঞ্চ পাতিয়া আমরা সবাই একসাথে শুইতাম। শ্রীঅরবিন্দ

ফুল্‌স্ক্যাপ শীটে টাইপ করিয়া মহাভারত পদ্যে লিখিতেন। একদিন কম্পজ্বরে বমি-পিপাসায় অস্থির। পাশে তাঁর মহাভারত লেখা কাগজপত্র ছড়ানো—কাগজে ছিটকাইয়া পড়িল বমি!…সৌম্যমুখে কোনো বিরক্তি, ব্যস্ততা নাই। উঠিয়া আসিয়া নিজেই বমি পরিষ্কার করিতে উদ্যত—আমি তো লজ্জায় মুষড়াইয়া পড়িলাম। মনে হইল এত স্নেহ-মমতা তো বাড়িতেও কোনদিন পাই নাই! অন্তত কাগজপত্র নষ্ট করিবার জন্য, 'এই যাঃ, সব নষ্ট করলে' কথাটাও তো শুনিতে হইত! নষ্টামি অনিচ্ছায় করিয়াও তো গালিগালাজ শুনিয়াছি কত! এই যে বৎসরাধিক কাছে কাছে থাকিয়াও একদিনের জন্য 'না' কথাটি যাঁর মুখে শুনি নাই—আদেশ উপদেশ তো দূরের কথা; বাড়াবাড়ি করিতেছি দেখিলে চুপ করিয়া থাকিতেন, গম্ভীর হইয়া নয়, যেন অন্য-মনস্ক হইয়া যাইতেন, আমার কথায় যেন মনোযোগই দেন নাই, আর কিছুতে মগ্ন তখন! হেলা-তাচ্ছিল্যভরে অন্যমনস্কতাও নয়, তার পরিচয় যতদিন নষ্টামি করিয়াছি একই ভাবে দেখিয়াছি। এখন ভাবি, তাই তো! উচ্চ মনে যে সমগ্র দৃষ্টি খোলে আর দোষী মনে দোষ দেখে অন্ধ বা কানা হয়—সত্যি কথা তাহলে!

আমার মতো অশিষ্ট অবাধ্য ছেলেকে কি করিয়া মানুষ করিতে হয় তাহা বুঝি তিনিই জানিতেন! এক এক নষ্টামি করিয়া ঘা খাই আর মনে মনে ভাবি, এমন দেবতার মতো মানুষ! এর কাছে মিছে কথা বা গোপন কিছু আর করিব না! এমন দেবতুল্য পুরুষকে বিরক্ত করা মহাপাপ! এই যে কিছু না-বলা, যেন আমার দুষ্টামিতে সায়ও দিলেন না, তাচ্ছিল্যও করিলেন না। তাঁহার মনে এ-কথা যেন স্থানও দেন নাই। এই দুর্ভাবনা আমায় যে কীভাবে দংশন করিত! মনে হইত যেন কিছু বলুন আমায়। বলিয়াও দেখিয়াছি নিজের দুর্বলতার কথা সব! বলিতেন, 'মানুষ তো দুর্বলই! এসব কথা ভেবে আরো দুর্বল হওয়া ঠিক নয়। যা ভাবলে মন সরল হয়, তাই ভাবা উচিত।'…

মাসখানেক থাকিয়া পূজার বন্ধের পর ফিরিয়া আসিলাম কলকাতার বাড়িতে। মা বাবা আমার খোঁজখবর না পাইয়া 'যুগান্তরে' খুঁজিয়া আমাকে ধরিয়া লওয়ার জন্য দাদাদের পাঠাইয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দকে সব বলিলাম। তখন তিনি টাকা দিয়া আমায় খুলনায় পাঠাইয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করিবার পরে বলিলেন, (আমি কিন্তু ভাবিয়াছিলাম আপদকে বুঝি তাড়াইয়া দিলেন), 'সপ্তাহে একবার খুলনায় মায়ের কাছে যাবে। আসার সময় প্রথমবার ব'লে আসবে। পরের বার আসার ২।৩ দিন আগে বলবে, আসবার সময় আর কিছু না ব'লে চলে আসবে। তার পরের বারে দিন-পনেরো পরে ২।১ দিন থেকে বাড়ির জন্য লোকের কাছে ব'লে চলে এস। আর-আর বারে অন্য বাড়িতে গিয়ে উঠবে অথবা অন্য বাড়িতে খেয়ে কিংবা অন্য বাড়িতে উঠে বাড়িতে গিয়ে দেখাশুনো ক'রে পরে আসার দিন আর মোটেই না ব'লে এইভাবে ৫।৭ বার যাওয়া আসা ক'রে সইয়ে নেবে।' —এত বড় দরদী শ্রীঅরবিন্দ নাকি আবার গুপ্ত ষড়যন্ত্রের নায়ক!

আলিপুর জেলে আমরা ৯০ জন বোমার আসামী।···নরক গুলজার তখন। শ্রীঅরবিন্দ শেষ রাত্রে ধ্যানস্থ হইতেন। আর দিনের বেলা যেদিন কাছারী যাওয়া হইত না, বাংলা বলা আয়ত্ত করিবার জন্য আমাদের সাথে word-making খেলা, উল্লাসকরকে জজ সাজাইয়া নিজে পাব্লিক প্রসিকিউটর সাজিয়া Norton-এর জবানবন্দীর ক্যারিকেচার করিতেন। British Law & Justice, Morality or Immorality in Anarchism, Imperialism, Revolution, Morality in Political Dacoity, Bomb, Murder ইত্যাদি বিষয়ে দুই দিনের 'ফিলসফি' কত সহজে এমন চমৎকার বলিয়া যাইতেন যেন ঐ সবের ছবি আঁকিয়া তাঁর সামনে ম্যাপের মতো কেহ ধরিয়া রাখিয়াছে।

রোজ প্রাতে স্নানাদির পর শ্রীঅরবিন্দ জেলের লম্বা হল্-এর এক কোণে তাঁর বাসস্থান ঠিক করেন। মাথা মেঝেতে, পা শূন্যে সোজা

উপরে রাখিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেন। একদিন তো বাংলার লাট Baker-সাহেব আসিলেন আমাদের দেখিতে। শ্রীঅরবিন্দ তখন উর্ধ্বপদে শূন্যে ঝুলিতেছেন। Baker-সাহেব আধঘণ্টা-খানেক দাঁড়াইয়া থাকিলেন, মুখে কথা ছিল না। যখন শ্রীঅরবিন্দ কোনপ্রকার সাড়া দিলেন না, তখন লাটসাহেব Indian mystic-দের কি একটা অবোধ্য অঙ্গভঙ্গী ভাবিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা ভাবিলাম: এই রে! লাট এসেছিলেন কথাবার্তা কইতে; তাচ্ছিল্যভাব বুঝেছে। গুলী তো করবেই জানা ছিল—হয়তো বা কথাবার্তা শুনলে গরম কাটতেও পারত!

যেদিন নরেন গোঁসাইকে কানাই জেলের ভিতরে শেষ করিল সে গুলীর আওয়াজে আমরা তো উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম।···উল্লাসে তখন আমাদের নাচিতে ইচ্ছা করিতেছে। গুলীর শব্দে পাগলাঘণ্টি বাজিল। শ্রীঅরবিন্দ যেন এসবের কিছুই শুনিতে পান নাই এমনিভাবে তখনও স্নান করিতেছেন। গা মুছিয়া দিয়া যখন বলিলাম (আমি রোজ প্রাতে শ্রীঅরবিন্দকে তখন স্নান করাইয়া দিতাম বাহিরের কয়েদীদের হৌজিতে, কারণ তাঁহার পক্ষে তখন উদ্যোগ করিয়া খাওয়াপরা, কথা বলা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল—অন্যমনস্কভাব তখন।···) পাহারাওয়ালা ঘরে যেতে বলছে পাগলাঘণ্টির জন্য। গোঁসাই নাকি খুন হয়েছে। বাহিরে বোমা-পিস্তলের শব্দ। নির্বিকারভাবে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিলেন। অত বড় ব্যাপার আমাদের কাছে। তিনি যেন কিছুই শুনিলেন না!! এসব ব্যাপার নিয়া আর তিনি উচ্চবাচ্যও করেন নাই।···ভিতরে-বাহিরে ক্রমেই নীরব হইয়া আসিতে লাগিলেন —যেন শরীরের ভিতরে যন্ত্রপাতি নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলাচল পর্যন্ত চুপ! যখন কিছুতেই নিজের সাথে মিলাইয়া লইতে পারিলাম না, তখন মুখে বলিতাম—পাগল হলেন নাকি? মনে মনে কিন্তু একথা মানিতে পারিতাম না। একটা অসম্ভব টান আপনার জনের মতো অনুভব করিতাম যখনই তাঁহার সংস্পর্শে আসিতাম।

এর পরেই শ্রীঅরবিন্দ একদম কথা বলা বন্ধ করলেন। Vacant বলাও যায় না—যেন অন্তর্মুখী কোন এক রাজ্যে তিনি বাস করিতেছেন।···নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁর ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ প্রভৃতি কারো সাথে আর কথাও বলেন না।···এ কি বেপরোয়া পাগলামি, না নির্ভরতা? মাথায় কালো চুলে যেন তেল চুঁইয়া পড়িতেছে। মুখ শিশুর মতো, চিন্তার কোনও ভাঁজ নাই। টলমলে মুখে হাসিমাখা। চোখ ছুটি প্রশান্ত স্নিগ্ধ।···মাথায় চুলের গন্ধে কচি খোকার দুধে গন্ধ। নখ আধ ইঞ্চি লম্বা। চুল, দাড়ি, গোঁফ ক্রমে আরো লম্বা হইতেছে। আমাদের চুলে তো অমন তেল চোঁয়ায় না। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'আপনার ইওরোপীয়ান ওয়ার্ডারেরা লুকিয়ে তেল দিয়ে যায় নাকি?' তিনি হাসিতেনও না, কোনো জবাবও দিতেন না। আমাদের কথা যেন শুনিতেই পাননি। রাত্রিতে ইওরোপীয়ান ওয়ার্ডারেরা আসিয়া বলিত, Aravind remains standing the whole night, his bedding folded in the corner! তাহারা কেহ তাঁহাকে অযথা বিরক্তও করিত না—আমাদের যেমন প্রহরে প্রহরে ডাকিয়া দেখিত, আছি না পলাইয়াছি। একদিন এক scotch ওয়ার্ডারের ধেইয়া ধেইয়া করিয়া সে কী নাচন শ্রীঅরবিন্দকে কাঁধে উঠাইয়া! তার লম্বা দেহ, চওড়া নাক, পরিমাণ-হীন ছোট্ট চোখ আর ঘোড়ার মতো ঝুলনো চোয়াল—এমন অপরূপ মুখের ভঙ্গীর সাথে রাক্ষুসে হাসি! সে এক অদ্ভুত রসের দৃশ্য! আহ্লাদের কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। শ্রীঅরবিন্দ একেবারে নিস্পন্দ, মুখে হাসি বা বিরক্তির বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই, আপত্তিও করিতেন না। তিনি তখন কোথায়—আর এক জগতে!···

এইভাবে আমাদের এক বৎসর তো প্রায় কাটিয়া গেল। সি. আর. দাশ যখন শত চেষ্টা করিয়াও সহযোগিতা পাইতেন না, দাঁড়াইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া চোখের জল মুছিয়া চলিয়া যাইতেন। দ্বিপ্রহরে জলখাবার পাইতাম কোর্টের ডকে। পুরী,

সন্দেশ হইতে পান পর্যন্ত। শ্রীঅরবিন্দ পান, পুরী, সন্দেশ প্রায় এক সঙ্গেই খাইতেন। আমাকেই সেইজন্য খাওয়াইয়া দিতে হইত। পাশে বসিতে খুব ভাল লাগিত। গায়ে হাত দিতে ইচ্ছা করিত। ভিন্ন মতের বান্ধবদের টিটকারির জন্য সাহস করিতাম না।

ঠিক এক বৎসর পর সওয়াল-জবাব হইয়া গেলে রায় দেবার দিন ধার্য করিবার জন্য আদালত যখন বসিল, আমরা উপস্থিত ছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ কথা বলিলেন। তাঁর সাধনা-সিদ্ধিলাভের কথা উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর, নলিনী গুপ্তকে বলিলেন, 'বাসুদেব নারায়ণ বলিয়াছেন, তোমার দ্বারা আমার অনেক কাজ আছে। তোমাকে জেলের বাহির করিয়া লইয়া যাইব।' আমরা তখন একে একে সুযোগ বুঝিয়া নিজেদের কথা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। তিনি বলিয়াও দিয়াছিলেন, আমাদের সাজা হইবে, উল্লাস ও বারীনের ফাঁসী হইবে না। তারপর আরও সুযোগ খুঁজিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'জেলে এ-বয়সে কি করিয়া দিন কাটাইব? দুর্বল হইলেই বা কি করিব?' বলিলেন, 'Think of me. I shall be always with you.' কী যে মর্মস্পর্শী সে কথা! জেলের বাহিরেও বিপদে-আপদে নিরুপায় হইয়া যখনই মনে করিতে পারিয়াছি, দেখিয়াছি কতবার, হয় সেই বিপদ সম্পদ হইয়াছে, নয়তো দেখিয়াছি সবলের মতো বিপদমুখী হইবামাত্র বিপদ হইতে কে যেন উদ্ধার করিয়াছেন।

আলিপুর দায়রা জজের কক্ষ। তার একটি কোণ ঘেরাও করা হয়েছে। সেখানে একজন সশস্ত্র শান্ত্রী দণ্ডায়মান থাকত—পাছে বাঘ-ভাল্লুকেরা সব পিঁজরা ভেঙে বেরিয়ে পড়ে। ভিতরে আমাদের সুখাসনের জন্য কয়েকখানি বেঞ্চি পেতে দেওয়া হ'ল—সমস্ত দিন তো দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না। কোর্ট খুলল—আমরা বসে গেলাম। কিন্তু কোর্ট চলল কোর্টের ধারায়, আমরা চললাম আমাদের ধারায়। উকিল, ব্যারিস্টার, সাক্ষী, দর্শকবৃন্দ সবাই ব্যাপৃত মোকদ্দমার বিষয় নিয়ে; আমরা তাতে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ উদাসীন—আমাদের ক্ষেত্র অন্য রকম। আমরা আলাপ-আলোচনা করতাম সকল বিষয়ে—ধর্ম, সাধনা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আমাদের কর্ম ও ভবিষ্যৎ—সবই আমাদের চিন্তাজগতের অন্তর্গত ছিল। আমাদের আলাপ-আলোচনা মাঝে মাঝে এমন সরগরম ও সরব হয়ে উঠত যে জজ সাহেব (Beach croft, যিনি বিলাতে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের সহপাঠী) ধর্মকে বলতেন স্কুলমাস্টারের মত—"Less noise, less noise there.…"

এর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ একটি কোণে আলাদা বসে থাকতেন—আমাদের কারো কোনো কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে তাঁর কাছে যেতাম। একদিন আমরা সাধারণ সভা ডাকলাম অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দকে অনুরোধ করলাম আমাদের কিছু বলতে—ঐ কোর্টেই, কোর্টে কাজের সময়েই, কোর্ট চলছে আর আমাদের সভা চলছে। শ্রীঅরবিন্দ রাজী হলেন তাঁর বক্তৃতার বিষয় হ'ল, 'নেশনবাদ ও গুণত্রয়'—এই বক্তৃতাটিই তিনি পরে জেল থেকে বের হয়ে লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং তা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, এখন তা তাঁর 'ধর্ম ও জাতীয়তা' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীঅরবিন্দকে অনেকটা সময় দিতে হত তাঁর কৌঁসুলিকে (চিত্তরঞ্জন দাশকে) তাঁর বক্তব্য লিখে জানাতে হত বলে।…

একদিন আমি তাঁকে বললাম, ইংরেজী কবিতা পড়তে ইচ্ছা হয়, অনেকদিন তো পড়ি না—আপনি সাহায্য করতে পারেন? পরদিনই একটি নূতন কবিতা লিখে এনে আমার হাতে দিলেন। কাগজ ছিল না, একখানা পুরনো চিঠির আশেপাশে লিখে এনেছিলেন।

একদিন কোর্টে যখন আমরা খাঁচার ভিতরে, এক অবসরে, একজন উত্যোগী ইংরেজ শাস্ত্রী এসে শ্রীঅরবিন্দকে রসিকতা করে বললে, 'Abrindo' (Aurobindo বলতে পারত না সে), you are caught at last, you are caught at last! শ্রীঅরবিন্দ তুরুক জবাব দিলেন তক্ষুনি, 'And yet I will escape, and yet I will escape!'

হট্টগোল ও দলাদলির মধ্যে একেবারে নিশ্চল স্থাণুর মত বসিয়া থাকিতেন অরবিন্দবাবু। কোন কথাতেই হ্যাঁ না কিছুই বলিতেন না। জেলের প্রহরীদের নিকট হইতে তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাইতাম। কেহ বলিত তিনি রাত্রে নিদ্রা যান না, কেহ বলিত তিনি পাগল হইয়া গিয়াছেন; ভাত খাইবার সময় আরসুলা, টিকটিকি ও পিঁপড়াদের ভাত খাইতে দেন; স্নান করেন না, মুখ ধোন না, কাপড় ছাড়েন না—ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাপারটা জানিবার জন্য বড় কৌতূহল হইত; কিন্তু তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস কুলাইত না। মাথায় মাখিবার জন্য আমরা কেহই তেল পাইতাম না; কিন্তু দেখিতাম যে অরবিন্দবাবুর চুল যেন তেলে চক্‌চক্ করিতেছে। একদিন সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি কি স্নান করিবার সময় মাথায় তেল দেন?' অরবিন্দবাবুর উত্তর শুনিয়া চমকিয়া গেলাম—তিনি বলিলেন—'আমি তো স্নান করি না।' জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনার চুল অত চক্‌চক্ করে কি করিয়া?' অরবিন্দবাবু বলিলেন—'সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের কতকগুলা পরিবর্তন হইয়া যাইতেছে। আমার শরীর হইতে চুল বসা (fat) টানিয়া লয়।'

দুই-একজন সন্ন্যাসীর ওরূপ হইতে দেখিয়াছি; কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝি নাই। তাহার পর (আদালতে) ডকের মধ্যে একদিন বসিয়া থাকিতে থাকিতে লক্ষ্য করিলাম যে অরবিন্দবাবুর চক্ষু যেন কাচের চক্ষুর মত স্থির হইয়া আছে; তাহাতে পলক বা চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নাই। কোথায় পড়িয়াছিলাম যে চিত্তের বৃত্তি একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া গেলে চক্ষে ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। দুই-

একজনকে তাহা দেখাইলাম ; কিন্তু কেহই অরবিন্দবাবুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। শেষে শচীন আস্তে আস্তে তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি সাধন করে কি পেলেন?' অরবিন্দবাবু সেই ছোট ছেলেটির কাঁধের উপর হাত রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন—'যা খুঁজছিলাম, তা পেয়েছি।'

তখন আমাদের সাহস হইল, আমরা তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলাম। অন্তর্জগতের যে অপূর্ব কাহিনী শুনিলাম তাহা যে বড় বেশী বুঝিলাম তাহা নহে, তবে এই ধারণাটি হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল যে এই অদ্ভুত মানুষটির জীবনে একটা সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। জেলের মধ্যে বৈদান্তিক সাধনা শেষ করিয়া তিনি যে সমস্ত তান্ত্রিক সাধনা শেষ করিয়াছিলেন তাহারও কতক কতক বিবরণ শুনিলাম। জেলের বাহিরে বা ভিতরে তাঁহাকে তন্ত্রশাস্ত্র লইয়া কখনও আলোচনা করিতে দেখি নাই। সে সমস্ত গুহ্য সাধনের কথা তিনি কোথায় পাইলেন জিজ্ঞাসা করায় অরবিন্দবাবু বলিলেন যে একজন মহাপুরুষ সূক্ষ্ম শরীরে আসিয়া তাঁহাকে এই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দিয়া যান। মোকদ্দমার ফলাফলের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—'আমি ছাড়া পাব।'

ফলে তাহাই হইল।...

যেদিন শ্রীঅরবিন্দকে প্রথম দেখিলাম, দেখিলাম একজন অতি শান্ত মানুষ—কাপড়ের খুঁট অঙ্গে জড়াইয়া একখানি সাধারণ কাষ্ঠাসনে বসিয়া আছেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, চতুর্দশ বৎসর বিলাতে বাস করিয়া, আই. সি. এস. পাশ করিয়া শেষে ঐভাবে দিন যাপন করিতেছেন দেখিয়াই আমার মাথা নত হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের 'আমার মাথা নত করে দাও হে' গীতের সার্থকতা উপলব্ধি করিলাম। যখনই শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে হয়, তখনই ঐ গানটির কলিটি আমি স্মরণ করি

প্রথম সাক্ষাতেই আমি শুধু মুগ্ধ হই না—আমি শক্তিমান হইয়া উঠি। দর্শনেই যে দীক্ষালাভ হয়, স্পর্শনের প্রয়োজন হয় না, মন্ত্রের প্রয়োজন হয় না—প্রত্যক্ষভাবে তাহা বুঝিতে পারিলাম।

...বিপ্লব পথের পথিক হইবার পূর্বে ব্রিটিশের শৃঙ্খলমোচনের উপায়স্বরূপ যে পন্থা গ্রহণ করা হয় তাহাও শ্রীঅরবিন্দের প্রদর্শিত পন্থা কিন্তু সেকথা তাঁর নিকটস্থ আত্মীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র (সঞ্জীবনীর সম্পাদক মহাশয়) ও বারীন্দ্র ভিন্ন অল্প লোকই জানিত। ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধে নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া বরোদার সুখৈশ্বর্য ত্যাগ করিয়া বাংলায় আগমন করেন তিনি। বাংলায় আসিয়া যখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন তখনই তাঁহার ত্যাগের আদর্শে বাংলার যুবকদের অন্তরে দেশমাতৃকার সেবায় ত্যাগের আদর্শের বান ডাকিয়া গেল।...

প্রথম দর্শনের দিন বন্ধু উপেন্দ্রনাথ (বন্দ্যোপাধ্যায়) আমাকে অরবিন্দের কাছে বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি অরবিন্দের মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। একটা

নমস্কার পর্যন্ত করিতে ভুলিয়া গেলাম। সেই শান্ত দান্ত উপরত বেদান্তমূর্তি আমার চক্ষের সম্মুখে এক নূতন জগৎ খুলিয়া ধরিল—আমার সমস্ত হৃদয় আলোকের পুলকে ভরিয়া গেল। জানি না ভগবৎ-দর্শনে মানুষের কি ভাব হয়, তবে অরবিন্দ-দর্শনে আমার মনপ্রাণ এক নূতন ভাবের আলোকে ভরিয়া উঠিল। মনে হইল—এমন মানুষ এর পূর্বে তো দেখি নাই। সুরেন্দ্রনাথের চরণে প্রণাম করিয়া দেশসেবায় দীক্ষিত হই, কিন্তু সেক্ষেত্রে কোন ভাবের উদয় হয় নাই, হৃদয়ে কোন নূতন আলোক প্রজ্বলিত হয় নাই, তবে দেশের কল্যাণার্থে একটা তীব্র রাজসিক কর্মপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলাম।··· তিনি (শ্রীঅরবিন্দ) যেন বলিয়াছিলেন—দেশমাতার মুক্তির জন্য আত্মবলি দেওয়া কি কঠিন মনে কর? মানুষ সংসারের সুখের জন্য কত কষ্ট না স্বীকার করে—দেশের মুক্তির জন্য মানুষের কোন ত্যাগই কষ্টকর নয়। ভারতের স্বাধীনতা না হইলে মানুষের মুক্তিই হইবে না।

···সেই ভাব-বন্যায় ভাসিয়া বাংলার তথা ভারতের যুবকদের হৃদয়ে দেশের মুক্তির জন্য সর্বত্যাগের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়—যাহারা বিপ্লবী শুধু তাহাদের হৃদয়েই নয়, যাহারা বিপ্লবে যোগদান কার্যতঃ করে নাই তাহাদের হৃদয়েও ত্যাগের মন্ত্র ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। তাই অরবিন্দ ও মানিকতলার বিপ্লবীদলের দণ্ডের পর নব-বিপ্লবী দলের উত্থানের অভাব হয় নাই। গুপ্ত-সমিতির রচনা দেশব্যাপী হইয়াছিল। অরবিন্দ দেশের গতিই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, মুমূর্ষু দেশে নবজীবন আনিয়া দিয়াছিলেন। সত্যিই তিনি পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাইয়াছিলেন, মূককে বাচাল করিয়াছিলেন।···তিনি সত্যই সেদিন উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাঁহার মন্ত্রে দীক্ষিত সৈন্যদল ভীতিহীন নির্বিকার, যাহারা বিচারে দণ্ডিত হইয়াছে তাহাদের পর যাহারা বিপ্লবপন্থী তাহারাও সেইরূপ ভীতিহীন নির্বিকারচিত্তে দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে আত্মবলি দিতে প্রস্তুত আছে।···

আমার স্মৃতিকথা　　　　　　　　　　　সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দেরই ফেব্রুয়ারি—বোধহয়, মাসের মাঝামাঝি বা শেষাশেষি হবে। রাত তখন প্রায় আটটা আন্দাজ। কলিকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে চার নম্বর শ্যামপুকুর লেনের বাড়ির দ্বিতলের একটি কক্ষে একটি পরিণত বয়স্ক যুবককে ঘিরে কয়েকটি তরুণ বয়স্ক বসেছিলেন। পরিণত বয়স্ক যুবকটি ঘরের একমাত্র আসবাব একটি ছোট তক্তপোষের উপর বসেছিলেন এবং তরুণদের মধ্যে দু-একজন সেই তক্তপোষে এবং বাদবাকি মেঝের উপর স্থান গ্রহণ করেছিলেন। পরিণত বয়স্ক যুবকটির সম্মুখে কাগজ এবং হাতে পেন্সিল। তিনি অটোমেটিক রাইটিং করছিলেন এবং তাই পড়ে শোনাচ্ছিলেন। তরুণরা তাই উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিলেন এবং নানা প্রশ্নে সম্ভবতঃ পরলোকের আত্মাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিলেন।

এই পরিণত বয়স্ক যুবকটির নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ। আর তরুণরা যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীবিজয়কুমার নাগ, শ্রীহেম সেন, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত এবং এই লেখক।...

...আত্মাদের লেখা বলে যদি কেউ মনে করেন যে ব্যাপারটা নিতান্ত আগাগোড়া গুরুগম্ভীর তবে তিনি ভুল করবেন। আত্মাদের সবাই গুরুগম্ভীর নন—তাঁদের মধ্যেও রঙ্গ-রহস্য-কৌতুকপ্রিয় আছেন। সুতরাং সেই অটোমেটিক রাইটিংয়ের আসর কখনও গুরুগম্ভীর বাণীতে স্তব্ধ আবার কখনও হাস্য-কৌতুকে উচ্ছ্বসিত। এমনি যখন আত্মাদের লেখনী পুরোদমে চলছিল তখন সেই ঘরে প্রবেশ করলেন রামবাবু।*...

* শ্যামপুকুরের বৈঠকের নিয়মিত সভ্য এবং মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের বন্ধু, রামচন্দ্র মজুমদার, 'কর্মযোগিন্‌' ও 'ধর্ম' পত্রিকার সহকারী।

রামবাবু ঘরে প্রবেশ করে একটু উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে অরবিন্দকে জানালেন যে তাঁর নামে আবার ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে। বিশ্বাসযোগ্য খবর, কোনো উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী জানিয়েছেন। ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। কিছুকাল আগে থেকেই কানাঘুষা শোনা যাচ্ছিল যে গবর্নমেণ্ট অরবিন্দকে আপন কুক্ষিগত না করে ছাড়বে না। তথাপি সংবাদ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আবহাওয়া মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে গেল। যে-স্থান ছিল হাস্য-কৌতুকে উচ্ছ্বসিত সে-স্থানে নিবিড় স্তব্ধতা ছড়িয়ে গেল। প্রখর আলোক থেকে যেন হঠাৎ অন্ধকার। আমরা সবাই উৎকণ্ঠিত মনে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অরবিন্দ কয়েক মুহূর্ত যেন কি ভাবলেন—কয়েক মুহূর্ত মাত্র—তারপর বললেন—'আমি চন্দননগরে যাব।'

রামবাবু বললেন—'এক্ষুনি ?'

অরবিন্দ উত্তর করলেন—'এক্ষুনি—এই মুহূর্তে।'

অরবিন্দ উঠে দাঁড়ালেন, এবং রামবাবুর সঙ্গে তিনি বাড়ি থেকে বেরুলেন। তাঁদের কিছু পশ্চাতে বেরুলেন বীরেন তাঁদের অনুসরণ করে এবং বীরেনের কিছু পশ্চাতে বেরুলাম আমি বীরেনকে অনুসরণ করে···একটা শোভাযাত্রা নয়, 'বোবাযাত্রা' অর্থাৎ Silent Procession তৈরি হল। চারজন লোকের এই 'বোবাযাত্রা' স্থূল জগতের অসংলগ্ন কিন্তু সূক্ষ্মলোকে সূক্ষ্মসূত্র দ্বারা গ্রথিত হয়ে উত্তর-মুখে পথ চলতে লাগল।···

···প্রায় পনর কি বিশ মিনিট আন্দাজ চলে আমরা গঙ্গার এক ঘাটে এসে পৌছলাম। পূর্বেই বলেছি কলিকাতায় আমি কেবল এসেছি—তিন মাসও হয়নি—সুতরাং আমার তেমন পরিচিত নয়···বাগবাজারের ঘাট হতে পারে। সেই ঘাটে পৌছে নৌকার এক মাঝিকে উদ্দেশ করে রামবাবু হাঁক দিলেন—'আরে, ভাড়া যাবি ?'

কথাবার্তা শেষে অরবিন্দ সেই নৌকায় আরোহণ করলেন।

তারপর বীরেন ও আমি তাতে উঠলাম। রামবাবু বিদায় নিলেন। নৌকা খুলে দিল। আমরা ভাগীরথীবক্ষে ভাসলাম।

নদীবক্ষে গিয়ে বোঝা গেল যে সেটা শুক্লপক্ষ, চতুর্দিক জ্যোৎস্না-লোকে হাস্যোজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ-সম্পাতে বীচিবিভঙ্গে ঝিকিমিকি।

কোথায় পুলিশ, কোথায় নগর, কোথায় দ্বেষ-হিংসা-সংগ্রাম, স্বাধীনতা-পরাধীনতার প্রশ্ন! আমরা যেন মানব-সভ্যতার দারুণ জঠর থেকে প্রকৃতির প্রশান্ত মুক্তির মাঝে ভূমিষ্ঠ হলাম।

পাঁচ বছর অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন। এখানেও ঐ একই ব্যাপার দেখতে পাই। প্রতিবেশ তার জারক-রসে সিদ্ধ ক'রে তাঁকে হজম করতে পারেনি। অর্থাৎ প্রতিবেশ তাঁর বিশ্ব-বিধাতা হ'য়ে ওঠেনি—সোনা-বাঁধানো সরেস ফাউণ্টেন পেন দিয়ে মুরুব্বিয়ানা-চালে তাঁর ললাটে তাঁর জীবন-কাহিনী লেখবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করেনি—প্রতিবেশকে তাঁর অন্তরাত্মার দ্বারদেশের বাইরেই অপেক্ষা করতে হয়েছে 'জী-হুকুমজী' ভঙ্গীতে। রাজনীতির হুড়-হাঙ্গামার ভিতর দিয়েও অরবিন্দের জীবন-রথ তাঁর অন্তরাত্মার গন্তব্য লক্ষ্যের দিকেই চলেছে। কোনো প্রতিবেশ বা কোনো প্রতিবাসী তা ব্যাহত করতে পারেনি।

রাজনীতির একটা প্রচণ্ড নেশা আছে—এমন কি, পরাধীন দেশের রাজনীতিতে এ-নেশার অসদ্ভাব নেই—যেটা সুরার নেশার চাইতে কম নয়। এই সুরা···মানে রাজনীতি-সুরা—একবার উদরস্থ হ'লে, ওর নেশা একবার ধমনীতে ধমনীতে চারিয়ে গেলে মানুষ এমনি মশগুল হয়ে যায় যে তার পক্ষে তখন ও-রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসা দুরূহ ব্যাপার হ'য়ে ওঠে। এর উপরে আবার পরাধীন দেশে যদি রাজনীতির সঙ্গে স্বাধীনতার আদর্শ ও তার জন্য সংগ্রাম যুক্ত হয় তবে তো একেবারে সোনায় সোহাগা। তখন ঐ নেশার সঙ্গে এসে যোগ দেয় ত্যাগ দুঃখ ইত্যাদি বরণজনিত আত্মপ্রসাদ আত্মশ্লাঘা মহত্ত্ববোধ

ইত্যাদি মানুষের সূক্ষ্মতর উপভোগের সামগ্রী। যখন বত্রিশ-তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক অরবিন্দ রাজনীতিক্ষেত্রে এসেই সেখানকার পাকা-পাকা দাড়িয়ালা পরম হোমরাচোমরাদের ডিঙিয়ে একেবারে প্রথম সারিতে এসে দাঁড়ালেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ভারতব্যাপী তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল, তখন রাজনীতিটা তাঁর কাছে কল্পতরু বা কামধেনু কিম্বা open sesame জাতীয় কোনো ব্যাপার ব'লে প্রতীয়মান হওয়া উচিত ছিল। তিনি যদি ঐ রাজনীতিতেই থাকতেন তবে যে তিনি আজ ভারতের মুকুটহীন রাজা ব'লে পরিগণিত হ'তেন সেটা বলবার জন্যে জ্যোতিষী বা ভবিষ্যদ্বক্তা হবার দরকার করে না। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। তাই আবার যখন ডাক এল—তখন দ্বিধাহীন চিত্তে প্রতিবেশকে পরিহার ক'রে মার্কসীয় থিয়োরীকে পরিহাস ক'রে তিনি যেমন আচম্বিতে একদিন রাজনীতিক্ষেত্রে এসেছিলেন তেমনি আচম্বিতে আবার সেখান থেকে চলে গেলেন।

…আজ বাংলাদেশে আধুনিক, অতি-আধুনিক ও সাম্প্রতিকেরা মিলে যেটাকে প্রগতি বলছেন সেটার আসল নাম হচ্ছে অধোগতি। অপর পক্ষে শ্রীঅরবিন্দের মতো ব্যতিক্রমেরা হচ্ছেন বিশ্বমানবের ঊর্ধ্বগতির ধারক, বাহক ও নিরিখ। এঁদেরকে অস্বীকার করলে মানুষ তার আপনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যা, গভীর যা, অবিনশ্বর ও অমৃত যা, তাকেই অস্বীকার করবে। কিন্তু নিশ্চিত জানি মানুষের মধ্যেকার ইন্স্টিংক্ট, তার সহজবোধই বিশ্বমানবকে কোনো দিনই দীর্ঘকাল ব্যেপে এ অস্বীকার করতে দেবে না—দেবে না—দেবে না।

এমনি কৌশল বিশ্ব-প্রকৃতি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন। তাই সত্য সম্বন্ধে একটা মহা তাজ্জব ব্যাপার আছে। এখানে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি মানুষের অস্বীকৃতি একটি মাত্র মানুষের স্বীকৃতি দিয়ে নাকচ হ'য়ে যায়—অর্থাৎ একটি মানুষের অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি কোটি-কোটি মানুষের মন বুদ্ধি বা অহং-সৃষ্ট জল্পনা-কল্পনাকে নস্যাৎ করে দেয়।

এখন, মানুষ যে তার প্রতিবেশকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারে কেবল তাই নয়, যেহেতু একটি মানুষের অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি কোটি-কোটি মানুষের অহং-প্রসূত জল্পনা-কল্পনাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে সেই হেতু একটি মানুষের উপলব্ধ সত্য ও শক্তি তার প্রতিবেশকে পরিবর্তিতও করতে পারে। এমন ব্যাপার মানবজাতির ইতিহাসে বহুবার দেখা গিয়েছে। আমি পূর্বেই দেখিয়েছি যে শ্রীঅরবিন্দ সারাজীবন বার-বার তাঁর প্রতিবেশকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের আত্মায় যে শক্তি সংহত ও সঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে সে-শক্তি ভবিষ্যতে স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রকাশিত হবে প্রতিবেশ পরিবর্তিত করায়।

পুনঃপুনঃ রাজবিচারে অব্যাহতি লাভ করিলেও শ্রীঅরবিন্দ নিরাপদ ছিলেন না। পুলিশের সন্দেহ পূর্ববৎই ছিল। পণ্ডিচেরীতে ইংরেজ-পুলিশ ফরাসী গভর্নমেণ্টের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে একপ্রকার নজরবন্দী করিয়া রাখিত। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

আমার মনে পড়ে, আমি তাঁর চক্ষে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিলাম। তাঁহার ধীর, সৌম্য, শান্ত দেহযষ্টিতে ও সদাহাস্যময় প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে একটা সারল্যের দিব্যদ্যুতি খেলিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছিলাম।...তাঁহার প্রতি কথায়...হৃদয়ে গভীর এবং উদার প্রেমের পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছিল।

দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। এই সেই অরবিন্দ যাঁর অসাধারণ প্রতিভায় সমগ্র বঙ্গ কেন, সারা ভারতবর্ষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যাঁর অভাবনীয় ত্যাগ ও সংযমে বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলন নবপ্রাণ লাভ করিয়াছে...যাঁর বিদ্যুন্ময়ী লেখা পড়িয়া সুধীসমাজ হৃদয়ে নূতন জীবনীশক্তি উপলব্ধি করিয়াছে, সেই অরবিন্দকে এইরূপ সামান্য বেশে—একমাথা চুল, বিরল শ্মশ্রুগুচ্ছ, উদাসীনভাবে আমার সম্মুখে বালকের মত উপস্থিত হইতে দেখিলাম। বুঝিলাম, শ্রীঅরবিন্দ শুধু বিলাত-ফেরত, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত নানা ভাষাবিদ্, কূট রাজনীতিজ্ঞানে পারঙ্গম বঙ্গের জাতীয় দলের নেতা নহেন, তিনি অহংজ্ঞান-শূন্য, বিশ্বহিতের জন্য, বিশ্বপ্রেম সাধনরত মহাযোগী—আদ্যাশক্তি মহামায়ার মন্ত্রপুত্তলিকা, বিশ্বজননীর হাতে তিনি আপনার সর্বস্ব দিয়া মহাত্যাগব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের বিদ্যাবুদ্ধি, ধন, মান, যশ, জীবনের যাহা কিছু সকলই মাতৃপদ-কোকনদে সমর্পিত হইয়াছে। দেবী অন্নপূর্ণার দ্বারদেশে

উদাসীন যোগী শ্রীঅরবিন্দের সদানন্দ মূর্তি দেখিয়া আমি জীবন সার্থক করিলাম। শ্রীঅরবিন্দের চাহিবার কিছু নাই, বলিবার কিছু নাই, ভাবিবার কিছু নাই। শ্রীঅরবিন্দের আজ বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই। শ্রীঅরবিন্দের গৃহ, ধন, মান সব গিয়াছে। আছেন কেবল মা—জগতের মা, অনন্তভুবনপ্রসবিনী মা।...শ্রীঅরবিন্দ মাতৃময়।...আত্মহারা হইয়া, জীবনের সর্বস্ব দিয়া, মহাযোগী উমানাথ শঙ্করের মত তিনি বুকে ধরিয়াছেন মহাকালীর দুইখানি কোটীচন্দ্র-জিনি-আভা—যোগিজন বাঞ্ছিত শ্রীচরণ। সেই মহাতান্ত্রিক, জননীগতপ্রাণ মহাসাধক শ্রীঅরবিন্দকে সাক্ষাৎ করিলাম।...

ঋষির দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। বহু যুগ আগে, যখন অন্য সমস্ত দেশের লোকেরা শুধু পশুর মতো জীবন ধারণ ক'রত তখন এই ভারতবর্ষেরই কোলে এমন সব মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাঁরা পৃথিবীর এই অনন্ত ভোগ-বাসনার, সর্বপ্রকার প্রলোভনের উর্ধ্বে উঠে মানুষের আধ্যাত্মিক কল্যাণের কথা চিন্তা ক'রতে পেরেছিলেন। সেই আদিম যুগে তাঁরা তাঁদের স্রষ্টাকে জানবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সকলকে ডেকে সেই মন্ত্র শুনিয়েছিলেন—যে-মন্ত্র গ্রহণ ক'রলে মানুষ মৃত্যুর পরে দেবতাদের মধ্যে পরিগণিত হবে এবং ইহকালে পাবে জগদীশ্বরের অমোঘ আশীর্বাদ। তারপরে এতদিন কেটে গেছে—ধীরে ধীরে মানুষ অসাধ্য সাধন ক'রে চলেছে তবু সে সেইসব ঋষিদের আদর্শে উপনীত হ'তে পারেনি। তাঁদের চিন্তা, তাঁদের জ্ঞান আরও বহু যুগ ছাড়িয়ে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত হয়ে রয়েছে। তাঁরা যে-সত্য অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন সভ্যতার শিখরে দাঁড়িয়েও মানুষ আজ তা' গ্রহণ ক'রতে পারছে না। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণ আজ ভারতবর্ষের বিগত যুগের ঋষিদের শাশ্বত চিন্তার চির-অম্লান সৃষ্টিরূপে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে সযত্নে সঞ্চিত রয়েছে।

বহুযুগ পরে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ভারতবর্ষে আর একজন ঋষি জন্ম নিলেন, সকলের অগোচরে বাংলাদেশের এক অতি আধুনিক পরিবারে। তাঁর নাম শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। ইনি শ্রীঅরবিন্দ নামেই অধিক পরিচিত। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগাস্ট শ্রীঅরবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময় সারা জগতে নব যুগের সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল। ইয়োরোপে তখন মাৎসিনী স্বাধীনতার মন্ত্রে দিগ্‌দিগন্ত

প্রকম্পিত ক'রে নব যুগের আবাহন ক'রছেন। তাঁরই নেতৃত্বে 'খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত' ইতালী তখন ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হবার স্বপ্ন দেখ্‌ছে। জগতের বাতাসে তখন স্বাধীনতা-গানের উষ্ণতা। এ-হেন সময়ে ভারতবর্ষ শ্রীঅরবিন্দকে লাভ ক'রলে। কিন্তু সেদিন তাঁর আবির্ভাবে সারা পৃথিবী কোলাহল ক'রে ওঠেনি, হয়ত অন্তপুরের কোন্ এক অখ্যাত আত্মীয়ার শঙ্খধ্বনি মাত্র তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল।

শ্রীঅরবিন্দের পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ বিচিত্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। তখনকার দিনে তিনি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল-সার্ভিস্‌ভুক্ত প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। একদিকে যেমন তিনি খাঁটি সাহেবী মেজাজের লোক ছিলেন, অপর দিকে তেমনি দেশের দরিদ্র জনসাধারণের দুর্দশায় তাঁর হৃদয় করুণায় বিগলিত হয়ে যেত। কেউ বিপদে প'ড়েছে শুনলে তিনি আত্মহারা হয়ে তাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করতেন। তিনি বদ্‌লি হয়ে যাবেন শুনে তাঁর প্রতিবেশীরা এমনই শোকবিহ্বল হয়ে পড়তেন যেন কৃষ্ণধন তাঁদের পরিবারেরই একজন। কৃষ্ণধনের চরিত্রের উদারতা তখনকার দিনে অত্যন্ত বিরল ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসেও তিনি দেশের লোকদের ঘৃণা করতেন না। সে-যুগে যাঁরা সিভিল্ সার্ভিস্ কিংবা ঐরকম উচ্চপদে রাজসরকারে চাকুরি ক'রতেন তাঁদের অনেকেই স্বজাতি ও স্বদেশকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। কিন্তু কৃষ্ণধন মনে-প্রাণে স্বজাতিকে ভালোবাসতেন এবং নিজের প্রয়োজন সঙ্কুচিত ক'রেও প্রতিবেশীদের দুঃখ নিবারণ করতেন। ডাঃ কৃষ্ণধন এত উদার ও মহৎ ছিলেন ব'লেই বোধ করি তিনি ঋষি শ্রীঅরবিন্দের মত পুত্রলাভ করেছিলেন।

পিতার চরিত্রের ঔদার্য, বদান্যতা ও নির্বিচার পরদুঃখ-কাতরতা শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রেও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কিন্তু আর একটি মহাত্মার প্রভাব শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রগঠনে সহায়তা করেছিল। ইনি শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ পরলোকগত রাজনারায়ণ বসু। ঊনবিংশ

শতাব্দীর ভারতবর্ষে যাঁরা সকল দিক দিয়ে সমগ্র জাতিকে নূতন প্রেরণায় উদ্বোধিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজনারায়ণ অন্যতম। তিনি একাধারে ধার্মিক, সমাজ-সংস্কারক ও নির্ভীক দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর দেবতুল্য চরিত্রের কথা সারা ভারতে আজও বিখ্যাত। বাংলার ইতিহাসে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবর্তক, একনিষ্ঠ-দেশহিতৈষী এবং পুণ্য-চরিত্র রাজনারায়ণের স্থান চিরদিন অপরিম্লান হয়ে থাকবে। এই 'ভগবদ্‌ভক্ত চিরবালক'টির সুগভীর ঋষিদৃষ্টি শ্রীঅরবিন্দ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। রাজনারায়ণের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের একটি নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সংযোগ ছিল। তাই বুঝি বিংশ শতাব্দীর যন্ত্র-বিজ্ঞানের দ্বারা পরিপুষ্ট অতি-আধুনিক যুগেও শ্রীঅরবিন্দ মানবের সর্বাঙ্গীন সুমহৎ কল্যাণের পথ নিরূপণ করবার জন্য আজ ঋষির আসনে ধ্যানমগ্ন। রক্তে তাঁর ত্যাগের পরাক্রম—অন্তরে তাঁর অনির্বাণ জ্ঞান-শিখা।

শ্রীঅরবিন্দের বাল্যকালটা বিচিত্র আবেষ্টনীর মধ্যে কেটেছে। পূর্বেই বলেছি ডাঃ কৃষ্ণধনের মেজাজটা অত্যন্ত সাহেবী ধরনের ছিল। তাঁর ধারণা ছিল যে এদেশে আর যাই হোক্, লেখাপড়াটা কোন মতেই ভালো হয় না। তিনি স্থির করলেন তাঁর ছেলেদের বিলাতে রেখে লেখাপড়া শেখাবেন। আর্থিক স্বচ্ছলতা তাঁর যথেষ্টই ছিল, কাজেই তাঁর এই ইচ্ছাটি কার্যে পরিণত ক'রতে বেশী বেগ পেতে হ'লো না। বিনয়কুমার, মনোমোহন আর অরবিন্দ এই তিন পুত্রকে নিয়ে তিনি যখন বিলাতযাত্রা করেন তখন শ্রীঅরবিন্দের বয়স মাত্র সাত বৎসর। পুরাকালে ভারতবর্ষে সাত বৎসরের বালকদের গুরুগৃহে পাঠানো হ'ত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কঠোর অনুশীলনে চিত্তকে শুদ্ধ ও দেহকে সুগঠিত ক'রে সর্বপ্রকার শাস্ত্রাধ্যয়ন সুসম্পন্ন করবার জন্য। আর বিংশ শতাব্দীর যিনি সমগ্র জগতের সামনে ভারতবর্ষেরই চিরন্তন আদর্শকে উজ্জ্বল ক'রে তুলছেন তাঁর প্রথম বিদ্যারম্ভ হ'লো ইংলণ্ডে—পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে। বাংলাদেশের একটি

সামান্য বালক যাত্রা ক'রল সমুদ্রপথে সরস্বতীর সাধনা ক'রতে। অগণিত তরঙ্গ-সঙ্কুল ভীষণ সমুদ্রের অশ্রান্ত কলকল্লোল বালক অরবিন্দের প্রাণে নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করলে। এইখানে একটা কথা বলে রাখি—এই যাত্রার সময়ে জাহাজের উপরেই শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারের জন্ম হয়।

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা আরম্ভ হয় ম্যাঞ্চেষ্টারে এক ইংরেজ পরিবারে। এই পরিবারের অভিভাবকত্বে তিনি প্রথম বিদ্যারম্ভ করেন এবং ধীরে ধীরে ইংরেজ সমাজের সঙ্গে পরিচিত হন। পরে মাত্র তেরো বৎসর বয়সে তিনি লণ্ডন সেণ্ট্ পল্ স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলে থেকেই তিনি পাঁচ বৎসর পরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি শুধু পাশ করেননি, কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তিলাভও করেছিলেন। এই হ'লো শ্রীঅরবিন্দের অসামান্য মেধার প্রথম পরিচয়। এর পর তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ট্রাইপোজ' নামক একটি কঠিন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন।

এত অল্প বয়সেই শ্রীঅরবিন্দ অত্যন্ত দুরূহ বিষয় আয়ত্ত করতে ক্লান্তিবোধ করেননি। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় গ্রীক্ ও লাতিন ভাষায় তিনি যত নম্বর পেয়েছিলেন তাঁর পূর্বে আর কোন আই-সি-এস্ পরীক্ষার্থী তত নম্বর পাননি। আই-সি-এস্ তখনকার দিনে ভারতবাসীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু ছিল। পদানত ভারতবাসীর কাছে আই-সি-এস্ ছিল সৌভাগ্যের সর্বোচ্চ শিখর। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে ঐ পরীক্ষায় অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হ'লেন এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করলেন। বাল্যেই তিনি ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন, সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষায় তাঁর গ্রীক্ ও লাতিন ভাষাতেও অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখে তাঁর সহপাঠীরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এই ক্ষীণতনু বাঙালী বালকটি বহু মেধাবী শ্বেতাঙ্গ যুবকের ঈর্ষার কারণ হ'লো।

আই-সি-এস্ পেয়ে তিনি ভারত সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী হবেন এই ছিল তাঁর ছাত্র-জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু তা' হ'লো না। ভারতবর্ষের কানে যিনি গম্ভীর উদাত্তকণ্ঠে স্বাধীনতার বাণী শোনাবেন, বিদেশী রাজ-সরকারে দাসত্ব করা তাঁর ঘটে উঠল না। শ্রীঅরবিন্দ সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষার একটি অঙ্গ ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা দিলেন না। বিলাতে তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিতি হয়েছিলেন। ইয়োরোপের শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁর চরিত্র গড়ে উঠেছিল—সেখানকার রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য ও দর্শন তিনি অসামান্য অধ্যবসায় ও অকৃত্রিম জ্ঞানলিপ্সার সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু এবার তিনি তাঁর মাতৃভূমির সুপ্রাচীন জ্ঞান-রাজ্যের রত্নরাজি আহরণ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহত্বটুকুই হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চিত করেছিলেন তাই তাঁর সারা অন্তর স্বর্গাদপি গরীয়সী ভারতবর্ষকে জানবার, তাঁর জন্মভূমির সুমহৎ, ত্রিকালজয়ী আদর্শকে উপলব্ধি করবার জন্য হাহাকার ক'রে উঠল।

বিদেশী শিক্ষা-দীক্ষায় লালিত তরুণ যুবক সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার ক'রে হাইকোর্টের জজ্ হলেন না, বড়লাটের সচিবত্ব গ্রহণ ক'রে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করলেন না, রিক্তপদে, শ্রদ্ধাবনতশিরে সর্বপ্রকার ঐহিক কামনা পরিহার ক'রে তাঁর বন্দিনী মাতৃভূমির সেবা করতে ছুটে এলেন। দেশের ছেলে দেশে ফিরলেন—ভারতবর্ষের অন্তর ব'লে উঠল—স্বাগতম্!

ইংলণ্ডে যখন শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষার্থীর কর্তব্যের মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন রেখেছিলেন সেই সময় বরোদার গায়কোয়াড়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। গায়কোয়াড় মানুষ চিনতেন, তাই শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে যে একটি সত্যকার জ্ঞানপিপাসু বিদ্যার্থী বিরাজমান ছিল সে সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। ইয়োরোপ থেকে শ্রীঅরবিন্দ

যখন ফিরে এলেন তখনও তিনি মনে-প্রাণে ছাত্র। পৃথিবীতে জ্ঞানাহরণ ছাড়া আর কিছুতেই তাঁর পটুতা ছিল না। কিন্তু এই অনভিজ্ঞ বাঙালী ছাত্রটিকেই গায়কোয়াড় সাদরে নিজের রাজ্যের একটি দায়িত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত ক'রে দিলেন।

শ্রীঅরবিন্দকে তিনি বরোদা সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত করেন। শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে সেট্‌ল্‌মেণ্ট এবং পরে রাজস্ব বিভাগে কাজ ক'রতে আরম্ভ করেন। তাঁকে গায়কোয়াড়ের প্রাইভেট্‌ সেক্রেটারীর কাজও কিছু-কিছু ক'রতে হ'ত। হয়ত গায়কোয়াড় এই বিনয়াবনত যুবকটির সাহচর্যে বিমল আনন্দলাভ ক'রতেন। কিন্তু এ শাসন-সংক্রান্ত কাজে শ্রীঅরবিন্দ বেশী দিন মন দিতে পারলেন না। নিবিড়ভাবে জ্ঞানলক্ষ্মীর পদ-বন্দনা করবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। নীরস এবং কঠিন সিভিল সার্ভিস্‌ তাঁর কাছে অসহ্য বোধ হ'ল। তিনি বরোদার সিভিল সার্ভিস্‌ ছেড়ে দিয়ে, শিক্ষা বিভাগে কার্যভার গ্রহণ ক'রলেন। জ্ঞান-তপস্বী এবার তাঁর প্রকৃত কার্যক্ষেত্র নির্বাচন করলেন—শ্রীঅরবিন্দ বরোদা কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'লেন।

শ্রীঅরবিন্দের মত মহাপুরুষের জীবনে এই অধ্যাপনার কার্যভার গ্রহণ করা একটি অত্যাবশ্যক ঘটনা। যিনি সত্যকারের বিদ্যালাভ করেন বিদ্যাদান করার মধ্যে তাঁর সে সঞ্চয়ের প্রকৃত সার্থকতা। এই অধ্যাপনার সময়েই শ্রীঅরবিন্দ বিশেষভাবে নিজেকে বিকশিত ক'রে তোলবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর অধ্যাপনা ছিল আদর্শ অধ্যাপনা। তিনি যেমন ছাত্রদের শিক্ষাদান ক'রতেন তেমনি নিজেও সর্বদা বিশ্বের জ্ঞান-রাজ্যের অমূল্য রত্নরাজি সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতেন। ইংলণ্ডে তিনি প্রতীচ্যের কাব্য-দর্শন-বিজ্ঞানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সেখানকার শিক্ষার আদর্শ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন একাগ্র সাধনা দিয়ে কিন্তু প্রাচ্য-সংস্কৃতির মর্মস্থল তখনো তাঁর কাছে আত্মপ্রকাশ করেনি—তখনো তিনি নিজের দেশের সাহিত্য-দর্শনের

মধ্যে ভারতীয় বিদ্যার পরম আদর্শ অনুসন্ধান ক'রতে শেখেননি। সেইজন্য বরোদায় অধ্যাপনা করবার সুযোগ পেয়ে তিনি তাঁর নির্জন প্রবাস বাসের অবসরে ভারতীয় প্রাচীন কাব্য, দর্শন এবং সাহিত্য সম্পদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে আরম্ভ করলেন। এই সময়েই তিনি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন ক'রে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ক'রে তোলেন। শ্রীঅরবিন্দের ঋষি-জীবনের এই বোধহয় প্রথম সূচনা।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে যে-সব মনীষী ব্যক্তিরা পণ্ডিত সমাজের কৌস্তুভমণি ব'লে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাঁরা সাংসারিক সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ ক'রে শুধু শাস্ত্রাধ্যয়নে এবং জ্ঞানানুশীলনে জীবন অতিবাহিত করতেন। বরোদায় শ্রীঅরবিন্দ যে-জীবন যাপন ক'রতে লাগলেন সে-ও সেই প্রাচীন আদর্শকে অনুসরণ ক'রেই। তিনি তখন যুবক কিন্তু যৌবনের কোন চাঞ্চল্যকে তিনি অন্তরের মধ্যে স্থান দেননি। তাঁর পড়াশুনোর কথা ভাবতে গেলে বর্তমান ছাত্রদের পাঠানুরক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মায়। তাঁর নিজের বই কখনো বুকপোস্টে আসত না—বড় বড় প্যাকি বাক্সে বোঝাই হয়ে 'রেল পার্শেলে' তাঁর বই আসত। বরোদায় তাঁর বেতন কম ছিল না কিন্তু প্রতি মাসেই তাঁকে ঋণ ক'রতে হ'ত। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে নানা ভাষার প্রাচীন এবং আধুনিক পুস্তকরাশিতে তাঁর জীর্ণ আবাসটি পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন ক'রেও তিনি অম্লান মুখে অধ্যয়ন ক'রে যেতেন। শারীরিক বা পারিপার্শ্বিক কোন অসুবিধাই তাঁর সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে পারত না। অধ্যয়ন তাঁর কাছে ছিল আনন্দের উৎস আর বইগুলি ছিল তাঁর অবিচ্ছেদ্য সহচর। ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান্, গ্রীক্, লাতিন, ইংরেজী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার অসংখ্য পুস্তকে তাঁর লাইব্রেরী পরিপূর্ণ ছিল। চসার থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিকতম ইংরেজ কবির কাব্য-গ্রন্থও তাঁর বাড়িতে বিরল ছিল

না। হোমার, দান্তে, বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস সকলেই তাঁর আলমারীতে বিরাজ করতেন। সমস্ত পার্থিব সুখকে বিতাড়িত ক'রে সার্বভৌম জ্ঞানরাশির অধিকারী হবেন এই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভীষ্ট। তাই বুঝি তপস্যা তাঁর আবাল্য, নিস্পৃহতাতে তাঁর আশৈশব অনুরাগ।

এইখানে তাঁর আর একটি অসামান্য প্রতিভার কথা না ব'ল্লে তাঁর জীবন-চরিত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বাল্যকাল থেকেই শ্রীঅরবিন্দের কবি-প্রতিভা ছন্দের মধ্যে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে। কিছুদিন পূর্বে তাঁর মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সের লেখা একটি ইংরেজী কবিতা প্রকাশিত হ'য়েছে। বরোদায় তিনি বহুদিন জ্ঞানাহরণের মধ্যেও নিয়মিত কাব্যচর্চা করতেন। কাব্যসাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আজও লোকের মনে বিস্ময় জাগিয়ে তোলে। মহাভারতের এক একটি উপাখ্যান অবলম্বন ক'রে তিনি বহু ইংরেজী কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর "কর্মযোগীন্" পত্রিকায় তাঁর লেখা ইংরেজী কবিতা প'ড়লে তাঁর অনুপম কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

বরোদায় অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের মাঝখানে তাঁর কাব্য-সৃষ্টি এইভাবে যখন নীরবে এগিয়ে চলেছে, সেই সময় ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত গায়কোয়াড়ের আমন্ত্রণে বরোদাভ্রমণে গিয়েছিলেন। রমেশচন্দ্রের তেজস্বী লেখনী গদ্যে, পদ্যে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে সমান শক্তিমান ছিল। তিনি ইংরেজী ও বাংলা দু'রকম রচনাতেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের বাসায় এসে তিনি এই নবীন লেখকটির লেখা দেখতে চাইলেন। শ্রীঅরবিন্দ অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে তাঁর কবিতাগুলি রমেশচন্দ্রের হাতে দিলেন। এত বড় একজন লোক তাঁর লেখা দেখবেন এতে শ্রীঅরবিন্দ নিতান্তই কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র কবিতাগুলি প'ড়ে বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, "তোমার কবিতা আগে পড়লে আমি কখনই আমার লেখা ছাপাতুম না। এখন দেখছি আমি

ছেলেখেলা করেছি।” এই অতি স্বল্পভাষী যুবকের প্রতিভাদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে গেলেন। শ্রীঅরবিন্দের কবি-প্রতিভা এই সর্বপ্রথম প্রতিভাবান লেখকের সমাদর লাভ ক'রলে। যশে তাঁর নিজের প্রয়োজন ছিল না কিন্তু প্রতিভা কখনো গোপন থাকে না; তাঁর অন্তরের মধ্যে যে দীপ্যমান প্রতিভা আত্মগোপন ক'রে ছিল রমেশচন্দ্র সহজেই তার সন্ধান পেয়েছিলেন।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের মাতুল স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়কে শ্রীঅরবিন্দকে বাংলাভাষা শেখানোর জন্য অনুরোধ করেন। দীনেন্দ্রকুমার রায় যখন বরোদায় গেলেন তখন তাঁর বিস্ময়ের অবধি রইল না। তিনি গিয়ে দেখলেন যে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ যাঁর নাম, তিনি একটি শ্যামবর্ণ ক্ষীণতনু যুবক। তাঁর পায়ে শুঁড়ওয়ালা সেকেলে নাগ্‌রা জুতো, পরনে মোটা পাড় বিশ্রী ধুতি, গায়ে মোটা মেরজাই আর মাথায় লম্বা লম্বা চুল। আবাল্য যাঁর ইয়োরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষা আর বিলেতী সমাজের মধ্যে কেটেছে তাঁর এই বেশভূষা! দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন, “দেওঘরের পাহাড় দেখাইয়া কেহ যদি বলিত ‘ঐ হিমালয়’ তাহা হইলেও বোধ হয় ততদূর বিস্মিত ও হতাশ হইতাম না।”

বাস্তবিক, যিনি ইংরেজী, সংস্কৃত, ফরাসী, লাতিন এমন কি গ্রীক্ ভাষাতেও সুপণ্ডিত—তাঁর পরনে আহ্‌মেদাবাদী মিলের মোটা ধুতি এবং গায়ে মোটা মেরজাই, এর চেয়ে বিস্ময়ের আর কি হ'তে পারে? বিলেতের যন্ত্র-সভ্যতা এবং সাড়ম্বর জীবনযাত্রার মধ্যে যিনি বর্ধিত তাঁর এত সরল জীবনযাত্রা কেমন ক'রে সম্ভব হ'লো? কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের চরিত্র তো মাটির মানুষের চরিত্র নয়; পৃথিবীর বস্তুপুঞ্জের প্রতি তাঁর কোন মমত্ববোধ কোনদিনই ছিল না। তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তের ক্ষীণ হাসিটুকুতে হৃদয়ের যে অটল সঙ্কল্প আত্মপ্রকাশ ক'রত, সে-সঙ্কল্প মানুষের দুঃখে নিজের সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের সুমহৎ আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। পার্থিব কোন উচ্চাভিলাষ পোষণ করার মতো

হৃদয় তাঁর নয়। বিশ্বমানবের দুঃখদুর্দশার অবসান ঘটানো যাঁর কাম্য তাঁর কাছে নিজের অতি সামান্য স্বাচ্ছন্দ্যের মূল্য কী? শীঘ্রই দীনেন্দ্রকুমার জানতে পারলেন যে তিনি যাঁর শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েছেন তিনি ভাবী যুগের গুরু, তিনি ভারতবর্ষের অনাগত যুগের বিরাট স্রষ্টা, বিশ্বের কল্যাণ কামনায় আত্মহারা বিরাট পুরুষ।

সংসারের মধ্যে শ্রীআরবিন্দ কোনদিনই নিজেকে বাঁধতে পারেন না। তাঁর স্ত্রীকে তিনি তাঁর সাধনার সাথী ব'লেই মনে করতেন। সংসারে লিপ্ত না থেকেও শ্রীঅরবিন্দ যথাসাধ্য নিজের কর্তব্য পালন করতেন। মাতা ভগিনীকে টাকা পাঠাতে কখনো তাঁর ভুল হ'ত না। আত্মীয়-স্বজনকে চিঠি-পত্র দিতেও তাঁর ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু কোন আত্মীয়ের সঙ্গেই তাঁর বিশেষ মাখামাখি ছিল না। নিজের অগ্রজদের সঙ্গেও সংস্রব তাঁর অত্যন্ত শিথিল হয়ে এসেছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা বিনয়কুমার কুচবিহার রাজদরবারে চাকরি করতেন এবং মধ্যম ৺মনোমোহন ক'লকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর ভ্রাতৃগণের মধ্যে একমাত্র কনিষ্ঠ বারীন্দ্রকুমারই কয়েকবার বারোদায় গিয়েছিলেন। বরোদায় প্রবাসকালে তাঁর স্ত্রী ও ভগিনী মাঝে মাঝে তাঁর নিঃসঙ্গতা দূর করতেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের সত্যকারের অন্তরের যোগ ছিল তাঁর মাতুল পরিবারের সঙ্গে। মায়ের সঙ্গ জীবনে তিনি খুব অল্পই পেয়েছিলেন কিন্তু জগতে মায়ের চেয়ে ভক্তি বোধহয় তিনি কারুকেই করতেন না।

তাঁর মত অতিমানবের পক্ষে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব ছিল না। আত্মীয়স্বজন সম্বন্ধে তাঁর উদাসীনতা খুবই স্বাভাবিক। নিজের সম্বন্ধেও অসীম ঔদাসীন্য তাঁর বন্ধুবর্গকে পীড়িত ক'রে তুলত। তিনি বলতেন, "নিজের কথা যত কম প্রকাশ করা যায় ততই ভালো।" বরোদায় তিনি প্রায় হাজার টাকা বেতন পেতেন কিন্তু নিতান্ত দরিদ্রের মতো বাস করতেন। একটি কদর্য

গৃহে একটি ছোট্ট বাতি জ্বেলে তিনি গভীর রাত্রি পর্যন্ত বিশ্ব-সাহিত্য-দর্শনের রাজ্যে বিচরণ করতেন। অসংখ্য মশার কামড়ে ম্লান দীপালোকে যোগ-নিরত তপস্বীর মতো তিনি জ্ঞানানুশীলনে, সুগভীর সাহিত্যালোচনায় নিমগ্ন থাকতেন। কোন বিলাসিতাই তাঁকে স্পর্শ ক'রতে পারেনি। বেশভূষার প্রাচুর্য তাঁর মোটেই ছিল না। বরোদার রাজদরবারে যাবার সময়ও তাঁর মাথায় 'পিরালী টুপি' আর গায়ে মেরজাই শোভা পেত। শয্যাতেও তাঁর কোন আড়ম্বর ছিল না। বরোদা রাজ্যের বিখ্যাত অধ্যাপক হয়েও তিনি যে লোহার খাটে নিদ্রা যেতেন তা' সামান্য কেরাণীর পক্ষেও বোধহয় পীড়াদায়ক ছিল। কোমল শয্যায় শয়ন করা তাঁর পক্ষে নিতান্ত বিলাস-বাহুল্যের সমান ছিল। বরোদা মরুভূমির কাছে ব'লে সেখানকার শীত এবং গ্রীষ্ম এই দুটো ঋতুই অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ কোনদিনই লেপ গায়ে দিতেন না। একটি অল্প মূল্যের কম্বল পেলেই তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতেন। প্রচণ্ড শীতে তিনি সেই কম্বলখানি গায়ে দিয়ে অকাতরে নিদ্রা যেতেন। কঠোর ব্রহ্মচর্যের মধ্যেও তাঁর মন কখনও নিপীড়িত বোধ ক'রত না। মুখে তাঁর সর্বদাই অবিমিশ্র প্রশান্তি বিরাজ ক'রত। যাঁর জ্ঞানৈশ্বর্য কুবেরের ধন-ভাণ্ডারের মতো অপরিমিত, পৃথিবীর দৈন্য তাঁর চিত্তকে স্পর্শ ক'রবে কোথা দিয়ে? তাই কম্বলের মধ্যেই তাঁর পরম বিত্ত, 'পিরালী টুপি' তাঁর রাজমুকুট!'

বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের একখানি 'ভিক্টোরিয়া' গাড়ি ছিল। সে গাড়িখানি যে কতদিনের জীর্ণ, তা' কেউ বলতে পারতো না, আর তাঁর একটি বিরাটকায় ঘোড়াও ছিল কিন্তু এই ঘোড়াটির কলেবর যেমনই বিরাট ছিল, আলস্যও ছিল তেমনি বিপুল। দীনেন্দ্রকুমারের ভাষায়, "কিন্তু চলনে, গাধার দাদা!" তিনি যে বাড়িটিতে থাকতেন সে-বাড়িটি আর যাই হোক্, শ্রীঅরবিন্দের মত লোকের বসবাসের যোগ্য ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ প্রচুর টাকা ভাড়া দিয়েও ঐ বাড়িটিতে বাস করতেন। লোকে তাঁকে অবাধে ঠকিয়ে যেত এবং তিনিও অম্লান

বদনে ঠক্‌তেন। অর্থে তাঁর মমতা ছিল না, কাজেই তাঁর অর্থ যখন অপরে আত্মসাৎ ক'রত তখন তিনি কোন ক্ষতিই অনুভব করতেন না এবং নির্মমভাবে তাঁকে কেউ ঠকালেও তিনি ক্রুদ্ধ হ'তেন না, কিংবা অনুতাপ ক'রতে বস্‌তেন না। শুধু তাই নয় আত্মীয়-স্বজনের সহস্র ত্রুটিতেও তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটত না। কোন কারণেই তাঁর মুখে স্নেহের হাসিটুকু কেউ কখনো বিলীন হ'তে দেখেনি। মানুষকে তিনি ক্ষমা ক'রতে শিখেছিলেন ব'লেই আজ তিনি মানুষের অনেক উর্ধ্বে।

বরোদার মহারাজা শ্রীঅরবিন্দকে প্রীতি এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁর মত লোকের পক্ষেই শ্রীঅরবিন্দের মত যথার্থ জ্ঞানীর সমাদর করা সম্ভব ছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে এই বাঙালী অধ্যাপকটির সংস্পর্শে এসে তাঁর দেশের ছাত্রগণ নূতন আলোকের সন্ধান পাবে—তাঁর জাতির প্রভূত কল্যাণসাধিত হবে। তিনি জানতেন যে তাঁর রাজ্যের বিশাল কর্মশালায় হাজার-দু'হাজার টাকা বেতনের বিরাটকায় কর্মচারী অনেক আছেন কিন্তু দ্বিতীয় অরবিন্দ নেই। অবশ্য বরোদাপতির একান্ত প্রীতিভাজন হয়েও শ্রীঅরবিন্দ কোনদিন নিজের চাকরির উন্নতির চেষ্টা করেননি। এমন কি অন্য কোন ব্যক্তিরও সুখ সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। হয়ত শ্রীঅরবিন্দের কোন প্রার্থনাই মহামান্য গায়কোয়াড় না-মঞ্জুর করতেন না। শ্রীঅরবিন্দকে কিছুই তাঁর অদেয় ছিল না। একটু চেষ্টা ক'রলেই তিনি অতুল মান-সম্ভ্রমের অধিকারী হ'তে পারতেন। মহারাজের সামান্য দৃষ্টিপ্রসাদ লাভ করবার জন্য কত লোক অশেষ অধ্যবসায়ের সঙ্গে আশেপাশে ঘুরে বেড়াত, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ মহারাজের অকৃত্রিম সখ্য লাভ ক'রেও কোনদিন কোন স্বার্থসিদ্ধির, কোন সম্মান আদায়ের চেষ্টা করতেন না। কেউ একথা বললে তিনি হেসে ব'লতেন, "কতকগুলো মূর্খের তোষামোদেই কি কোন আনন্দ পাওয়া যায়?" কিন্তু অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সপ্রশংস উক্তিতেও তিনি দিশাহারা হতেন না। রমেশচন্দ্র যখন তাঁর ইংরেজী

কবিতার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন সেদিনও তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেননি। দুঃখে যেমন তাঁর মন উদ্বিগ্ন হ'ত না, সুখের প্রতিও তাঁর স্পৃহা জাগতো না।

বরোদায় তাঁর নিরবচ্ছিন্ন কর্মজীবনের মধ্যে কোথাও কোন ফাঁকি ছিল না। তাঁর অধ্যাপক জীবনের সুমহৎ দায়িত্ব তিনি সানন্দে বহন করতেন। পঠন-পাঠনের সুকঠিন আবরণ ভেদ ক'রে উৎসব-আনন্দের কোন আহ্বান, কোন প্রলুব্ধ আবেদন তাঁর অন্তর স্পর্শ ক'রতে পারত না। কাজের তাঁর শেষ ছিল না, অধ্যাপনা ছাড়া তাঁকে কিছু-কিছু রাজকার্যও ক'রতে হ'ত। কিন্তু কর্মস্রোতে ভেসে যেতেই তাঁর অসীম আনন্দ ছিল, এ আনন্দের কাছে বোধহয় পৃথিবীর কোন আনন্দই তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাঁর জীর্ণ বাসাটিতে বরোদার 'লক্ষ্মী বিলাস' প্রাসাদ থেকে মহারাজের উর্দিপরা অস্ত্রধারী পত্রবাহক আসত—মহারাজের নিমন্ত্রণলিপি বহন ক'রে। মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী লিখতেন, "আজ আপনি মহারাজের ডিনারে যোগদান ক'রলে তিনি বড়ই আপ্যায়িত হবেন।" কিংবা, "আজ একবার মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাতের অবসর হবে?" তাঁর অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রার মধ্যে স্বয়ং মহারাজের নিমন্ত্রণ বহন ক'রে যখন সশস্ত্র পত্রবাহক এসে হাজির হ'ত তখন তিনি গর্বে স্ফীত হতেন না; এমন কি কিছুমাত্র বিব্রত হওয়াও তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। কাজের ভীড়ে কোন কোনদিন মহারাজের এই সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণও তিনি প্রত্যাখ্যান ক'রতে দ্বিধা করতেন না। তিনি মহারাজের অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মান কখনো কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হ'তে দেননি। কর্তব্যের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ অনুরাগে তিনি উন্নত-শিরে আপনার সাধনার পথে এগিয়ে চলেছিলেন। কেবল আজই তিনি ধ্যানরত ঋষি নন, তিনি আজন্ম সাধক, নির্বিকল্প তপস্বী।

বরোদায় তাঁর শিক্ষা-ব্রত তিনি কঠোর আত্মকৃচ্ছ্রতার সঙ্গে পালন ক'রে চলেছিলেন। অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দের নাম বরোদার ছাত্রসমাজ

তখন সম্ভ্রমের সঙ্গে গ্রহণ ক'রত। একথা বললে বোধহয় খুব অত্যুক্তি হবে না যে অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ বরোদার অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর ক্ষমাশীল উদারতায় নবীন ছাত্রদল তাঁর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং' এই সাধু-বাক্যের নিগূঢ় সত্যতা বরোদাবাসী ছাত্রগণ তাদের এই তরুণ বাঙালী অধ্যাপকটির চরিত্রে সর্বাঙ্গীণভাবে উপলব্ধি ক'রে নিজেদের ধন্য জ্ঞান ক'রত। কর্তৃপক্ষও তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে তাঁর পদোন্নতির প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। অধ্যাপকের পদ থেকে তিনি শিগ্‌গিরই ভাইস্-প্রিন্সিপ্যালের পদে উন্নীত হলেন।

যদিও শিক্ষা বিভাগেই ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র তবু নানা রাজকার্যে মহারাজ তাঁর মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তাঁর রাজনীতি ও অর্থনীতিগত জ্ঞান মহারাজের রাজকার্যে বিশেষ সহায়তা ক'রত। বরোদায় আর কিছুদিন থাকলে তিনি নিশ্চয়ই দেওয়ানের পদে উন্নীত হ'তেন। কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্র আরও বৃহৎ, তাঁর চিন্তাধারা মহত্তর কর্মস্রোতকে পরিচালিত ক'রবে—এই ছিল বুঝি বিধাতার অভিপ্রায়। তাই একদিন জাতীয় জীবনের নব জাগরণের কল-কল্লোলে তাঁর প্রাণ সানন্দে সাড়া দিয়ে উঠল। সর্বপ্রকার বিত্ত-গরিমার বিপুল সম্ভাবনা পরিত্যাগ ক'রে তিনি আর এক রঙ্গমঞ্চে উদিত হ'লেন দরিদ্রের বেশে, সর্বস্ব-ত্যাগী দীনরূপে।

পূর্বেই বলেছি শ্রীঅরবিন্দ আদর্শ অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ছাত্রদের অধ্যাপনা এবং নিজের অধ্যয়ন এই নিয়েই সারাক্ষণ ব্যাপৃত থাকতেন। তাঁর সুগভীর অধ্যয়নের মধ্যেও তাঁর ঐকান্তিক দেশাত্মবোধ প্রকাশ পেত। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সারমর্ম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অন্তর প্রাচ্য জ্ঞান-রাজ্যের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। প্রাচ্যের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ও নিবিড় অনুসন্ধিৎসাই তাঁকে সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের অনুশীলনে প্রবৃত্ত করেছিল এবং তারপর একদা মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য তাঁর অন্তর তৃষাতুর হয়ে উঠলো। তিনি

উপলব্ধি করলেন যে মাতৃভাষার অমৃত পান না ক'রলে জ্ঞান-স্বর্গে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়, তাই তিনি বাংলাভাষার অনুশীলনে অক্লান্তভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। বাংলা তিনি এমনভাবে শিখলেন যাতে তাঁর লেখনী সতেজ সরলতায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। "ধর্ম" পত্রিকার সম্পাদক হয়ে তিনি যে-সকল প্রবন্ধ রচনা ক'রেছিলেন, বাংলাভাষার রত্নভাণ্ডারে তা' সযত্নে সঞ্চিত থাকবে। গভীর রাজনৈতিক এবং দার্শনিক প্রবন্ধগুলিতেও তাঁর রস-সৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। গম্ভীর তত্ত্বকথাও সুমধুর হাস্যরসের আবরণে ঢেকে রাখবার কৌশলটুকু তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। জীবনের সহস্রবিধ জটিলতাও তিনি হাসি দিয়ে বাক্যের চাতুর্যে সরল এবং উপভোগ্য ক'রে তুলতেন।

ভারতবর্ষের আর একটি মনীষার সঙ্গে তিনি ইতিমধ্যে অত্যন্ত পরিচিত হয়েছিলেন এবং তা' হ'ল বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য। সত্যদ্রষ্টা বঙ্কিম যে আমাদের দেশের অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে সুবর্ণসেতু গড়ে তুলেছিলেন একথা শ্রীঅরবিন্দ অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি ক'রতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরে বঙ্কিমচন্দ্রের মহিমা কীর্তন ক'রে শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেগুলিতে শুধু তাঁর পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পায়নি, সেগুলির মধ্য দিয়ে ভারতবাসী তাঁর সত্য-দৃষ্টির পরিচয় পেয়েছিল। বাংলা সাহিত্য-পাঠে তাঁর অনুরাগ ও অধ্যবসায়ের সীমা ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দের তিনি অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। বিবেকানন্দের লেখায় তিনি "প্রাণের সাড়া" পেতেন এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, রবীন্দ্রকাব্যে তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ, তাঁর ঋষি-জীবনের পথে একটি বিশেষ স্মরণীয় সোপান।

ভাষা শেখবার আশ্চর্য ক্ষমতা শ্রীঅরবিন্দের আবাল্য। বরোদায় অধ্যাপনা ক'রতে ক'রতে তিনি প্রায় বাংলা ভাষারই মতো অকৃত্রিম অনুরাগের সঙ্গে মারাঠা ভাষা শিখেছিলেন, এমন কি মারাঠা ভাষার

অপভ্রংশ 'মেরি' ভাষা শিখতেও তাঁর আগ্রহের শেষ ছিল না। এই মারাঠা ভাষা শেখার ফলেই শ্রীঅরবিন্দ ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন।

অধ্যাপকের কাজ ক'রতে ক'রতেই ভারতবর্ষের পরাধীনতার শৃঙ্খলের বেদনা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। তিনি সারা অন্তর দিয়ে গভীর উদাত্তকণ্ঠে ভারতবাসীকে সম্বোধন ক'রে ব'লে উঠলেন, 'জাগৃহি!' সমগ্র মারাঠাজাতিকে উদ্বোধিত করলেন। তাদের অবসন্ন জাতীয়তাবোধকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করলেন। শিবাজীর রক্ত তাঁরই অনুপ্রেরণায় ব'লে উঠল, 'বন্দে মাতরম্। মারাঠা সিংহ লোকমান্য তিলকের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের শুধু আদর্শগত সংযোগই ছিল না, এই দুটি মহাপ্রাণের মধ্যে আন্তরিক সখ্যও ছিল। এঁদেরই সম্মিলিত চেষ্টায় মারাঠা এবং বাংলা এক অদ্ভুত ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে উদ্দীপিত করেছিল। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তিলকের হৃদ্যতা ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা।

তারপর ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দ। সারা হিন্দুস্থানের অঙ্গে অঙ্গে বিদেশী প্রহরণের দুঃসহ বেদনা অনুভূত হচ্ছে। দিকে দিকে দেশাত্মবোধের দুর্নিবার জয়যাত্রা। বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে তুমুল আন্দোলনের দুর্জয় উন্মাদনা। বরোদায় শান্তিময় জীবনের মাঝে শ্রীঅরবিন্দের কানে তাঁর জন্মভূমির আহ্বান এসে পৌঁছল। তপস্যা তাঁর নিমেষে ছুটে গেল। মাতৃভূমির আর্তনাদ শুনে তিনি জ্ঞান-যজ্ঞের বেদী থেকে নেমে এলেন। এতদিনে বুঝি তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল—জ্ঞান-লক্ষ্মীর সাধকরূপে নয়, তেজোময় মন্ত্রদাতা রূপে। দ্বাদশ বছরের তপঃশক্তিতে অসীম বীর্যবান, জ্যোতির্ময় পুরুষ বাংলার সাত কোটি নর-নারীর মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'জাগৃহি!' বাংলার নবজাগরণে ধরিত্রী কেঁপে উঠল।

আজকের দিনে সারা ভারতবর্ষে যে স্বাধীনতা লাভের অত্যুগ্র

কামনা, যে দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা, যে মহান প্রচেষ্টা দেখে মনে মনে গর্ব অনুভব করি, একদা বঙ্গভূমির অঙ্গনেই তার প্রথম উদ্বোধন ঘটেছিল। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতের জাতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মহাসভা শাসন ব্যাপারে ভারতীয়দের নানা অধিকার সম্বন্ধে ব্রিটিশ রাজসরকারকে সচেতন করে দেওয়াই তাঁদের কর্তব্য মনে করতেন। বৎসরে বৎসরে এই মহাসভা তাঁদের দাবী উপস্থিত করতেন কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব ভারতীয়দের সে সকল দাবী মেনে চলার মত নমনীয় কোন দিনই ছিল না। শাসন ব্যাপারে নানা বিভাগে ভারতীয়দের প্রতি নানা অবিচার ঘটত, মহাসভা সেদিকে ভারত-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলে তারা কখনো কর্ণপাত করতেন কখনো বা নীরব থাকতেন। ভারতবর্ষের নর-নারী তখনও প্রসুপ্ত, তখনো তাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে শুভ-শঙ্খনাদ ওঠেনি, পরাধীনতার কঠিন নিগড়ের সুতীব্র বেদনা তখনও তারা অনুভব করতে পারেনি।

কিন্তু একদিন এক অগ্ন্যুৎপাত ঘটলো। তখন লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট। তাঁর খেয়াল হ'লো বঙ্গদেশকে দু'ভাগ ক'রে নেবেন। তাঁর খেয়াল কার্যে পরিণত ক'রতে বেগ পেতে হ'লো না। বঙ্গ দ্বিধা-বিভক্ত হ'লো। পূর্ববঙ্গের রাজধানী স্থাপিত হ'লো ঢাকা শহরে। কিন্তু দেশের লক্ষ-লক্ষ লোক এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ ক'রলে। তারা অকস্মাৎ আবিষ্কার ক'রলে যে বাংলাদেশের সমগ্রতা ও সংহতিকে খণ্ডিত ক'রে ইংরেজ সরকার জাতিকে দুর্বল ক'রে দেবার জন্যই এই পথ অবলম্বন ক'রছেন। বাঙালীজাতি তখন শিক্ষায় সংস্কৃতিতে স্বাধীন চিন্তায় ভারতের নেতৃত্ব ক'রছে। দিকে দিকে তারা প্রচার ক'রছে স্বাধীনতার বাণী, জাতীয়তার আদর্শ। বাংলার নর-নারীর একথা বুঝতে দেরী হ'লো না যে, ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পেরেছেন যে তাঁদের হাত থেকে ভারতের শাসনরজ্জু ছিনিয়ে নিতে এই বাঙালীজাতিই একদিন এগিয়ে আসবে তাদের সমগ্র শক্তি নিয়ে, তাই তাঁরা এই জাতির নব জাগরণের দুর্নিবার গতি ব্যাহত

করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বাঙালী ভাবলে যে এটা বড়লাটের খেয়াল নয়, ব্রিটিশ ভেদনীতির একটা প্রচণ্ড উদাহরণ।

তখন ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় মহাসভার সভাপতি। তিনি বঙ্গ-বিচ্ছেদের ভীষণ পরিণাম কল্পনা ক'রে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। তিনি তদানীন্তন ভারতসচিবের নিকট লর্ড কার্জনের এই যথেচ্ছাচারের প্রতিবাদ ক'রে 'তার' করলেন কিন্তু তিনি জানালেন যে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সুনির্ধারিত—এর আর প্রত্যাহারের কোন উপায় নেই। সমগ্র জাতির এই বিচ্ছেদ-বেদনায় সুরেন্দ্রনাথের আত্মা কেঁদে উঠল, তাঁর বীর হৃদয় ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে নিরুপদ্রব সংগ্রাম করবার জন্য প্রস্তুত হ'লো। তাঁর সেই বজ্রনির্ঘোষে সমগ্র জাতি জেগে উঠল। টাউন হলে মহারাজা ৺মণীন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় সকলে একবাক্যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ রীতি অবলম্বন করবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন যে তাঁরা বিদেশী বস্ত্র আর কিনবেন না, বিলাতী দ্রব্য ঘৃণার সঙ্গে বর্জন করবেন এবং ভাবলেন এর দ্বারা ইংলণ্ডের বণিক সম্প্রদায়ের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হ'লেই ব্রিটিশ সরকার বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের নীতি প্রত্যাহার ক'রতে বাধ্য হবেন।

বহু সভা এবং সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ দেশবাসীকে তাঁর বক্তব্য বুঝিয়ে দিলেন। দেশের আপামর জনসাধারণ বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রহিত ক'রতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হ'লো। বহুদিন ধরে তাদের প্রাণে যে অধিকারবোধ ধীরে ধীরে জেগে উঠছিল আজ তা' প্রজ্বলিত হুতাশনের মতো লেলিহান হয়ে উঠলো। তারা সমবেত হয়ে ঘোষণা ক'রলে যে মানুষ হিসেবে তাদের স্বজাতীয়ত্ব রক্ষা করার অধিকার তাদের আছে এবং বাংলাদেশকে দ্বি-খণ্ডিত ক'রলে তাদের জাতীয়তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে।

ব্রিটিশ সরকারের এ প্রস্তাবে শুধু সমগ্র বাঙালী জাতিই অপমানিত বোধ ক'রলে না, বঙ্গজননীর এই বিচ্ছেদ-বেদনা

দেখতে দেখতে সারা ভারতবর্ষে অনুভূত হ'লো। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ সকলেই বাংলাদেশের এই দুর্দিনে সাড়া দিলে। লালা লাজপতরায়, মদনমোহন মালব্য, ওয়াচা, গোখেল প্রভৃতি ভারতবর্ষের কৃতী মনীষী সন্তানগণ সকলে সমস্বরে বাংলার দাবীকে সমর্থন করলেন, বাঙালীর জাত্যভিমান অক্ষুণ্ণ রাখতে ছুটে এলেন। এমনি ক'রে সারা ভারতব্যাপী এক তুমুল জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হ'লো। বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা ক'রতে গিয়ে ব্রিটিশ শাসকবর্গ নিদ্রিত একটা মহাজাতিকে অকস্মাৎ জাগিয়ে তুললেন, ভারতবর্ষের সংহত শক্তিকে পঙ্গু ক'রতে গিয়ে তাঁরা সাতশ' বছরের পরাধীন জাতির ঐক্য বন্ধন আরও দৃঢ় ক'রে দিলেন। আসিন্ধু হিমাচল ভারতবাসী তন্দ্রালস ত্যাগ ক'রে তাদের জাতীয়তা রক্ষা ক'রতে সৈনিকের মত এসে দাঁড়াল। তারা বীর, একথা সেদিন অকস্মাৎ তাদের দেহের অণুতে পরমাণুতে তারা অনুভব করল। ভারতবর্ষের প্রতি প্রান্তরে, পর্বতের শিখরে, অরণ্যের অন্তরে, সমুদ্রের কল্লোলে প্রতিধ্বনিত হ'ল জাতির সেই মহামন্ত্র, "বন্দে মাতরম্"।

বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন এমনিই সাফল্যলাভ ক'রলো যে সারা ভারতবর্ষে কাপড়ের কল স্থাপিত হ'লো। সকলে একসঙ্গে বিদেশী বস্ত্র পরিত্যাগ ক'রলে। কাজেই বাংলায়, বোম্বাই-এ এবং আমেদাবাদে কাপড়ের কল স্থাপিত হ'লো। আজ সমগ্র দেশব্যাপী দেশীয় সামগ্রীর প্রতি যে সমহানুভূতি এবং সমর্থনের দ্বারা আমরা স্বরাজলাভের যোগ্যতা অর্জন করেছি এই বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই জাতির আর্থিক দুর্গতি দূর করার উপায় প্রথম উদ্ভাবিত হ'লো। দেশ যদি নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন করে তা' হ'লে প্রতি বছরে যে কোটি কোটি টাকা বিদেশীর হাতে তুলে দিতে হয় সে টাকা দেশেরই জনসাধারণের কাছে ফিরে যাবে একথা সেদিন সকলেই অনুধাবন ক'রলে। দেশের শিল্প এবং বাণিজ্য যাতে দেশের প্রাণরস যোগাতে পারে তারই প্রচেষ্টায় সমগ্র দেশবাসীকে নিয়োজিত

করাই হ'লো সেদিনকার নেতৃবর্গের প্রথম কাজ। বাংলাদেশে ৺কৃষ্ণকুমার মিত্র, ৺বিপিনচন্দ্র পাল, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি দেশবরেণ্য নেতাগণ বাঙালীর দ্বারে দ্বারে স্বদেশীর মন্ত্র প্রচার ক'রে এই সুমহান্ প্রচেষ্টাকেই অচিন্তিত-পূর্ব সাফল্যে ভূষিত ক'রে গিয়েছেন। দেশের শিক্ষিত সমাজ তাঁদের সংস্কৃতি ও জাতীয়তাকে রক্ষা ক'রতে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন আর যারা অশিক্ষিত, যারা দিন-দরিদ্র, তাদের কানে স্বদেশীর মহামন্ত্র শোনালেন—তারা পেলে তাদের দুর্গতি থেকে মুক্তি পাবার মহামন্ত্র। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এইজন্যই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বিরোধিতার আন্দোলন একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা।

কিন্তু শুধু আর্থিক অসহযোগের মধ্যেই এ আন্দোলন সীমাবদ্ধ হ'লো না, নৈতিক অসহযোগের জন্যও দেশ প্রস্তুত হ'লো। দলে দলে ছেলেরা গবর্নমেণ্টের স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে এলো। বিদেশী শাসকদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ ক'রলে দেশাত্মবোধ দূরীভূত হয়ে দাস-মনোভাব জাগ্রত হবে এই আশঙ্কায় দেশের যুবা-সম্প্রদায় বিদেশী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্জন ক'রলে। বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য-শক্তিতে খর্ব করবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তারা বেরিয়ে প'ড়লো বাংলাদেশের সম্মান রক্ষা ক'রতে। এই সব ছেলেদের জাতীয়ভাবে শিক্ষা দিয়ে, যাতে এরা স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন ক'রতে পারে তারই চেষ্টায় দেশের নেতৃবৃন্দ জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ক'রলেন। তাঁরা দেখলেন শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে এসব ছেলেদের প্রাণে যদি স্বাধীনতার প্রেরণা সঞ্চারিত করা যায় তবেই জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরেরা দেশের মুক্তিসাধনে ব্রতী হ'তে সক্ষম হবে। বিদেশী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষালাভ ক'রলে বিদেশী দপ্তরখানার দাসত্বই যেন তাদের একমাত্র কাম্য হয়ে ওঠে, সে শিক্ষার দ্বারা ছাত্রদের চিত্তে স্বাধীন বৃত্তির প্রতি অনুরাগ জন্মায় না, একথা দেশের মনীষীরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন।

তাঁরা একটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত করলেন। মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, রাজা সুবোধ মল্লিক এবং মুক্তাগাছার জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, এঁরা প্রত্যেকে শিক্ষা পরিষৎকে একলক্ষ টাকা দান করলেন। এই পরিষদের কার্য নির্বাহক হলেন স্যর রাসবিহারী ঘোষ, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং স্যর আশুতোষ চৌধুরী।

জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠিত হ'লো। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হ'লো। পরাধীনতার পাষাণ ভারে সর্বপ্রকার জাতীয়ত্ব বিসর্জন দিয়ে এবং স্বজাতি ও স্বদেশের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা বিলুপ্ত হয়ে বিদেশীর অনুকরণ এবং অনুসরণের কুৎসিত মনোভাবই দেশের জনসাধারণের হৃদয় অধিকার করেছিল। তাই সহসা যেদিন দেশের বরেণ্যতম বিদ্বজ্জনমণ্ডলী সমগ্র জাতিকে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নবজাগ্রত ভারতবর্ষের বাণী শোনাবার ভার গ্রহণ করলেন, সেদিন নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনেতিহাসের একটি নূতন অধ্যায়ের মাঙ্গলিক বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো গঠিত হ'লো কিন্তু অধ্যক্ষতা করবার মতো যোগ্য ব্যক্তি কোথায়? কে এমন নিঃস্বার্থ সুপণ্ডিত আছেন যিনি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামান্য পারিশ্রমিকে অধ্যক্ষতার সুমহৎ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন? তখনকার দিনে যাঁরা শিক্ষিত সমাজের অগ্রণী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই উগ্র বিলাতী ভাবাপন্ন ইঙ্গ-বঙ্গ। তাঁরা অনেকেই এই জাতীয় আন্দোলনকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। তাই জাতি-গঠনের ব্রত গ্রহণ করবার মত দেশ-হিতৈষী সুপণ্ডিত ব্যক্তি সেই শুভ-দিনেও দুর্লভ হ'লো।

কিন্তু একদিন বাংলাদেশের শুভ প্রভাতে সংবাদ পাওয়া গেল যে বরোদা কলেজের পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এই দুরূহ দায়িত্ব গ্রহণ ক'রতে প্রস্তুত হয়েছেন। বাংলাদেশের জনসাধারণ

বিস্মিত হয়ে দেখলে যে বরোদার পনেরোশ’ টাকা বেতনের মোহ অক্লেশে পরিত্যাগ ক’রে, সেখানকার রাজ-আতিথ্য ও রাজৈশ্বর্য হেলায় পিছনে ফেলে দিয়ে একটি চৌত্রিশ বৎসরের যুবক তাঁর মাতৃভূমির নবজাগরণের শুভ প্রভাতে যুক্ত হস্তে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর জ্ঞানের অভিমান নেই, সমৃদ্ধিতে আসক্তি নেই, যশের আকাঙ্ক্ষা নেই, আত্মত্যাগের বেদনা নেই। শ্রীঅরবিন্দের এই ত্যাগই বাংলাদেশের জাতীয় বেদীতে সর্বপ্রথম সুমহৎ আত্ম-নিবেদন।

বাংলায় আসিবার পূর্বেই জাতিকে স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার ও জাতীয় শিল্পসম্পদ সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য শ্রীঅরবিন্দ স্বদেশী আন্দোলন প্রবর্তন করেন। ইহার দুইটি দিক ছিল—এক ছিল রাজনীতিক; বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জাতীয় স্বাধীনতালাভের জন্য দৃঢ় পণ করা। আর এক ছিল—জাতীয় সংগঠনের জন্য দেশে শিল্পসম্পদ সৃষ্টি করা এবং স্বদেশজাত দ্রব্যের প্রসারের জন্য বিদেশী পণ্য বর্জন করা।

বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া সেই যুগে একটা অসম্ভব ব্যাপাব ছিল। সশস্ত্র বিপ্লবের সাফল্যের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই আমলাতন্ত্রের সহিত সাহসিকতা ভরে, কিন্তু বিচক্ষণতাপূর্বক সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হওয়াই ছিল একমাত্র উপায়। ইহাই হইল অরবিন্দের রাজনীতি। কিন্তু সংঘর্ষ সুরু করিবার পূর্বে চাই স্বাধীনতার আদর্শে অটল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই ত্যাগে ও দুঃখভোগে প্রেরণা দেয়; ইহার বলেই ধৈর্য রক্ষা করা যায়। এই জন্যই জাতীয় দলের নেতারূপে শ্রীঅরবিন্দ প্রথমেই স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিলেন।

সে যুগের কংগ্রেসী নেতারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ভিন্ন আর কোন রাজনীতিক আদর্শ কল্পনা করিতে পারিতেন না; তাঁহাদের সে সাহস ছিল না। অবশ্য জাতির পক্ষে পরাধীনতা ক্রমশঃ দুঃসহ হইয়া উঠিতেছিল এবং ধীরে ধীরে স্বরাজের আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে দাদাভাই নওরোজী এই আদর্শ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই 'স্বরাজের' অর্থ লইয়া বিশ বৎসর কি যে বাদবিতণ্ডা হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। এমন কি, কংগ্রেস ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত—যতক্ষণ না বৃটিশ গবর্নমেণ্ট জাতীয় দাবী

একেবারে উপেক্ষা করিলেন—কিছুতেই ঘোষণা করিতে রাজি হয় নাই যে স্বরাজের অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা।

বাংলায় আসিয়াই শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় দলের সম্মুখে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ স্থাপন করিলেন। অনেকেই বোধ হয় এই কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। ভারতবিখ্যাত নেতারা কখনো ভুলিয়াও শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিক কার্যের উল্লেখ করেন না, তবে সুভাষচন্দ্র কয়েক বৎসর পূর্বে বসিরহাটে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে স্মরণ করিয়াছিলেন যে জাতিকে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ সর্বপ্রথমে দিয়াছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। যাহা হউক, ইহা আজ কংগ্রেসেরও আদর্শ এবং জাতির দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছে যে স্বাধীনতালাভ অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু তখনকার দিনে এই আদর্শ লইয়াই সুরু হইল কংগ্রেসে বিরোধ, এবং এই বিরোধের পরিণতি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে জাতীয় দল ও মধ্যপন্থী দলের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ তাঁহার পুস্তকে ইহাকে জাতীয় কুরুক্ষেত্র বলিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ "গীতার ভূমিকা"য় বুঝাইয়াছেন যে ভারতকে সবল করিবার জন্য, নূতন আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রয়োজন হইয়াছিল। তেমনি বলা যায় সুরাটে এই রাজনীতিক কুরুক্ষেত্রের ফলেই কংগ্রেসের ভাবী রূপান্তরের সূচনা হইয়াছিল। তখন হইতেই ভারতে রাজনীতির গতি একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে, জাতি স্বাধীনতার আদর্শ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার প্রেরণা পাইয়াছে।

জাতীয় দল গঠনে শ্রীঅরবিন্দের প্রথম কার্য হইল একটি নির্ভীক জাতীয় সংবাদপত্র স্থাপন করা। জাতীয় কলেজের কার্য ত্যাগ করিয়া তিনি ইংরাজী দৈনিক "বন্দে মাতরম্"-এর সম্পাদকরূপে কার্য করিতেছিলেন। অচিরে তিনি জাতীয় দলকে এই সংবাদপত্র পরিচালনার ভার গ্রহণ করাইলেন। মহানুহৃদয় রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক তাঁহার এই কার্যে প্রধান সহায়ক হইলেন। সুবোধচন্দ্রের

টাকায় "বন্দে মাতরম্"-এর প্রেস হইল। স্বর্গীয় শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি জাতীয় দলের নেতাগণ এবং উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি তরুণ কর্মীদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় শ্রীঅরবিন্দ "বন্দে মাতরম্"কে জাতীয় জাগরণের ভেরী করিলেন। সমগ্র ভারতে "বন্দে মাতরম্"-এর লেখা কি উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা এখনও অনেকে স্মরণ করেন। ১৯০৭ হইতে ১৯০৮-এ গ্রেপ্তার হইবার পূর্বদিন পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের লেখনী "বন্দে মাতরম্"-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলি দিনের পর দিন পূর্ণ করিত। এই প্রকারে তিনি ভারতের ইংরাজী সংবাদপত্রের ইতিহাসেও এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিলেন। এতদিন নীরবে সাধনা করিয়া তিনি যে তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার পরিচয় তাঁহার লেখনীতে পাওয়া গেল। সেই তপঃশক্তির প্রভাবে জাতি প্রাণে নূতন আশা পাইল, হৃদয়ে নূতন বল অনুভব করিল, মাতৃভূমির সেবায় দুঃখকে বরণ করিতে শিখিল এবং সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রেরণা পাইল। এই মহৎ কর্ম করিবার জন্যই যেন শ্রীঅরবিন্দের বিলাতে শিক্ষা, সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ না-করা, এবং বরোদায় জ্ঞান-তপস্যা।

বাংলার সংবাদপত্রগুলিই জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল সত্য, কিন্তু "বন্দে মাতরম্"-এর মত নির্ভীকভাবে ওজস্বিনী ভাষায় জাতীয়তার বাণী প্রচার কেহই করে নাই। অচিরেই "বন্দে মাতরম্"-এব ভারতব্যাপী প্রচার হইল এবং ইহা হইল নবীন ভারতের মুখপত্র। ভারতে যাঁহারা জাতীয় জাগরণে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটি সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা—যেমন, মহাত্মা শিশিরকুমারের "অমৃত বাজার পত্রিকা", সুরেন্দ্রনাথের "বেঙ্গলী", লোকমান্য তিলকের "কেশরী" ও "মারাঠা", স্যর ফেরোজ শাহ মেহ্‌টার "বম্বে ক্রনিক্‌ল্", এনি বেসান্তের "নিউ ইণ্ডিয়া", মহাত্মা গান্ধীর "ইয়ং ইণ্ডিয়া", শ্যামসুন্দরের "সার্ভেন্ট", দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের "ফরোয়ার্ড" প্রভৃতি, তেমনি শ্রীঅরবিন্দ ভারতের জাতীয়তা

প্রচারের জন্য "বন্দে মাতরম্", পরে "কর্মযোগিন্" ও "ধর্ম", এবং অবশেষে দিব্য-আদর্শ প্রচারের জন্য পণ্ডিচারী হইতে "আর্য" পরিচালনা করিয়াছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ অনুসারে "বন্দে মাতরম্"-এর প্রধান কার্য হইল কংগ্রেসের আবেদন-নীতির ব্যর্থতা প্রতিপন্ন করা এবং জাতিকে আত্মনির্ভরতা শিখান। এই কারণেই "বেঙ্গলী"র সহিত "বন্দে মাতরম্"-এর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনে অগ্রণী, স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি জাতীয় দলের স্বাধীনতার আদর্শ বরদাস্ত করিতে পারিতেন না এবং তখনকার দিনের অন্যান্য প্রসিদ্ধ নেতাদের ন্যায় নিবেদন-নীতি সমর্থন করিতেন। তাঁহারা ভারতীয় রাজনীতিতে পাশ্চাত্যের আদর্শ স্থাপিত করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশ্য শুধু রাজনীতিক সংগ্রাম ছিল না, তিনি চাহিয়াছিলেন সর্ব-বিষয়ে ভারতের বিশেষত্ব ফুটাইতে। সর্বোপরি তিনি দেশাত্মবোধের জাগরণেও ভগবত প্রেরণা অনুভব করিতেন, দেশকে জগন্মাতার মূর্ত রূপ বলিয়া মনে করিতেন, ভগবত সত্তার উপলব্ধিই চরম ব্যক্তিগত আদর্শ বলিয়া প্রচার করিতেন। "বেঙ্গলী" বলিত রাজনীতিক্ষেত্রে এ সকল জিনিস অবান্তর, কাজেই শ্রীঅরবিন্দের ভগবদ্দর্শন প্রভৃতি লইয়া "বেঙ্গলী" ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত। শ্রীঅরবিন্দ "ধর্ম" ও "কর্মযোগিন্"-এর স্তম্ভে তাহার উপযুক্ত জবাব দিতেন।

সত্য কথা বলিতে গেলে, "বেঙ্গলী" বা তখনকার দিনের মধ্যপন্থী নেতারা শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ বুঝিতেই চাহিতেন না।* তিনি চাহিয়াছিলেন গোটা জাতিকে জাগাইতে—তাঁহার ক্ষুদ্র রাজনীতিক

* সুরেন্দ্রনাথ বোধহয় শ্রীঅরবিন্দের উপর বিশেষ বিরূপ ছিলেন, কারণ তাঁহার "আত্মজীবনী"তে ('A Nation in Making') তিনি বহু লোকের নাম করিয়াছেন, কিন্তু একবারও শ্রীঅরবিন্দের নাম করেন নাই।

লাভালাভের দিকে লক্ষ্য ছিল না। তিনি জাতির জাগরণে শ্রীভগবানের অমোঘ নির্দেশ দেখিয়াছিলেন, এবং প্রকাশ্যভাবে বলিতেন ও লিখিতেন যে শ্রীভগবানই আন্দোলনের নেতা। তিনি অকুণ্ঠ কণ্ঠে স্বাধীনতার আদর্শ ঘোষণা করিতেন, কারণ তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল, আজই হউক বা কালই হউক ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবে। সুতরাং তিনি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বা অন্য কোন রাজনীতিক সুবিধাবাদের দ্বারা, সামরিক লাভের আশায়, জাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ম্লান করিতে একেবারেই রাজি ছিলেন না। অথচ তিনি কোন বেপরোয়া নীতি সমর্থন করেন নাই। তখনকার দিনে যাহা সম্ভবপর ছিল, তিনি জাতিকে সেই পন্থাই অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সর্বপ্রথমে তিনি জাতিকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল হইয়া নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান হইতে প্রেরণা দিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন পাশ্চাত্যের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া জাতি স্বশক্তি বিকাশ করিবে, যাহাতে জাতীয় আদর্শে ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির স্বাভাবিক বিবর্তন হইবে। সর্বোপরি তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে জাতীয়তার বিকাশ ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিকতার বিকাশ, যাহার জন্য জগতের মধ্যে ভারত যুগে যুগে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে—সেই সনাতন ধর্মের বিকাশ যাহা বারংবার রাজনীতিক ঝঞ্ঝার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতাকে অবিকৃত রাখিয়াছে, তাহার সত্তাকে রক্ষা করিয়াছে। ইহা যে কবির কল্পনা নহে, স্থূল বিকাশের পশ্চাতে অভ্রান্ত সূক্ষ্মশক্তি কার্য করিতেছে, সেই শক্তিকে আশ্রয় করিলে ব্যক্তি ও জাতি চরম ধ্বংস হইতে রক্ষা পায়—ইহাই ছিল শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধগুলির মূল সুর।

পরাভূত, নিপীড়িত, মূর্ছিত ভারতের নিকট তখনকার দিনে এ এক অভিনব বাণী। স্বরাজ্যের এই ঐশী মন্ত্রে নিদ্রিত ভারত জাগরিত হইল। সমগ্র জাতি প্রতি ধমনীতে শক্তির স্পন্দন অনুভব করিল। শ্রীঅরবিন্দ জাতিকে শুধু প্রেরণা দিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, স্বয়ং

জাতীয় দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের রূপান্তর সাধনের জন্য তিনি মধ্যপন্থী দলের সহিত সংঘর্ষেও কুণ্ঠিত হইলেন না। ইহাতে শুধু আদর্শবাদী হিসাবে নয়, তাঁহার রাজনীতিক কুশলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। প্রথমে তিনি বাংলার জাতীয় দলকে পরোক্ষে চাল চালিবার নীতিত্যাগ করিয়া আন্দোলনের পুরোভাগে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুপ্রাণিত করিলেন—যাহাতে অকুণ্ঠ কণ্ঠে স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করা যায় এবং দেশের সম্মুখে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ স্থাপিত হয়। তারপর তিনি জাতীয় দলকে প্রাদেশিক গণ্ডীর বাহিরে সমগ্র ভারতে ব্যাপকভাবে দলবিস্তার ও কার্য করিতে মন্ত্রণা দিলেন। তাঁহার এই নীতির ফলে প্রায় প্রতি প্রদেশেই জাতীয় দল গঠিত হইল এবং লোকমান্য তিলক ও শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে ক্রমশঃই তাঁহাদের দলের শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল এই প্রকারে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ লইয়া যে আন্দোলনের সুরু হইযাছিল, তাহা নিখিল ভারতব্যাপী স্বরাজ-আন্দোলনে বিস্তৃতি লাভ করিল।

কিন্তু অতীব প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া জাতীয় দলকে অগ্রসর হইতে হইল। একদিকে সরকারের চণ্ডনীতি, অপরদিকে মধ্যপন্থী দলের প্রতিকূলতা। সরকার জাতীয় দলকে উগ্রপন্থী আখ্যা দিয়া উহাকে দমন করিতে সচেষ্ট হইলেন, এবং মধ্যপন্থী দলকে ঝুটা শাসন সংস্কারের প্রয়োজন দেখাইয়া তোয়াজ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাকেই প্রচলিত কথায়, "লাথি ও চুমা"র নীতি বলে।

সরকারের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে জাতীয় দলের প্রথম কার্য হইল কংগ্রেসে মধ্যপন্থী দলের প্রভাব বিনষ্ট করা। তখনকার দিনে কংগ্রেস ব্যাপক প্রতিষ্ঠান ছিল না, প্রতিনিধি-নির্বাচনের কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না। কাজেই জাতিকে সংগঠন করিবার একমাত্র উপায় ছিল লেখা ও বক্তৃতা। শ্রীঅরবিন্দ ও লোকমান্য তিলক এবং জাতীয় দলের অপরাপর নেতৃবৃন্দ সেই উপায়ে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত

করিতে লাগিলেন এবং তাহারা ঐকান্তিকতার সহিত জাতীয় দলের আদর্শ গ্রহণ করিল। প্রায় সমগ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় জাতীয়পক্ষ অবলম্বন করিল। সাধারণ লোকের তখনকার দিনে রাজনীতিব সহিত বিশেষ সংস্রব ছিল না এবং তখনকার মত তাহারা দলে দলে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানে যোগদাম করিত না; কিন্তু তাহারা যে এই আন্দোলনে পূর্ণভাবে সাড়া দিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই জাতিধর্মনির্বিশেষে ভারতবাসী শ্রীঅববিন্দ ও লোকমান্য তিলককে ভারতের মুক্তিপ্রবাহের আবাহনকারী ভগীরথ-যুগল বলিয়া মনে কবিল।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট কংগ্রেসের পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় দলের প্রচারকার্যের জন্য বাহিরে যাইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ যে চারি বৎসর তিনি প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে ছিলেন তাহার মধ্যে খুব বেশী বক্তৃতা দেন নাই। বাগ্মিতায় জনসাধারণের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না, তিনি তাহাদের বিচারশক্তি ও চিন্তাশক্তি জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেন। এই জন্যই যখন তাঁহার বক্তৃতাগুলি ছাপা হইত তখন তাহা হইতে পাঠক অপূর্ব প্রেরণা পাইত। বলা যায় যে সত্যই তাঁহার লেখনী তরবারি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। সেই সময়ে ভারতের ভাবরাজ্যে যে বিপ্লব ঘটিয়াছিল, জাতীয়তাব যে প্লাবন বহিয়াছিল তাহার উৎস ছিল শ্রীঅরবিন্দের লেখনী ও বাণী।

কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন শুধু লেখনী পরিচালনায় ও বাণী প্রচারে কার্যসিদ্ধি হইবে না—নেতা হিসাবে তাঁহাকে জনসাধারণের সহিত মিশিতে হইবে, স্বয়ং কর্ম করিয়া কর্মীদের প্রেরণা দিতে হইবে, আদর্শ কর্মীর পরিচয় প্রদান করিতে হইবে, কর্মযোগ কাহাকে বলে নিজে কাজ করিয়া দেখাইতে হইবে। এই জন্যই তিনি জাতীয় দলের নীতি পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। যদি তিনি তাহা না করিতেন তাহা হইলে আদর্শবাদী হিসাবে যশোলাভ করিতেন বটে, কিন্তু

ভারত তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইত না। প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিতে যোগদান না করিলে হয়ত তাঁহাকে প্রচণ্ড রাজরোষ ভোগ করিতেও হইত না। তাঁহাকে বোমার ষড়যন্ত্রের নেতারূপে প্রতিপন্ন করিয়া তদানীন্তন গবর্নমেন্টের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় দলের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দেওয়া; কিন্তু আদালতের সুবিচারে সে প্রয়াস ব্যর্থ হইল। তবে বেশ বুঝা যায় যে, শ্রীঅরবিন্দ সাধনার জন্য বাংলা হইতে চলিয়া না গেলে, তাঁহাকে হয়ত লোকমান্য তিলকের মত দীর্ঘকাল কারাগারে বা নির্বাসনে কাটাইতে হইত।

যাহা হউক, শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে বাংলার জাতীয় দলকে শক্তিমান করিরার ফলে অচিরেই সুবিধাবাদী ও ধীরপন্থী নেতৃবর্গের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। প্রথম সংঘর্ষ হইল মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে। মেদিনীপুর জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র ছিল, কাজেই ওখানে সংঘর্ষ অনিবার্য হইল। সম্মেলনে মধ্যপন্থী দলের আসল রূপ প্রকট হইল, কিন্তু সংখ্যাধিক্য থাকিলেও জাতীয় দল একটা বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি না করিয়া, শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে পৃথক সম্মেলন করিল। ইহাতে মূল সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। অপরপক্ষে জাতীয় দল দৃঢ় সংকল্প করিল জাতিকে সর্ববিষয়ে আত্মনির্ভরশীল করিতে হইবে—শাসন সংস্কার বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইয়া লাভ নাই।

মেদিনীপুরে যে সংঘর্ষের সুরু, কয়েক মাস পরে তাহার পরিণতি দেখা গেল সুরাট কংগ্রেসে। এই কয়েক মাসের মধ্যেই জাতীয় দলের আদর্শ সমগ্র দেশে এরূপ উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল যে মধ্যপন্থী দল প্রমাদ গণিলেন। তাঁহাদের মুঠার ভিতর হইতে যে কংগ্রেস সরিয়া পড়ে, তাঁহাদের ইজ্জৎ তো থাকে না, দেশেরও সর্বনাশ হয়! কিন্তু এরূপ প্রবল বিপক্ষতা ও দারুণ রাজরোষেও শ্রীঅরবিন্দ কোনদিন বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। চিরকালই তিনি যে ধৈর্যের অবতার! জেল হইতে বাহির হইয়াও শ্রীঅরবিন্দ আদর্শ হইতে একটুও বিচ্যুত

হন নাই এবং রাজনীতিক জীবনের শেষ পর্যন্ত মধ্যপন্থী দলের সহিত লড়িয়াছেন। পরে হুগলীতে প্রাদেশিক সম্মেলনে, বলিতে গেলে তিনি একাই, মধ্যপন্থী ব্যূহ ভঙ্গ করিয়াছেন। বাংলায় মধ্যপন্থী দল বিপক্ষতা করিলেও, সমগ্র জাতি ছিল তাঁহার পক্ষে।

সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্বেই বুঝা গেল যে বাংলার ন্যায় মহারাষ্ট্রও সম্পূর্ণভাবে জাতীয়বাদী। বাংলায় শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্য নেতৃবর্গ এবং মহারাষ্ট্রে লোকমান্য তিলক ও তাঁহার সহকর্মিগণ জাতীয়তার তূর্যনিনাদে সমগ্র দেশ মুখরিত করিয়া তুলিলেন। মধ্যপন্থী দল প্রমাদ গণিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দেব কংগ্রেস নাগপুরে হইবার কথা, কিন্তু কংগ্রেসের কর্তাগণ বুঝিলেন ঐ স্থানে রাজনীতিক উত্তাপ খুব বেশী—মারাঠাগণ জাতীয় উদ্দীপনায় ভরপুর। কাজেই নিরাপদ হইবার জন্য তাঁহারা সুদূর সুরাট নগরীতে অধিবেশনের ব্যবস্থা করিলেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে তখন মধ্যপন্থী নেতা স্যর ফেরোজশা মেহ্তার পূর্ণ আধিপত্য। মধ্যপন্থী দল ভাবিলেন সুরাটে জাতীয় দল পাত্তা পাইবে না। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল জাতীয় দলের নেতৃবৃন্দ দলবল লইয়া ওখানেও ধাওয়া করিয়াছেন।

আসন্ন রাজনীতিক কুরুক্ষেত্রের আশঙ্কায় কংগ্রেসের অধিবেশন সুরু হইল। তখনকার দিনে প্রাদেশিক সমিতিগুলি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করিত না; আগে কর্তারা ঠিক করিতেন কোন্ নেতা সভাপতি হইবেন, এবং কংগ্রেসের অধিবেশনেই তিনি মনোনীত হইতেন। মধ্যপন্থী দলের পক্ষে সুরেন্দ্রনাথ স্যার রাসবিহারী ঘোষের নাম প্রস্তাব করিলেন; জাতীয় দলের পক্ষ হইতে লোকমান্য তিলকের নাম প্রস্তাব করা হইল। ইহার ফলে তুমুল বাদবিতণ্ডা সুরু হইল এবং অচিরেই দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হইল। জুতা চেয়ার প্রভৃতি চারিদিকে ছুটিতে লাগিল, দুই একজন নেতা আঘাত পাইলেন, নেতাদিগের মঞ্চের দিকে জনতা ধাওয়া করিল। সুরেন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে তাঁহার "আত্মজীবনী"তে ("A Nation in Making") লিখিয়াছেন:

"কংগ্রেসের পূর্ব-প্রেসিডেণ্ট হিসাবে আমার কাজ ছিল স্যর রাসবিহারী ঘোষের নাম প্রস্তাব করা। পূর্বেও আমি কংগ্রেসের সম্মতি লইয়া এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছি। কিন্তু এবার সেরূপ হইবার নয়। মেদিনীপুর সম্মেলনের ঘটনাবলী (সেখানে আমিই গণ্ডগোল থামাইয়াছিলাম) মনে পড়িল, এবং আমার বক্তৃতায় বার বার বাধা দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। আমার পক্ষে এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা, কারণ আমি কংগ্রেসের মঞ্চে উঠিলেই প্রাথমিক হর্ষধ্বনির পরেই পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিত।"

অতঃপর সুরাট দক্ষযজ্ঞের বিবরণ দিয়া সুরেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন : "জনতা মঞ্চের দিকে ধাবিত হইলেও আমি সেইখানেই রহিলাম। আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে আমাকে, স্যর ফেরোজশা মেহ্‌তাকে ও অপরাপর কয়েকজনকে তাঁহারা পিছনের তাঁবুতে লইয়া গেলেন এবং পুলিশ আসিয়া প্যাণ্ডেল হইতে সমস্ত লোকজন সরাইয়া দিল। এই প্রকারে কংগ্রেসের এক স্মরণীয় অধ্যায়ের অবসান হইল এবং এক নূতন অধ্যায়ের সুরু হইল।"

এই নূতন অধ্যায়েই আজ কংগ্রেস স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে এবং অধিকাংশ প্রদেশের শাসনভার পাইয়াছে। কংগ্রেসে আর সেকালের নিবেদন-নীতি নাই, এবং কংগ্রেসের যশ পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজ কংগ্রেস সত্যই সত্যই গণ-সম্মেলন। কিন্তু খুব কম লোকই আজ স্মরণ করেন যে, কংগ্রেসের এই রূপান্তরের সুরু হইয়াছিল শ্রীঅরবিন্দ ও লোকমান্য তিলকের কার্যের ফলে।

যাহা হউক, সুরাটের দক্ষযজ্ঞের দৃশ্যেও শ্রীঅরবিন্দ অচল অটল ছিলেন। বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন যে কংগ্রেসে যখন 'মার মার' রব উঠিয়াছে, চারিদিকে জুতা লাঠি চেয়ার প্রভৃতি শন শন করিয়া ছুটিতেছে, তখন শ্রীঅরবিন্দ প্রশান্ত বদনে বসিয়া আছেন, তাঁহার একটুও বিচলিত হইবার লক্ষণ নাই, আত্মরক্ষার জন্যও একটু ব্যস্ততা

নাই; অবশেষে পুলিশ প্যাণ্ডেলকে জনশূন্য করিলে তিনি কয়েকজন সহকর্মীর সহিত বাহিরে আসিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যে কংগ্রেসের এই আত্মকলহে জাতির অমঙ্গল সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী কয়েক বৎসরের ঘটনাপরম্পরায় প্রমাণিত হইয়াছে যে ইহার ফলে জাতীয় আন্দোলন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুরাটের পরে কয়েক বৎসর কংগ্রেস স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছিল, কারণ দমন-নীতির ফলে জাতীয় দল ছত্রভঙ্গ হইয়াছিল। কিন্তু অচিরেই তিলকের নির্বাসন হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বরাজ আন্দোলন সুরু হইল এবং তাহার সহিত এনি বেসান্তের নেতৃত্বে 'হোমরুল' আন্দোলন দেশকে সরগরম করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার পরই মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব এবং অসহযোগ আন্দোলন হইতে স্বাধীনতা আন্দোলন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেস মধ্যপন্থী দলের হাতেই ছিল, কিন্তু ঐ বৎসর লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সাময়িক-ভাবে দলাদলির অবসান হইয়া যুক্ত-কংগ্রেস হইল। দলাদলির চরম অবস্থায়ও "ধর্মে" এক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে পূর্বেই শ্রীঅরবিন্দ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন—এমনিই ছিল তাঁহার রাজনীতিক দূরদৃষ্টি। যাহা হউক, রাজনীতিক উত্তাপের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া মধ্যপন্থী দল আর বেশী দিন কংগ্রেসে থাকিতে পারেন নাই। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেস উপলক্ষেই দলাদলি সুরু হয় এবং পর বৎসরই মধ্যপন্থী দল কংগ্রেসের সংস্রব বর্জন করিয়া দলের ভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কিন্তু তখন হইতেই মধ্যপন্থী দলের প্রভাব বিলুপ্ত হইতে সুরু করিয়াছে এবং এখন 'একে একে নিভিছে দেউটি' হইয়া মুষ্টিমেয় নেতা কোনরূপে দলের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছেন।

সুরাট হইতে ফিরিয়া শ্রীঅরবিন্দ উৎসাহের সহিত জাতীয় দলের প্রচারকার্য সুরু করেন। তিনি বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের কয়েক স্থানে জাতীয় দলের আদর্শ সম্বন্ধে কয়েকটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন এবং বুঝাইয়া দেন কংগ্রেসে দলাদলি অনিবার্য হইল কেন। গ্রেপ্তার:

হইবার মাসখানেক পূর্বে, ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল, কলিকাতায় যুক্ত-কংগ্রেস সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে ভগবানের ইচ্ছায়ই সুরাট কংগ্রেস ভঙ্গ হইয়াছে এবং যদি কংগ্রেস পুনর্বার যুক্ত হয় তাহা হইলে তাঁহারই ইচ্ছায় হইবে। তিনি বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন যে কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারের জন্য কংগ্রেস ভঙ্গ হয় নাই, কতকগুলি সুস্পষ্ট সমস্যার জন্যই দলাদলি প্রকট হইয়াছে। প্রথম, সভাপতি নির্বাচনে অনিয়ম ; দ্বিতীয়, পূর্ব বৎসর (১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে) কলিকাতায় যে চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল দল বিশেষের তাহা নাকচ করিবার চেষ্টা ; তৃতীয়, স্থানীয় (সুরাটের) দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে শক্তিমান (জাতীয়) দলকে দাবাইয়া কংগ্রেসের মূল আদর্শ পরিবর্তন করিবার চেষ্টা। এই অবস্থায় সংঘর্ষ ছাড়া উপায় ছিল না এবং তিলক প্রস্তাব করেন যে, কংগ্রেসকে নিয়মানুযায়ীভাবে গড়িবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হউক এবং এই কমিটিই সেই অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত করিবে। অপর পক্ষ, অর্থাৎ মধ্যপন্থী দল, তিলককে ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার সুযোগ না দিয়া সহসা ঘোষণা করিলেন যে সর্বসম্মতিক্রমে স্যর রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। ঐ বিষয়ে যখন সুস্পষ্ট মতভেদ ছিল, তখন কি করিয়া বলা চলে যে, সভাপতি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইলেন ?

অতঃপর শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে জাতীয় দল এ সকল অনিয়ম উপেক্ষা করিতেও প্রস্তুত আছেন, যদি অপর দল কলিকাতা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি বজায় রাখিবার অঙ্গীকারে যুক্ত-কংগ্রেসে রাজি হন। যদি তাঁহারা রাজি না হন, তাহা হইলে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া দলগত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিবার দায়িত্ব তাঁহাদেরই। "আমাদের নীতি এই যে আমরা ভিন্ন দল হিসাবে আমাদের প্রতিষ্ঠানেই কার্য করিব, কিন্তু আমরা চাই সমগ্র জাতির যুক্ত-কংগ্রেস।"

আজও মধ্যপন্থী দল এই আদর্শগত বিভিন্নতা মানিয়া চলিয়াছেন।

যদিও উত্তরোত্তর তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইতেছে এবং সমগ্র জাতি পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ লইয়া দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতেছে, তথাপি আজও মুষ্টিমেয় মধ্যপন্থী দল বৃটিশ সাম্রাজ্য আঁকড়াইয়া থাকিতে বদ্ধপরিকর। বৃটিশ সাম্রাজ্যেরই আমূল পরিবর্তন হইয়াছে; সুরেন্দ্রনাথ, ফিরোজশা মেহ্‌তার দিনের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন আর নাই—আজ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিই স্বাধীন; এমন কি বৃটিশ উপনিবেশ-সচিব ম্যাল্‌কম্‌ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের ধারণা যে তাঁহারই জীবনকালের মধ্যে সাম্রাজ্য একেবারে বিচ্ছিন্ন হইবে—তবু ভারতের মুষ্টিমেয় মধ্যপন্থী দলের নেতাদেয় আকুতি যে ভারত বৃটিশ সম্রাজ্য-সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহাদের দলের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি প্রকাশনারায়ণ সাপ্রু (স্যর তেজ বাহাদুরের পুত্র) এই আদর্শের কথাই বলিয়াছেন।

সুরাট কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণোদ্যমে রাজনীতি-ক্ষেত্রে কার্য করিতে আরম্ভ করিলেন। নানাস্থলে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দ্বারা তিনি জাতীয় দলের আদর্শ প্রচারে ব্রতী হইলেন। ভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তাহাতে মাতব্বরি করিবার প্রচেষ্টা করা তখনকার জাতীয় নেতাদের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র জাতিকে মহান্‌ আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করা। তাঁহারা প্রকৃত নেতা ছিলেন, কাজেই নিছক নেতাগিরিতে বা প্রতিষ্ঠানের ঢক্কা-নিনাদ করায় তাঁহাদের ঝোঁক ছিল না।

কিন্তু এদিকে তাঁহাদের ভাগ্যাকাশে অলক্ষ্যে রাজরোষের কৃষ্ণ মেঘ ঘনভূত হইতে লাগিল। দেশের কার্যের জন্য ইতঃপূর্বেই তাঁহাদের মধ্যে অনেকে রাজরোষের প্রকোপে পড়িয়াছিলেন। রাজদ্রোহের অপরাধে লোকমান্য তিলকের ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সপ্তম এডোয়ার্ডের সিংহাসন-আরোহণ উপলক্ষে মুক্তিলাভ করেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার

কাগজ "কেশরী"তে বোমা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য আবার তাঁহার দ্বীপান্তর দণ্ড হয় এবং ছয় বৎসর কাল তিনি মান্দালয়ের কারাগারে যাপন করেন।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে "বন্দে মাতরম্"-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের জন্য শ্রীঅরবিন্দ রাজদ্রোহের অপরাধে ধৃত হন, কিন্তু সরকারপক্ষ প্রমাণ করিতে পারিলেন না যে তিনিই সম্পাদক। 'এক ঢিলে দুই পাখি মারিবার' উদ্দেশ্যে সরকারপক্ষ হইতে সুপ্রসিদ্ধ নেতা বিপিনচন্দ্র পালকে সাক্ষ্য দিতে আদেশ করা হয়। বিপিনবাবু সাক্ষ্য দিলে শ্রীঅরবিন্দের দণ্ড, আর সাক্ষ্য না দিলে নিজের দণ্ড। বিপিনবাবু সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিলেন, ফলে তাঁহার ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইল। সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাকর অপূর্বকৃষ্ণ বসুর ছয় মাস কঠোর কারাদণ্ড হইল এবং অম্লানবদনে তিনি তাহা ভোগ করিলেন।* তখনকার দিনের নিয়মে মুদ্রাকরের নামে কাগজ ছাপা হইত, কিন্তু সম্পাদকের নাম গোপন থাকিত

শ্রীঅরবিন্দের এই মামলায় দেশময় সাড়া পড়িয়া যায় এবং এই উপলক্ষেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" শীর্ষক সুবিদিত কবিতা দেশনেতার উদ্দেশ্যে লিখেন। কেহ তখন বোধহয় বুঝিতে পারেন নাই যে, কবির অভ্রান্ত দৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দের জীবন-সত্য পরিস্ফুট হইয়াছিল। কবি নিজেও বোধহয় অনুমান করিতে পারেন নাই যে কর্মী, ত্যাগী, দেশমাতার পূজারী অরবিন্দের সম্বন্ধে সেদিন তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, বিশ বৎসর পরে পণ্ডিচারীতে যোগী শ্রীঅরবিন্দকে দেখিয়া আবার তাহাই বলিবেন—"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!"

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের কারাদর্শন হইল না, কিন্তু এক

* অপূর্বকৃষ্ণ পরে বহু বৎসর "অমৃত বাজার পত্রিকা"র মুদ্রাকর ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইনি শ্রীঅরবিন্দকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন।

বৎসরের মধ্যেই তাঁহার কারাগারের ভীষণ-মধুর অভিজ্ঞতালাভ ঘটিল। ঘটনাটা এমনই আকস্মিকভাবে ঘটিল যে শ্রীঅরবিন্দ নিজেই অনুমান করিতে পারেন নাই যে এত শীঘ্র তাঁহার অবস্থা-বিপর্যয় ঘটিবে। এ সম্বন্ধে তিনি "কারাকাহিনী"তে লিখিয়াছেন :

"১৯০৮ সনের ১লা মে, শুক্রবার, আমি "বন্দে মাতরম্" অফিসে বসিয়াছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী আমার হাতে মজঃফরপুরের একটি টেলিগ্রাম দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম মজঃফরপুরে বোমা ফাটিয়াছে, দুইটি ইউরোপীয়ান স্ত্রীলোক হত। সেদিন "এম্পায়ার" কাগজে আরও পড়িলাম, পুলিশ কমিশনার বলিয়াছেন, আমরা জানি কে কে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এবং তাহারা শীঘ্র গ্রেপ্তার হইবে। জানিতাম না তখন যে আমি এই সন্দেহের মুখ্য লক্ষ্যস্থল, আমিই পুলিশের বিবেচনায় প্রধান হত্যাকারী, রাষ্ট্রবিপ্লব-প্রয়াসী যুবকদলের মন্ত্রদাতা ও গুপ্ত-নেতা। জানিতাম না যে এই দিনই আমার জীবনের একটা অঙ্কের শেষ পাতা, আমার সম্মুখে এক বৎসর কারাবাস, এই সময়ের জন্য মানুষের জীবনের সঙ্গে যত বন্ধন ছিল সবই ছিন্ন হইবে, এক বৎসরকাল মানবসমাজের বাহিরে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত থাকিতে হইবে। আবার যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিব, তথায় সেই পুরাতন পরিচিত অরবিন্দ ঘোষ প্রবেশ করিবে না, কিন্তু একটি নূতন মানুষ, নূতন চরিত্র, নূতন বুদ্ধি, নূতন প্রাণ, নূতন মন লইয়া, নূতন কর্মভার গ্রহণ করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রম হইতে বাহির হইব।"

রাজনীতিক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দকে নানা শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে যুবক সম্প্রদায়ই প্রধান। বস্তুতঃ শ্রীঅরবিন্দ তাহাদেরই নেতা ছিলেন। আধুনিক যুগে প্রায় সকল দেশেই জাতীয় অভ্যুত্থানে তরুণগণই পুরোভাগে থাকে, কারণ তাহাদের পিছনের টান নাই, অতীতের সংস্কার নাই, ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতায় তাহাদের হৃদয় উদ্ভাসিত। তাহাদের মত অন্য কোন সম্প্রদায়ই

উচ্ছল প্রাণস্পর্শে জাগিতে পারে না ; এই কারণেই তাহাদের ত্যাগের ক্ষমতা অপরিমেয়। তাহারাই অম্লানবদনে দুঃখকে বরণ করিতে পারে, সহাস্যবদনে জীবনের সকল সম্পদ বিসর্জন করিতে পারে।

কিন্তু উচ্ছল প্রাণশক্তিই কর্মে সাফল্য দেয় না, স্থির বুদ্ধির সহায়তা না থাকিলে প্রাণ-প্রবাহের অপচয় ঘটিতে পারে, কর্মশক্তি বিপথে নিয়োজিত হইতে পারে। জাতীয় আন্দোলনে বাংলার যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে এক শ্রেণীর ধারণা হইল যে সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা দেশের স্বাধীনতালাভ সহজসাধ্য হইবে—অন্ততঃ শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া অচিরেই জাতীয় দাবী আদায় করা যাইবে। তাহাদের এই উৎকট পন্থা গ্রহণ করার আর একটি কারণ এই যে তখনকার দিনে শাসক সম্প্রদায় বিবেচনাশূন্য হইয়া দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, এবং ভারতীয়দের শ্বেতাঙ্গদিগের নিকট শুধু উপেক্ষা নহে অনেক লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিতেও হইত, এবং অনেক স্থলে বিচারালয়েও তাহার কোন প্রতিকার পাওয়া যাইত না।

এইরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন অনেকেই ছিলেন জাতীয় দলের শ্রেষ্ঠ কর্মী, কাজেই শ্রীঅরবিন্দের সহযোগী। বিশেষতঃ তাঁহাদের নেতা বারীন্দ্রকুমার শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর এবং অন্যতম নেতা, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুধু "যুগান্তরে"র পরিচালক নহে "বন্দে মাতরম্"-এও শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মী ছিলেন। কাজেই পুলিশের স্বতঃই সন্দেহ হইয়াছিল যে রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় দলের প্রকাশ্য নেতা, তেমনি তিনি বিপ্লববাদী দলেরও গুপ্ত-নেতা। বিচারকালে সরকারী কৌঁসিলী নর্টন সাহেব আগাগোড়া এই যুক্তি দ্বারাই শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের হাস্যোদ্দীপক চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মজঃফরপুরে হত্যাকাণ্ডের পরই যেই মানিকতলায় বোমার কারখানা বাহির হইয়া পড়িল, অমনি বিপ্লবী দলের সহিত শ্রীঅরবিন্দ ধৃত হইলেন এবং অপর সকলের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধেও বিপ্লব ও হত্যা

ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হইল। এই অভিনব অভিযোগে শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় স্থিতধী ব্যক্তিও অতীব বিস্মিত হইয়াছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ "কারাকাহিনী"তে তাঁহার গ্রেপ্তার ও আনুষঙ্গিক ঘটনার মনোরম বিবরণ দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ক্রেগানের যে হাস্যোদ্দীপক কাহিনী লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভাগ্য-বিড়ম্বনায়ও হাসিতে হয়। প্রথমেই ক্রেগানের হুকুমে তাঁহার হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি দেওয়া হইল, কিছুক্ষণ পরে তাহা খুলিয়া লওয়া হইল। শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন, "ক্রেগানের কথার ভাবে প্রকাশ পাইল যে তিনি যেন হিংস্র পশুর গর্তে ঢুকিয়াছেন, যেন আমরা অশিক্ষিত হিংস্রস্বভাববিশিষ্ট আইন ভঙ্গকারী, আমাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা বা ভদ্র কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে ঝগড়ার পর সাহেব একটু নরম হইয়া পড়িলেন। বিনোদবাবু (অন্যতম পুলিশ কর্মচারী) তাঁহাকে আমার সম্বন্ধে কি বুঝাইতে চেষ্টা করেন। তাহার পর ক্রেগান আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি নাকি বি, এ, পাশ করিয়াছেন? এরূপ বাসায়, এমন সজ্জাবিহীন কামরায় মাটিতে শুইয়াছিলেন, এই অবস্থায় থাকা কি আপনার মত শিক্ষিত লোকের পক্ষে লজ্জাজনক নহে?' আমি বলিলাম, 'আমি দরিদ্র, দরিদ্রের মতই থাকি।' সাহেব অমনি সজোরে উত্তর করিলেন, 'তবে কি আপনি ধনী লোক হইবেন বলিয়া এই কাণ্ড ঘটাইয়াছেন?' দেশহিতৈষিতা, স্বার্থত্যাগ ও দারিদ্রব্রতের মাহাত্ম্য এই স্থূলবুদ্ধি ইংরাজকে বোঝান দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া আমি সে চেষ্টা করিতাম না।"

অবশ্য ইহার পরে, এমন কি দীর্ঘ এক বৎসর কারাবাসেও শ্রীঅরবিন্দ কাহারও নিকট কোন প্রকার দুর্ব্যবহার পান নাই, বরং জেলের কর্তৃপক্ষ তাঁহার সহিত যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তিনি তাহার হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে বড়ই আনন্দ হয়। অবশ্য দুর্ব্যবহার পাইলেও তিনি বিচলিত হইতেন না।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "নির্বাসিতের আত্মকথা"য় লিখিয়াছেন যে শ্রীঅরবিন্দকে যখন বিচারালয় হইতে কার্যবশতঃ বাহিরে লইবার সময়ে প্রহরীরা বন্ধন করিয়া লইয়া যাইত, তাহা দেখিয়া সকলের যেন ধৈর্যরক্ষা করা কষ্টসাধ্য হইত—কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ একেবারে অবিচল, মুহূর্তের জন্যও কোনদিন তাঁহার ভাবান্তর দেখা যায় নাই। বিচারের সময়ও সঙ্গিগণ তাঁহার অবিচল ভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন—কোন দিকেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, যেন যোগাসনে বসিয়া আছেন।

"কারাকাহিনী"তে তাঁহার স্বলিখিত বিচাবের সরস বিবরণ একটা পড়িবার জিনিস—তিনি নিম্ন আদালতের ম্যাজিষ্ট্রেট, সরকারী কৌঁসিলী নর্টন সাহেব এবং সাক্ষীদের যে অপূর্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে বিচার প্রহসনটি সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছে। অবশেষে এক বৎসর যাবৎ দীর্ঘ বিচারের পর তিনি সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তি পাইলেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৫ই মে তিনি কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ৫ই মে তিনি কারাদ্বারের বাহিরে আসিলেন তিনি যে মুক্তি পাইবেন তাহা তিনি পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

বিচার উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দ এক মহৎ ব্যক্তির সাহায্য পাইয়াছিলেন, যিনি পরে দেশের জন্য সর্বস্বত্যাগ করিয়া শুধু ভারতখ্যাত নয়, জগৎখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি হইতেছেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ, যাঁহাকে পরে দেশবাসী নাম দিয়াছিল দেশবন্ধু। চিত্তরঞ্জনই যেন ভগবানের যন্ত্রীরূপে শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিলাভে সহায়তা করিলেন। শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তার হইবার সংবাদ প্রচারিত হইতেই, বিচারে তাঁহার পক্ষ সমর্থনের সাহায্যার্থ অযাচিতভাবে বহু অর্থ আসিয়াছিল। তাঁহার ভগিনী সরোজিনী দেবী তাঁহার পক্ষ সমর্থনের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত অর্থ নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন শ্রীঅরবিন্দের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন

চিত্তরঞ্জন। চিত্তরঞ্জনের সে সময় তেমন পসার-প্রতিপত্তি ছিল না, তবুও প্রায় এক বৎসরকাল বলিতে গেলে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রীঅরবিন্দের জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়। এই মহত্ত্বেই তাঁহার ভাবী মহত্ত্ব ও ত্যাগের সূচনা যাহার জন্য আজও প্রতিটি ভারতবাসী শ্রদ্ধাভরে তাঁহার কথা স্মরণ করে।

এই বিচার উপলক্ষে চিত্তরঞ্জন শুধু ত্যাগ ও মহত্ত্বের পরিচয় দেন নাই, তাঁহার আইন-জ্ঞান ও বাগ্মিতায়ও সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল। বিচার শেষে জজ ও এসেসরদিগের নিকট শ্রীঅরবিন্দের নির্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি যে ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন, তাহাতে শ্রীঅরবিন্দের জীবন-আদর্শ অতি চমৎকাররূপে ব্যক্ত করিয়াছিল। ঐ কথাগুলি যেন বার বার আবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করে:

"Long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone his words will be echoed and re-echoed not only in India, but across distant seas and lands." (এই বিতণ্ডা কোলাহল ও আন্দোলন স্তব্ধ হইবার দীর্ঘকাল পরে, তাঁহার তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে, মানুষ তাঁহাকে স্বদেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তার নবী, মানবপ্রেমিক বলিয়া শ্রদ্ধা করিবে। তাঁহার তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে তাঁহার বাণী ধ্বনিত হইবে শুধু এ দেশে নয়, সাগরপারে দূর-দূরান্তরে।)

এই ঘটনার পূর্ব হইতে শ্রীঅরবিন্দ চিত্তরঞ্জনের সহিত গভীর প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এরূপ ভাবের ঐক্য ছিল যে চিত্তরঞ্জনের সুবিখ্যাত কাব্য "সাগর সঙ্গীত"-এর ইংরাজী

কাব্যানুবাদ করিয়াছিলেন অনুপম ভাষায় শ্রীঅরবিন্দ নিজেই। তাঁহাদের মধ্যে রাজনীতিক আদর্শেরও এমন ঐক্য ছিল যে দেশবন্ধুর তিরোধানের পর শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, তিলকের মৃত্যুর পর একমাত্র চিত্তরঞ্জনেরই ভারতে স্বরাজ স্থাপনা করিবার ক্ষমতা ছিল। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে গয়া কংগ্রেসের পরে স্বরাজ্যদলের প্রচার উপলক্ষে চিত্তরঞ্জন মাদ্রাজ প্রদেশে ভ্রমণকালে পণ্ডিচারীতে শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজনীতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়াছিলেন।

সরকারপক্ষ শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লব-ষড়যন্ত্রের সহিত সংস্রব প্রমাণ করিবার জন্য যে সাক্ষ্য-জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা ছিন্ন করিতে চিত্তরঞ্জন যে আশ্চর্য বিচারবুদ্ধি ও আইন-জ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। নর্টন সাহেব কোন প্রকার যুক্তিযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাইয়া, পরোক্ষভাবে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে বৃটিশবিদ্বেষ প্রণোদিত হইয়াই শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিতেছিলেন এবং জাতীয় দল গঠন করিয়া দেশকে বিপ্লবে উত্তেজিত করিতেছিলেন। নর্টন সাহেব এই উদ্দেশ্যে শ্রীঅরবিন্দের বহু চিঠিপত্র, প্রবন্ধাদি ও বক্তৃতা পাঠ করেন। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে বারীন্দ্রকুমারের লেখা বলিয়া একখানি পোষ্টকার্ড। উহাতে লেখা ছিল, এখনই মিষ্টান্ন ছড়াইবার সময়। ঐ কার্ডখানি পুলিশ নাকি পথিমধ্যে আটক করিয়াছিল এবং নর্টন প্রমাণ করিতে চাহেন "মিষ্টান্ন"র অর্থ বোমা। এই অদ্ভুত যুক্তি গ্রহণ করা দূরের কথা, চিত্তরঞ্জনের ব্যাখ্যায় এসেসরগণের সিদ্ধান্ত হইল ঐ চিঠি একেবারেই জাল। জজ ওরূপ সিদ্ধান্ত না করিলেও, অভিমত প্রকাশ করেন যে ঐ সাক্ষ্যের কোনই মূল্য নাই।

শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিক কার্যাবলীর বিবরণ ছাড়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যক্তিগত সাক্ষ্য ছিল না। তবে রাজ-সাক্ষী নরেন গোঁসাই জেলে শ্রীঅরবিন্দের সহিত মেলামেশা করিয়া তাঁহাকে

জড়াইবার চেষ্টায় ছিল। সে কিভাবে শ্রীঅরবিন্দের ও অপর সকলের সহিত কথাবার্তা বলিত তাহার বিবরণ "কারাকাহিনী"তে পাওয়া যায়। কিন্তু গোঁসাই জেলে নিহত হওয়ায়, তাহার উক্তি আইন-অনুসারে গ্রাহ্য হইল না।

অপর পক্ষে সরকারী কৌঁসিলীর যুক্তিধূম্রজাল উড়াইয়া দিয়া চিত্তরঞ্জন প্রমাণ করিলেন যে এ পর্যন্ত রাজনীতিক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ যাহা করিয়াছেন তাহা কোনমতেই বে-আইনী নহে। স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা বে-আইনী হইতে পারে না। দেশপ্রেম কোন আইন অনুসারেই দূষ্য হইতে পারে না। জজ বীচক্রফ্ট্ রায়ে ঐ যুক্তিই মানিয়া লইলেন। সতীর্থের বিচারে শ্রীঅরবিন্দ সম্পূর্ণ নির্দোষ সাব্যস্ত হইলেন।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা

মহেন্দ্রনাথ সরকার

শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় লোকোত্তর পুরুষের জীবন-কথা বলবার অধিকার হয়ত অনেকেরই নেই। তাঁর প্রকৃত জীবন গুহায়িত। এই জীবনের আরম্ভ ও পরিণতির সংবাদ কিছু বাইরে প্রকাশ হলেও, এর উত্তম রহস্য এখনও সাধারণের নিকট অজ্ঞাত। শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব মনীষা, অদ্ভূত কর্মশক্তি সকলেরই বিদিত। এরূপ শক্তিমান পুরুষের মৌন স্তব্ধতা বিস্ময়ের বিষয়। তাই তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনী সম্বন্ধে ঔৎসুক্য দেখতে পাওয়া যায়।

রাষ্ট্রনেতা ও মহামনীষী শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারা চিরকালই মানুষের চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করেছে ও করবে। কিন্তু আজ দেশের অন্তরে শ্রীঅরবিন্দ ঋষিরূপে প্রতিষ্ঠিত। ঋষি অরবিন্দ লোকের শ্রদ্ধা-দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর বিশেষ কারণ এই যে শ্রীঅরবিন্দ হিন্দুর সাধনাকে এযুগে সজাগ করে জয়যুক্ত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা বাংলা ও ভারতের প্রাণে বেদান্তের বাণীকে উদ্‌বুদ্ধ করে হিন্দুর আধ্যাত্মিকতার গভীরতা প্রতিষ্ঠা করেছিল। যখন ভারতের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও শক্তি পাশ্চাত্যের ভাবধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছিল, তখন শ্রীঅরবিন্দের লেখনী ও তাঁর অলৌকিক জীবনী ও সাধনা হিন্দুর আধ্যাত্ম-শক্তিকে পুনরায় জীবন্ত করে তুলছে। আধ্যাত্মিকতা অলক্ষ্যে এমনি শক্তি সঞ্চার করে যে তা ক্রমশঃ ব্যাপক হয়ে জাতিকে কল্যাণে উদ্‌বুদ্ধ করে। সার্বভৌমিক কল্যাণদৃষ্টি হিন্দুর সাধনার লক্ষ্য। ইহাই হিন্দুর মৃতসঞ্জীবনী। ইহা হিন্দুকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

ভারতের ভাবধারার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতে অনুসন্ধান হয়েছে সনাতন সত্য। যাজ্ঞবল্ক্য হ'তে বোধিসত্ত্ব, বোধিসত্ত্ব হ'তে শঙ্কর

রামানুজ, রামানুজ হ'তে চৈতন্য রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ হ'তে অরবিন্দ—সকলেরই দৃষ্টি পূর্ণ সত্যের দিকে। জীবনের মূলে যিনি শান্ত শিব অদ্বৈত—তাতেই হিন্দুর দৃষ্টি আবদ্ধ। এই সত্যকে উপলব্ধি ক'রে জীবনের ব্যাপকতা ও পবিসরতায় মানুষ পায় তার সর্বস্ব। শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় দু'টি গতি আছে, এক নিজের ভেতব ব্রহ্মবোধ সুপ্রতিষ্ঠিত করা, আর এক ব্রহ্মতেজে অন্তর দীপ্ত করে বিশ্বপ্রেম ও অভয় প্রতিষ্ঠা করা, অন্তর ব্রহ্মবীর্যসম্পন্ন করা। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা দিব্যশক্তি দিব্যশ্রী দিব্যমনীষালাভের পথ দেখিয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের যোগ অন্তরেব অন্তরতম প্রদেশে নিহিত অধ্যাত্ম-বহ্নি জাগিয়ে তোলে। আত্ম-সমর্পণ যজ্ঞেব পূত বহ্নিশিখার ভেতরই দিব্য-জীবনের স্ফুরণ। দিব্যশক্তি জীবনেব চবম শক্তি। শ্রীঅ'বিন্দের সাধনার এই পবিণতি।

১৯০৭-৮ সনের ন্যাশন্যাল কলেজে যাঁরা জুটেছিলেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই বিশেষত্বশীল। সকলেরই কিছু-না-কিছু নতুন বলবার বা করবার ছিল। বাঙালী জাত যে কত বড় তখনই বেশ মালুম হ'য়েছিল। ডন সোসাইটির চোখ দিয়েও এই সকল নূতনত্ব ও বিশেষত্ব আবিষ্কার করছিলাম। স্বার্থত্যাগী করিৎকর্মা বিপ্লবপন্থী অনেককেই মনে হচ্ছিল।

প্রথম আবিষ্কার অরবিন্দ। একমাত্র আমার আবিষ্কার নয়—গোটা সতীশ-মণ্ডলেরই আবিষ্কার। ১৯০৬ সনের পূর্বে বোধ হয় সতীশবাবু অরবিন্দ'র নাম পর্যন্ত শোনেননি। অন্ততঃ তাঁর কাছে আমরা অরবিন্দ'র নাম শুনেছি বলে মনে পড়ে না। অথচ অরবিন্দ'র বয়স তখন বোধ হয় বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশেক। সুদূর বরোদায় ছিলেন—সত্যি কথা। কিন্তু তবুও বাঙালী তো। বুঝতে হবে—সেকালে লোকজনের নাম যেন দেশের ভেতর বড়-একটা ছড়িয়ে পড়ত না। এই জন্যই বলছি অরবিন্দ আমাদের সকলের পক্ষেই যেন একটা আবিষ্কার। গোটা বাঙালী জাতই ১৯০৬ সনে ন্যাশন্যাল কলেজের মারফৎ অরবিন্দকে আবিষ্কার করল।

ন্যাশন্যাল কলেজের আবহাওয়ায় আসল পারিভাষিক ছিল মাত্র এক। সে হচ্ছে স্বার্থত্যাগ আর স্বদেশ-সেবা। এই পারিভাষিকে অরবিন্দ পয়লা নম্বরের বলাই বাহুল্য। কাজেই নাম-ডাক ছিল জবর। অরবিন্দ যে-কোনো বিষয়েই ওস্তাদ, সব-কিছুই করতে পারে। সে স্বার্থত্যাগী ব'লে এইরূপ ছিল দেশের লোকের ধারণা। "বন্দে মাতরম্" দৈনিক বেরুল ১৯০৬ সনে। তার সঙ্গে সম্পাদক হিসাবে অরবিন্দ'র নাম জড়ানো ছিল। লোকেরা ভাবত যে

"বন্দে মাতরম্" কাগজের সব-ক'টা সম্পাদকীয় রচনা—কম-সে-কম সবসে ঝাঁঝাল রচনাগুলা অরবিন্দ'র লেখা। মোটের উপর সার্বজনিক মতে অরবিন্দ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ১৯০৬-৮ সনের বঙ্গ-বিপ্লবের নেতা। নেতা শুধু নয়, একদম প্রতিমূর্তি। একেই বলে ভাবালুতা।

স্বার্থত্যাগ সম্বন্ধে নতুন কিছু বলবার ছিল না। বিপ্লব-দার্শনিক হিসাবেও অরবিন্দ'র ইজ্জৎ কমাবার কোনো কারণ হয়নি। এই দুই বিষয়ে সে একদম পাকা সোনা। কিন্তু তা ব'লে অরবিন্দকে বঙ্গ-বিপ্লবের নেতা বা জনক বলা সম্ভবপর ছিল না। তাঁকে অন্যতম নেতা বলতে অ-রাজি হতাম না। তবে "বঙ্গ-বিপ্লবের" জন্মদাতা তো তিনি ননই। কেননা ১৯০৫-৬ সনে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাংলার সার্বজনিক জীবনে তাঁর উদয় হয়নি। কম-সে-কম কোনো বাঙালী খোলা চোখে অরবিন্দকে বঙ্গীয় সার্বজনিক সংস্কৃতির সঙ্গে সুজড়িতভাবে দেখেছিল কি না সন্দেহ।

অরবিন্দ ব'কতে পারতেন না। বকাবকি করার ক্ষমতা নেতৃত্বের প্রধান ভিত্তি। বহুসংখ্যক নানা মেজাজের লোককে ক্ষ্যাপাতে হ'লে চাই গলার জোর। একমাত্র বিদ্যা, একমাত্র বিচার-শক্তি, একমাত্র স্বার্থত্যাগ, একমাত্র চরিত্রবল,—এইসব সদ্‌গুণের জোরে লাখ-লাখ লোকের হৃদয় দখল করা যায় না। তার জন্য চাই বাগ্মিতা। অরবিন্দ'র বাগ্মিতা ছিল না—না ইংরেজিতে, না বাংলায়। বস্তুতঃ তখন তাঁর পক্ষে বাংলায় কথা বলাও বোধ হয় সহজ ছিল না। অরবিন্দ'র প্রভাব ছড়াতো ছোট-ছোট আসরে। এমন কী, মাত্র দু-চারজন লোকের আবেষ্টন ছাড়া তাঁর পক্ষে কথা কওয়া পোষাতো না। সত্যি কথা—লোকটা যেন বিলকুল বাক্যহীন। এমন নীরব লোক সংসারে থাকতে পারে বিশ্বাস করা কঠিন। দেখেছি—সার্বজনিক সভায় ব'সেও অরবিন্দ মুখ ফোটাতেন না। এই দুর্বলতা যার, তার পক্ষে দেশের নেতৃত্ব করা সম্ভবপর নয়।

আমার বিচারে সে-যুগের আসল নেতা বিপিন পাল। ১৯০৬ সনের

আগষ্ট হ'তে ১৯০৮ সন পর্যন্ত বাঙালী জাতকে তাতিয়ে তোলবার ভার ছিল বিপিন পালের হাতে। বিপিন পালের গলার আওয়াজ না শুনলে যুবক-বাংলার জন্ম হ'ত না। বিদ্যায়, দার্শনিকতায়, রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানে, বিপ্লব-যোগে, কর্তব্যনিষ্ঠায় বিপিন পালের ঠাঁই উঁচু ছিল। তার সঙ্গে গলার আওয়াজ জোড়া ছিল ব'লে বিপিন পালের কীর্তি। একমাত্র গলাবাজি ক'রে কেউ দেশ মাতাতে পারে না।

সুরেন ব্যানার্জিরও বাগ্মিতা ছিল, স্বদেশনিষ্ঠাও ছিল। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে ও বিলাতী-বয়কটের স্বপক্ষে তাঁর প্রচারিত উদ্দীপনার কিম্মৎ ছিল ঢের। কিন্তু ১৯০৫-৮ সনের যুগে তাঁকে বিপ্লবপন্থী বলা সম্ভবপর ছিল না। ষোল আনা রাষ্ট্রিক স্বরাজ, ষোল আনা সাংস্কৃতিক স্বরাজ, ষোল আনা শিক্ষা-স্বরাজ ইত্যাদি চরম স্বাধীনতার বাণী সুরেনবাবু প্রচার করতে পারেননি। কাজেই তাঁকে নরম বা মডারেট দলের নেতা বলা হ'তে লাগল। পশার জমলো বিপিন পালের। এইজন্য আমি বিপিন পালকে বঙ্গ-বিপ্লবের জন্মদাতা ও নেতা ব'লে সম্বর্ধনা ক'রে থাকি। অরবিন্দ'কে এই আসনে বসানো চলবে না। তবে নানা কারণে অরবিন্দ'র নাম-ডাক ছিল। এইজন্য কোনো-কোনো সময়ে বঙ্গ-বিপ্লবকে (১৯০৫-৮) বিপিন-অরবিন্দ'র যৌথ সৃষ্টি বলতেও অ-রাজি হই না।...

১৯০৮ সনে অরবিন্দ'র বোমার মামলায় চিত্তরঞ্জন তাঁর ব্যারিষ্টার। এইজন্য তাঁর নাম-ডাক সুরু। আমরা তাঁকে বিপিন পালের বন্ধু ব'লেও জানতাম। রাষ্ট্রিক "বাজারে" তাঁর সঙ্গে দেখাশুনা হ'তো কম। দেশ-বিদেশের সঙ্গে ভারতীয় যোগাযোগ কায়েম করা সম্বন্ধে একবার তাঁর সঙ্গে কথা হ'য়েছিল (১৯১২)। দেখলাম তিনি লণ্ডনের আইরিশ দলের সঙ্গে ভারতীয় কংগ্রেসের বন্ধুত্ব পছন্দ করেন। এটুকুও সেকালের ভারতীয় রাষ্ট্রিকেরা সাধারণতঃ বুঝতো না।...

ফরাসী ও গ্রীক সাহিত্যে অরবিন্দকে পণ্ডিত ব'লে মনে

হয়েছিল। সংস্কৃতেও পাণ্ডিত্য দেখতাম। ইংরেজি রচনায় জোর দেখা যেত। তাঁর "প্যার্সিয়াস দি ডেলিভারার" (মুক্তিদাতা প্যার্সিয়াস) নামক ইংরেজি কাব্য আমার খুব পছন্দ-সই ছিল। গ্রীক গল্প তার কথা-বস্তু। তাঁর "বিক্রমোর্বশীর" ইংরেজি অনুবাদ অতি-চোস্ত ও মধুর। এই তর্জমা ব্যবহার করেছি "ল্যভ ইন হিন্দু লিট্‌রেচার" বইয়ে (তোকিও ১৯১৬)।

অরবিন্দ'র স্বার্থত্যাগের কথা আগেই ব'লেছি। পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে জনসাধারণ আন্দাজে মনে করত অরবিন্দ যাহ'ক-কিছু, কেষ্ট-বিষ্টু একটা-কিছু হবেই-হবে। "বন্দে মাতরম্"-দৈনিকে অরবিন্দ'র নিজের লেখা ক'টা বেরিয়েছে কেই বা জানে? কিন্তু লোকেরা মনে করত,—সবই বুঝি অরবিন্দ'র রচনা। অরবিন্দ'র আসল নাম-ডাকের কারণ এসব নয়।

অরবিন্দ'র আসল নাম-ডাকের কারণ হলো, ১৯০৮ সনের মে মাসে বোমার মামলায় অরবিন্দ পুলিশেব হাতে ধরা পড়লেন। তৎক্ষণাৎ লোকেরা ১৯০৫ সনের আগস্ট হ'তে সব-কিছুই অরবিন্দ'র সঙ্গে জড়িয়ে ফেলল। এমন কি, বিপিন পালও তলিয়ে গেল। অরবিন্দ-দিগ্‌বিজয়ের আসল দর্শন বোমা। বোমা-হীন অরবিন্দ স্বার্থত্যাগী ও স্বদেশ-সেবক পণ্ডিত মাত্র রয়ে যেতেন,—জগৎপ্রসিদ্ধ দিগ্‌বিজয়ী ভারত-বীররূপে পূজা পেতেন না। আর তা হ'লে .একালের অরবিন্দ-দর্শনকেও কোনো লোকে পুছত কিনা সন্দেহ।

অরবিন্দ প্রথম ধরা পড়েন ১৯০৭ সনে। তখন ইডেন হিন্দু হোস্টেলের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কয়েকবার গলাবাজি করি। সেই গলাবাজিতে প্রবন্ধ পয়দা হয়। দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী-সম্পাদিত "নব্য ভারত" মাসিকে প্রবন্ধটা বের হ'য়েছিল। নাম "বীরপূজা"। গ্রেপ্তারের কারণ হচ্ছে "বন্দে মাতরম্" পত্রিকায় "ইণ্ডিয়া ফর ইণ্ডিয়ান্‌স্" প্রবন্ধ-প্রকাশ (২৭ জুন)। অরবিন্দর সেই গ্রেপ্তার

উপলক্ষ্যেই রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাই: "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।" ("বন্দে মাতরম্", ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭)

ন্যাশন্যাল কলেজ থেকে তাঁকে বিদায় দেওয়া হ'লো (২১ আগস্ট, ১৯০৭)। মোক্ষদা সামাধ্যায়ী বেদ গেয়ে তাঁর মঙ্গল কামনা করলেন। ছেলেরা কান্নাকাটি করলো। অরবিন্দর বাণী হ'লো: "ওয়ার্ক দ্যাট্ শী মে প্রস্পার, সাফার দ্যাট্ শী মে রিজয়েস্ (কাজ করে চলো যাতে মা'র সম্পদ বাড়তে পারে। দুঃখ সহে চলো যাতে মা'র আনন্দ বাড়তে পারে)।" এই বাণীই অরবিন্দ'র আসল বাণী। ১৯০৭-এর জুন হ'তে ১৯০৮-এর মে পর্যন্ত বছর-খানেকের ভেতর অরবিন্দ দেশ-বিদেশে "বাপকা বেটা" নামে ঠিকানা কায়েম করেন।

আমি যখন কলকাতায় মিত্র ইনস্টিটিউশনে পড়ি তখন স্বদেশী আন্দোলন খুব জোরের সঙ্গেই চলছিল। স্কুল-কলেজের ছাত্রমহলে তখন স্বদেশীর সাড়া পড়েছিল ভালোরকম। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত রাখীবন্ধনের দিন ছেলে-বুড়ো সবাইয়ের উৎসাহ ছিল অদম্য। বৃদ্ধ মৌলভি লিয়াকত হোসেনের নেতৃত্বে কলকাতার এবং বিশেষ করে গোলদীঘি অঞ্চলের রাস্তায় জন-মিছিল বের হতো নানা দিক থেকে। আমাদের ১৪নং মল্লিক লেনের বাড়ির পুব গায়ে ছিল একটা হোগলার চালাঘর এবং তৎসংলগ্ন ছিল বেশ খানিকটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা জমি। সেখানে একটি লাঠিখেলার ও ব্যায়ামের আখড়া ছিল। দলের নেতা ছিলেন ননীদা। তাঁর পদবীটি মনে নেই, তবে মনে হয় বোস। ননীদা আমাকে 'কালো' বলে ডাকতেন, আমার গায়ের রঙ দেখেই বোধ হয়। সেই থেকে বেশ কিছুদিন ভবানীপুর অঞ্চলে বন্ধুমহলে আমার এ নামটাই চালু ছিল। আখড়ায় পাড়ার সব ছেলেই প্রায় আসত। বেপাড়া থেকেও কিছু কিছু আসত শিক্ষার্থী। সে কি পাঁয়তাড়া, আর লাঠির ঠক ঠক আওয়াজ। শুধু কি লাঠির, গদকা তলোয়ার ও ছোরা ঘোরাবার কত রকম কায়দা আমরা তখন শিখেছিলাম। কেউ কেউ শিখত ডন, বৈঠক ও কুস্তি। সরলাদেবী চৌধুরানীর প্রবর্তিত বীরাষ্টমীর দিন সে কি উৎসাহ লাঠিখেলোয়াড়দের! আর একজন ওস্তাদ ছিলেন মুর্তাজা বলে। তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ননীদার জয় যখন ঘোষণা হল তখন আমাদের আর পায় কে। ননীদাকে আমরা একজন সর্বজয়ী সেনাপতির মতো সমীহ ও শ্রদ্ধা করতাম।

এই স্বদেশী আমলের আর-একটি স্মৃতিচিত্র এখানে বললে

অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আজ হতে প্রায় ষাট বছর আগে, বয়স যখন আমার ছিল বারো কি তেরো, তখন অত্যন্ত দূর থেকে, ক্ষণিকের জন্যে মাত্র বার দুই তিন শ্রীঅরবিন্দকে চক্ষে দেখেছিলাম। সেই প্রশান্ত মুখশ্রী, দূরনিবদ্ধ দৃষ্টি ও নম্রমধুর বাক্য আমার মানসপটে যে একটি অবিনশ্বর ছাপ রেখে গেছে তারই খুব আবছায়া স্মৃতিটুকু আজকের দিনে সকলের কাছে তুলে ধরতে চাই। শ্রীঅরবিন্দ তখনকার দিনে আমার ও আমার মত সহস্র সহস্র সুকুমারমতি বালক ও যুবকের মনের উপর যে কি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, আমার এই স্মৃতিকথায় তারই একটু আভাস হয়ত পাওয়া যাবে। আমাদের দেশের ইতিহাসের সেই দুর্দিন সময়ে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর একদল নির্ভীক শিষ্য যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন দেশমাতৃকার স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে তার সঙ্গে অনেকের মতের অমিল হওয়া খুবই সম্ভব এবং এমন কি খুবই সহজ ও স্বাভাবিক বলেই আজকের দিনে মনে হতে পারে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের এবং সেই নির্ভীক যুবকদের আত্মবলিদান এবং আদর্শানুবর্তিতার প্রশংসা না করে থাকা একেবারেই সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে করি না। ১৫ই আগস্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস এবং ঐ দিনটি শ্রীঅরবিন্দের পুণ্য আবির্ভাবেরও সাম্বৎসরিক দিন। সেই দিনে যখন আমরা আমাদের 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করছি তখন তদানীন্তন আদর্শপ্রণোদিত শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সহকর্মীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শ্রীঅরবিন্দের জীবনের এই পরিচ্ছেদটাও তাঁর পূর্ণ পরিণতির পক্ষে প্রয়োজন ছিল —আগুনে পোড়ানর যেমন প্রয়োজন হয় সোনাকে নিষ্কলঙ্ক করবার জন্যে। তাই শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবের দিনে তাঁকে স্মরণ করি ও তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে আপন হৃদয়কে পবিত্র করি।

খ্রীষ্টীয় উনিশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের অনেক সুসন্তান দুর্ভাগা দেশের স্বাধীনতালাভের জন্যে নীরবে কাজ করে যাচ্ছিলেন। বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের স্তোকবাক্যে তাঁদের আস্থা একেবারেই চলে

গিয়েছিল এবং তাঁরা বুঝেছিলেন যে সেদিনকার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে প্রতি বৎসর কাগজে-কলমে স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করতেন তাতে করে কোনো কাজই হবে না। তাঁরা স্থির জেনেছিলেন যে, স্বাধীনতা একে অন্যকে দান স্বরূপ দিতে পারে না এবং ক্ষমতাদীপ্ত উদ্ধত রাজপুরুষের হাত থেকে তা স্বীয় বলপ্রয়োগে কেড়ে নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে তখন নানা জায়গায় গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছিল। পুণাতে এমনই একটি গুপ্তসমিতি গঠন করেছিলেন বিপ্লবী বীর ঠাকুর সাহেব। ঐ সময়ে বরাবর শ্রীঅরবিন্দ বরোদাতে কাজ করছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ পুণার সেই গুপ্তসমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ বাংলাদেশে এসেছিলেন বেয়েচেয়ে দেখতে যে এখানে কোনো গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করা যায় কি-না। সেই সময়ে তিনি কয়েকটি যুবককর্মী বেছে নিয়ে মেদিনীপুর বিপ্লবকেন্দ্র গঠন করেছিলেন। বাছাই করা যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষও ছিলেন। অল্পদিন পরেই তিনি বরোদাতে ফিরে গেলেন তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের উপরে বাংলাদেশের ভার দিয়ে। এই সময়েই তিনি নিজের মনকে পাকাপাকি রকমে প্রস্তুত করেছিলেন সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বৈপ্লবিক কাজে আত্মাহুতি দেবার জন্যে। ১৯০৫ সালের আগস্ট মাসের ৩০ তারিখে তিনি তদীয় পত্নীকে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন তা আলিপুর বোমার মামলার পর থেকে সর্বজনবিদিত হয়ে আছে। সেই চিঠিতে তিনি বিদেশী শাসন থেকে দেশোদ্ধারের নির্ধারিত কর্মপদ্ধতির কিছু ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। ঠিক এই সময়ে ভগবানের নীরব নির্দেশে বাংলাদেশে এমন একটি ঘটনা ঘটল যা শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশে টেনে এনে একেবারে বিপ্লবের আগ্নেয়গিরির মুখবিবরে ফেলে দিল।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনের খেয়ালখুশি মতো বাংলাদেশকে দুই ভাগে ভাগ করে

মুসলমানপ্রধান পূর্ববঙ্গকে একটি আলাদা প্রদেশ বলে প্রতিষ্ঠা করা হয়ে গেল। জনমতের প্রতি এরূপ অবজ্ঞায় দেশে আগুন জ্বলে উঠল। বঙ্গভঙ্গ রদ করে বাংলাদেশকে এক করতেই হবে এই হল জনগণের দাবি। জনগণের কণ্ঠরোধ করবার জন্যে সরকার প্রচণ্ড দমননীতি অবলম্বন করলেন। ন্যায়বিচারের নামে কত বালক ছাত্রকে বেত মেরে অজ্ঞান করে দেওয়া হল, কত না উন্মুখচিত্ত যুবককে কারাগারের প্রাণহীন অন্ধকারের মধ্যে ফেলে দিল। কিন্তু দৈহিক নির্যাতনে উৎসর্গিত-প্রাণ নির্ভীক দেশসেবকদের উৎসাহ দমে না গিয়ে বেড়েই গেল এবং দেশকে নানা দিক থেকে উন্নত করবার প্রচেষ্টা পুরোদমেই চলল। জাতীয়-জীবনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধানকল্পে কত না প্রকল্প গ্রহণ করা হতে লাগল। জাতীয়-বিদ্যালয় খোলা হল, দেশী কাপড়ের কল, জাহাজ কোম্পানি, এমন কি দেশী ব্যাঙ্ক ও দেশী জীবনবীমা কোম্পানিও বাদ গেল না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নরনারী সেই দুর্দিনে বাঙালীদের সঙ্গে হাত মেলালেন। এইভাবে স্বদেশী আন্দোলন যেমন অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলল সরকারের দমননীতিও তেমনি প্রচণ্ড রুদ্র তেজে বেড়ে গেল। কত না গোপনীয় বিজ্ঞপ্তি বের হল, নির্যাতনের কত না নতুন পন্থা আবিষ্কৃত হল। হিংসাত্মক শাসনবিধির পাল্টা জবাবে হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করতে হল দেশের লোকদের। দেশোদ্ধারের প্রচেষ্টায় সাময়িক ব্যর্থতা যুবক-কর্মীদের টেনে নিয়ে গেল হিংস্র আচরণের দিকে। দেশের এই বিপ্লবময় পরিবেশের সুযোগ নিতে হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সহকর্মীদের।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রীঅরবিন্দকে বরোদা কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করে কলকাতায় সদ্যপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসতে হল। এবার তিনি এই দেশময় সংগ্রামে সমস্ত মনপ্রাণ নিয়োগ করলেন। প্রথমেই তিনি বাংলা ভাষায় 'যুগান্তর' নামে একটি দৈনিকপত্র প্রকাশ করতে শুরু

করলেন। সেই দৈনিকপত্রে শ্রীঅরবিন্দ জ্বালাময়ী ভাষায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধসমূহ দেশের যুবকসম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলেন। দেশের বাস্তব দুর্দশার দিকে এবং তাদের সকলকে দেশসেবায় চরম স্বার্থত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হবার জন্যে আহ্বান জানালেন। এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে সরকার এরূপ কার্যপদ্ধতি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না। অচিরে 'যুগান্তর' পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হল। শ্রীঅরবিন্দ তখন হাত মেলালেন প্রবীণ যোদ্ধা বর্তমানে স্বর্গত বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে। বিপিনবাবু তখন 'বন্দে মাতরম্' কাগজ সম্পাদনা করছিলেন। শ্রীঅরবিন্দব লেখনী-নিঃসৃত জ্বালাময়ী ভাষা কারো চোখে ধুলো দিতে পারে না। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট তাবিখে সরকারী হুকুমে শ্রীঅরবিন্দকে ঐ সব রাজদ্রোহী প্রবন্ধের রচয়িতা বলে গ্রেপ্তার করা হল। আদালতের মামলায় বিপিনবাবুর ডাক পড়ল সাক্ষী দিয়ে প্রমাণ করতে যে ঐ সব আপত্তিজনক প্রবন্ধাদি শ্রীঅরবিন্দেরই লেখা। বলাই বাহুল্য যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক এবং একনিষ্ঠ দেশসেবক বিপিনবাবু সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকৃত হলেন, ফলে হল এই যে আদালতের অবমাননার জন্যে বিপিনবাবুকে ছয় মাস কারাবরণ করতে হল এবং প্রমাণাভাবে শ্রীঅরবিন্দকে সেই দফায় মুক্তি দিতে হল। এই সময়েই গুরুদেব শ্রীঅরবিন্দকে নমস্কার জানিয়ে যে কবিতাটি লিখেছিলেন যা ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বরের 'বন্দে মাতরম্' কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল—তার থেকে বোঝা যাবে শ্রীঅরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের মনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং কবিচিত্তে দেশপ্রেমিকের কি উজ্জ্বল ছবি ফুটে উঠেছিল। দেশসেবককে উদ্দেশ করে কবি গাইলেন—

অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,

নহে ধন, নহে সুখ ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা ; ভিক্ষা লাগি
বাড়াও নি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ব বাধাহীন—
যার লাগি নরদের চির রাত্রিদিন
তপোমগ্ন, যার লাগি কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে
গিয়েছেন সংকটযাত্রায়, যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে,
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়—সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠদান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে। তোমার প্রার্থনা আজি
বিধাতা কি শুনেছেন ? তাই ওঠে বাজি
জয়শঙ্খ তাঁর ?···

শ্রীঅরবিন্দের এই মুক্তি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তারিখে মজঃফরপুর শহরে স্থানীয় ক্রুরমতি জেলাশাসকের প্রাণহানির প্রচেষ্টায় একটি নিরপরাধ ইংরেজ মহিলাকে হত্যা করার অপরাধে ধরা পড়লেন ক্ষুদিরাম বসু। তাঁর সাথী প্রফুল্ল চাকী নিজের রিভলবার দিয়ে নিজেকে গুলী করে মেরে পুলিশের গ্রেফতার থেকে নিজেকে রক্ষা করলেন। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে ক্ষুদিরামের প্রাণদণ্ড হল এবং তিনি হাসতে হাসতে ফাঁসিকাঠে নিজেকে কী নির্ভীকভাবে আহুতি দিলেন সে কথা নানা গানে দেশময় ছড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মে তারিখের অতি প্রত্যূষে মানিকতলার মুরারিপুকুর বাগান ঘেরাও করে খানাতল্লাসী করে পুলিশবাহিনী কত না দেশী হাতবোমা, তলোয়ার, ছোরা ও

রিভলবার বাজেয়াপ্ত করল। বারীন্দ্র এবং উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ অনেক গুপ্তসমিতির সভ্য যাঁরা সে সময় সে বাগানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করা হল। সেইদিনই কলকাতার অন্য এক স্থান থেকে শ্রীঅরবিন্দকেও গ্রেফতার করা হয়েছে বলে মুখে মুখে খবর প্রচারিত হল এবং 'সন্ধ্যা' নামক সান্ধ্য কাগজের সে কি বিক্রি সেদিন সন্ধ্যায়।

ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের প্রারম্ভিক অনুসন্ধানের পর শ্রীঅরবিন্দ এবং অন্যান্য পঁয়ত্রিশজন যুবককে দায়রায় সোপর্দ করা হল। ভাগ্যের পরিহাস যে সে বিচারের ভার গিয়ে পড়ল আলীপুরের তদানীন্তন সেসন্স জজ মিঃ বীচক্রফট্ সাহেবের কাছে। এই বীচক্রফট্ সাহেব শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে এক সাথেই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসেছিলেন এবং পাশের তালিকায় শ্রীঅরবিন্দের কয়েক ধাপ নিচে তাঁর নাম বের হয়েছিল। মামলা চালু হল। তুমুল আইনের যুদ্ধ চলল দুই মহারথীর সঙ্গে। সরকারী পক্ষের কৌঁসিলীদের অগ্রণী ছিলেন ইয়ার্ডলি নর্টন সাহেব। আর আসামীদের পক্ষে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত লড়লেন তখনকার দিনের উদীয়মান ব্যবহারজীবী সি. আর. দাস এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মী। এই সি. আর. দাসই পরে 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' নামে জগদ্বিখ্যাত দেশনেতা বলে সম্মানিত হয়েছিলেন। এই মামলা অনেক দিনব্যাপী মহাযুদ্ধের মতন চলেছিল। আসামীদের এবং বিশেষ করে শ্রীঅরবিন্দের যাতে দোষী বলে প্রাণদণ্ড হয় তার জন্যে সরকার পক্ষ থেকে যাবতীয় কাণ্ডই করা হয়েছিল সরকারের সমস্ত আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে। স্বদেশী আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার উদ্দেশ্যই ছিল এই মামলার একমাত্র কাম্য। প্রত্যহ 'সন্ধ্যা' কাগজে আদালতের শুনানীর কাহিনী ছাপা হতো এবং জনসাধারণ কি ঔৎসুক্যের সঙ্গে সে কাগজ পড়তেন তা স্বচক্ষে দেখেছি। আমার বয়স তখন বারো কি তেরো। আমি তখন শারীরিক অসুস্থতার জন্যে বেশ কয়েক মাস শান্তিনিকেতন

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ফিরে না গিয়ে কলকাতায় বাবা-মায়ের কাছেই বাস করছিলাম এবং মিত্র ইনষ্টিটিউশনের ভবানীপুর শাখায় পড়ছিলাম। সি. আর. দাস যাঁকে আমি দাদাবাবু বলতাম তিনি তখন ভবানীপুরে 'কালীমোহন আলয়' ভবনে—যেখানে এখন চিত্তরঞ্জন সেবাসদন হয়েছে—সেখানে থাকতেন। বেশ মনে আছে, প্রতি সন্ধ্যায় যখন দাদাবাবু বাড়ি ফিরে এসে তাঁর বাসগৃহের সামনের গাড়িবারান্দার উপরের বারান্দায় বসতেন তখন আমি এবং আমার বয়সী ছেলেরা নিঃশব্দে সেই বারান্দার এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতাম কেমন-ভাবে বোমার মামলা এগুচ্ছে।

সেই সময়ে একের পর এক রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে গেছে। নরেন গোঁসাই বলে একজন আসামী পুলিশের প্ররোচনা ও অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মাপ চেয়ে রাজার সাক্ষী হয়ে সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে সাক্ষী দেবেন এইরূপ ঠিক হয়েছিল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল আসামীদের মধ্যে দুই যুবক—কানাইলাল দত্ত এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু —জেলের আঙিনার মধ্যেই রিভলবারের গুলীতে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যা করে ফেললেন। জেলের মধ্যে অত পাহারা ও সতর্কতা সত্ত্বেও কেমন করে তাঁরা রিভলবার পেলেন তার খবর এখনো কেউ জানে না। জ্বলন্ত রিভলবার হাতে গ্রেফতার হয়ে বিচারে উভয়েরই প্রাণদণ্ডের আদেশ হল। প্রথম ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল কানাইলালকে। তাঁর মৃতদেহকে যখন কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে আনা হল তখন যে জনসমাগম দেখেছি তা দেশবন্ধুর শ্মশানযাত্রার পূর্বে আর কখনো দেখি নি। সে সব শোভাযাত্রা যে কোনো দেশের প্রবল পরাক্রম নৃপতিও আকাঙ্ক্ষা করতে পারতেন। জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ বেড়ে যায় দেখে সত্যেন বসুর ফাঁসির পর তাঁর মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া জেলের প্রাচীরের অন্তরালেই সমাধা হয়েছিল। এ ছাড়া আলীপুরের সরকারী উকিল সুরেশ বিশ্বাস, যিনি নর্টন সাহেবকে মামলায় সাহায্য করছিলেন, তাঁকে দিনে-দুপুরে গুলী করে হত্যা করা

হল।. তা ছাড়া পুলিশ দারোগা আলম, যিনি মিথ্যে সাক্ষ্য শেখাতেন বলে লোকে সন্দেহ করত তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টের ভিতরেই তাড়িয়ে নিয়ে গুলী করে মারা হয়েছিল। কি উত্তেজনার মধ্যে না আমরা সে সময় বাস করেছি! এই সব খবর কাগজে পড়ে আমাদের মন উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে পড়ত এবং আমাদের চক্ষে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর যুবক সহকর্মিগণ আদর্শ বীররূপে প্রতীয়মান হতেন।

আলীপুরের বোমার মামলা যখন জমাটভাবে চলছে তখন শ্রীঅরবিন্দকে চাক্ষুষ দেখবার খুব ইচ্ছে হল। তাঁর ছবি মাঝে মাঝে খবরের কাগজেই দেখেছিলাম কিন্তু তখন পর্যন্ত জীবনে তাঁকে কখনো চক্ষে দেখি নি। "তারে চোখে দেখি নি শুধু বাঁশী শুনেছি, মনপ্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি" মনের ভাবটা তখন খানিকটা এই ধরনের। অনেক ভেবে ঠিক করলাম যে আদালতে গেলেই সহজেই তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে। একদিন কাউকে কিছু না বলে, স্কুলে না গিয়ে অর্থাৎ পালিয়ে চলে গেলাম আলীপুর সেসন্স কোর্টে। এর আগে কখনো কোনো আদালতে যাই নি। চারিদিকে লোক গিজ্ গিজ্ করছে। উর্দি ও লাল পাগড়ি পরা পুলিশের বহর দেখে মনটা কেমন দমে গেল। তার উপর শুনেছিলাম যে সাধারণ পোশাকে গা ঢাকা দিয়ে অনেক ডিটেকটিভ যাদের টিকটিকি বলা হতো—তারা নাকি সেখানে ঘুরে বেড়ায়। বিচারগৃহে প্রবেশের জন্যে টিকিট দরকার কি-না তাও জানতাম না। সেই ধরপাকড়ের দিনে এতবড় ব্যূহ ভেদ করে আদালতের ভিতরে প্রবেশের প্রচেষ্টা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হল না। এবং এখন বলতে বাধা নেই, মনে খানিকটা ভয়ও করেছিল। সুতরাং কোর্টঘরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। মাঝে মাঝে জনসাধারণের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হওয়ায় চেয়ে দেখলাম হাতে হাতকড়া-পরানো কোমরে দড়ি বাঁধা কোন একজন আসামীকে পুলিশরা শৌচগৃহের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি কে এই নিয়ে নানা গুঞ্জনও শুনলাম। এই ক্ষণিকের দেখাতেই মনটা যেন

কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সারাটা দিনে একবারও শ্রীঅরবিন্দের দেখা পাওয়া গেল না। দিন শেষে যখন কাছারি ভাঙল তখন কোর্টঘর থেকে আসামীদের বের করে আনতে গেল প্রহরী পরিবেষ্টিত অবস্থায়। প্রথমেই এলেন শ্রীঅরবিন্দ যাঁর চেহারা আগে ছবিতে দেখেছি। একবার মুখ তুলে তিনি আকাশের দিকে চাইলেন। সে দৃষ্টি কী সুদূর-নিবদ্ধ। বর্তমান পরিবেশের কোনো ছায়াই পড়ে নি তাঁর প্রশান্ত মুখমণ্ডলে। জেলে থাকাকালে গালে-মুখে লম্বা দাড়ি হয়েছিল বলে মনে পড়ে। ধীরে ধীরে তিনি সেই কৃষ্ণবর্ণ জাল দিয়ে ঘেরা পুলিশ ভ্যানের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারপর বারীন্দ্র, উল্লাসকর প্রমুখ অন্যান্য আসামীরা একে একে সেই ভীষণ গাড়ির মধ্যে অন্তর্ধান করে গেলেন। আর একবার গোণা-গুণতির পর গাড়ির দরজা বন্ধ করে তালা লাগান হল। সে সময়ে পুলিশ ভ্যান ঘোড়ায় টানত; মোটর তখন চালু হয় নি। নরেন গোঁসাই তখনো বেঁচে। তিনি আসামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবেন বলে তাঁকে আসামীদের সঙ্গে ভ্যানের ভিতরে ঢোকান হল না পাছে অন্যেরা তাঁকে গলা টিপে মেরে ফেলে। তাঁকে কোচবাক্সে অশ্বচালক ও একটি পাহারাওয়ালার মাঝে বসানো হল। অফিসারের হুইসিল বাজলেই ভ্যান চলতে শুরু করল। আর অমনি ভেতর থেকে হিন্দি ভাষায় গানের মূর্ছনা উঠল। সেই বারো-তেরো বছর বয়সে যে গান শুনেছিলাম জীবনের এই সায়াহ্ন বেলাতেও তা মনে আছে। সেই গানের প্রথম দুটি ছত্র ছিল—

আও মরদানা জঙ্গী জোয়ানা
জল্‌দি জল্‌দি লেও হাতিয়ার।

গানের সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিয়ে সবাই তাল রক্ষা করছিলেন। নরেন গোঁসাইও এককালে সেই গান গেয়েছেন এবং সুরও তাঁর কণ্ঠস্থ। ভ্যানের কোচবাক্সে বসে তিনিও মনে হল যেন গানের তালে হাঁটুর উপর তাল দিচ্ছিলেন। কি মর্মন্তুদ সেই দৃশ্য! ক্রমে ভ্যান

দূরে সরে যেতে লাগল। গানের সুরও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এসে শেষে একেবারে ডুবে গেল। কিন্তু সেই গানের মূর্ছনা ধ্বনিত হতে লাগল আমার কিশোর মনের মধ্যে। আজও সে ধ্বনি যেন কান পাতলেই শুনতে পাই। বাড়ি ফিরে এলাম মন্ত্রমুগ্ধ মানুষের মত। শ্রীঅরবিন্দের প্রশান্ত মুখচ্ছবি এবং তাঁর ভক্ত সহকর্মীদের উন্মুখচিত্ত আনন্দিত প্রাণের যে ছবি চক্ষে দেখে এলাম আজও তা আমার মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আরো দু-একবার এই রকম করেই তাঁদের দর্শনের জন্যে সেসন্স কোর্টে যেতে হয়েছিল আপন অন্তরের তাগিদে।

অবশেষে একদিন মামলার শুনানী শেষ হল। আসামীদের পক্ষ থেকে সি. আর. দাসের শেষ সওয়াল জবাবটি আইনের দিক থেকে একটি অপূর্ব এবং অশ্রুতপূর্ব ভাষণ বলে বরাবরই স্বীকৃত থাকবে। তিনি অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে মামলার সাক্ষীদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে সরকারী কেসের যাবতীয় অসামঞ্জস্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ব্যবহারজীবীর আইনের জ্ঞান ও সুনিপুণ বাগ্মিতার সঙ্গে বন্ধুপ্রীতি মিলিত হয়ে সে ভাষণ একটি পরমরমণীয় পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। সে সওয়াল জবাব শুধু সেই আদালতের বিচারকের কাছেই পেশ করা হয় নি তা পৌঁচেছিল আরো অনেক উচ্চ আদালতের দেবতার পায়ের কাছে যিনি অন্তরালে বসে সারা বিশ্বের নরনারীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। কৌঁসিলী এই বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন—

My appeal to you, therefore, is that a man like this, who is being charged with the offence with which he has been charged, stands not only before the bar of this Court but before the bar of the High Court of History and my appeal to you is this that long after this controversy will be hushed in silence, long after this turmoil, this agitation will have

ceased, long after he is dead and gone he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone his words will be echoed and re-echoed not only in India but across the distant seas and lands.

শুনেছি আদালতের নিস্তব্ধতা এরূপ গভীর হয়েছিল যে, একটি আলপিন পড়লেও নাকি শোনা যেত।

অবশেষে রায় দেবার দিন এল। ১৯০৯ সালের ৬ই মে তারিখে বীচক্রফট্ সাহেব রায় দিলেন। বারীন, উল্লাসকর এবং আরো অনেকেব দোষ প্রমাণিত হয়েছে বলে তাঁদের দণ্ডবিধান হল। বারীন ও উল্লাসকরের হল প্রাণদণ্ড এবং অন্যান্য ক'জন যাঁরা দোষী বলে সাব্যস্ত হয়েছিলেন তাঁদের নানা মেয়াদের সশ্রম জেলের ব্যবস্থা হল। শ্রীঅরবিন্দ এবং বাকিরা বেকসুর খালাস হলেন। পরে আপীলে হাইকোর্টে বারীন ও উল্লাসকরের মৃত্যুদণ্ড নাকচ করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হয়েছিল এবং অন্যান্য কয়েকজনের কারাদণ্ড কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

রায় হয়ে যাবার পরই শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্য যাঁরা খালাস পেয়েছিলেন তাঁরা সোজা চলে এসেছিলেন 'কালীমোহন আলয়' ভবনে যেখানে দাদাবাবু বাস করতেন। যাঁরা যুবক ছিলেন তাঁরা সেদিন কি উৎসাহে বাড়ির দক্ষিণে অবস্থিত বড় পুকুরে মুক্তিস্নান করেছিলেন তা দেখবার মত হয়েছিল। কালীমোহন আলয়ের আকাশ-বাতাস তাঁদের হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। দুপুরবেলা খাবার পর সবাই বাড়ির পেছনের গাড়িবারান্দার উপরের বড় ঘরে বিশ্রাম করতে গেলেন। আমরা বাড়ির ছেলেমেয়েরা এখান দিয়ে, উঁকিঝুঁকি মেরে তাঁদের দেখবার চেষ্টা করছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ সকলের মধ্যেই বসেছিলেন—মিতভাষী এবং চক্ষে সেই সুদূরনিবদ্ধ দৃষ্টি।

তিনি যেন তাঁর চারিপাশের পরিস্থিতি থেকে মনকে গুটিয়ে এনে একান্তভাবে আত্মস্থ হয়ে বসেছিলেন। দু'টি সহকর্মীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার নিষ্ঠুরতা যেন তাঁর মুখমণ্ডলকে দুঃখের কালিমায় লেপে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে নিচু গলায় দু'একটি কথা দাদাবাবুর সঙ্গে বলছিলেন। কী মৃদু কণ্ঠস্বর। উত্তেজনার লেশমাত্র তাতে ছিল না। বিকেল হতে একে একে মুক্ত আসামীরা যে যার বাড়ি চলে গেলেন

সুদীর্ঘদিন জেলে অবস্থানকালেই শোনা যায় শ্রীঅরবিন্দের মনের মধ্যে একটি বিশেষ পরিবর্তন অদৃশ্যে হয়ে আসছিল। জেলের ছোট্ট, নোংরা ঘরে একা বসে বসে তিনি গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করতেন। জেলখানায় সেই জমাট অন্ধকার ভেদ করেই হয়ত তিনি আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে দেখেছিলেন তমসার পরপারে। ধীরে ধীরে তাঁর মনের প্রসার ও বিকাশ হচ্ছিল এবং তিনি নিশ্চয় করেই বুঝেছিলেন যে কেবল বিপ্লবের নীতিতেই তাঁর আত্মিক ক্ষুধা মিটবে না এবং জীবনের চরম চরিতার্থতা ও পরিণতির জন্যে প্রয়োজন হবে একটি বৃহৎ জীবনের আদর্শধারা।

জেল থেকে খালাস পেয়ে তিনি 'কর্মযোগীন' নামে একটি পত্রিকা বের করে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের মর্মার্থ এবং নিজের আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তারই ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। কেবল কর্মযোগীর জীবনদর্শনেই তাঁর আত্মার ক্ষুধা মিটল না। তিনি চাইলেন পরমাত্মার সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে মিলিয়ে দিতে। ইংরেজ রাজত্বে বাস করা তাঁর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠায় কলকাতায় চার বছর থাকার পরে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ফরাসী উপনিবেশ প্রথমে চন্দননগরে এবং শেষে পণ্ডিচেরীতে চলে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। পণ্ডিচেরী বাসকালে তিনি একান্তই আপনার ধ্যান-ধারণা নিয়ে ব্যাপৃত থাকতেন। পণ্ডিচেরীর আশ্রম থেকেই তিনি মাঝে মাঝে আশ্রমবাসীদের কাছে দর্শন দিতেন এবং দেশবাসীদের জন্যে তাঁর

জীবনের জাগ্রত অভিজ্ঞতার কথা লিখে প্রচার করতেন। আগেই বলেছি শ্রীঅরবিন্দের জীবনদর্শন ও আদর্শ সম্বন্ধে কোনো কথা বলার যোগ্যতা আমার নেই। যে উচ্চ পর্যায়ে উঠলে এইরূপ ধীমান মনস্বীর স্বরূপটি হৃদয়ঙ্গম করা যায় সেই উচ্চ চূড়ায় আরোহণের কোনো সুযোগ ও সুবিধে আমার হয় নি। আমি তাঁকে খুব দূরে থেকে ভাসা-ভাসা রকমে দেখে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করেছি সেই বিরাট মহাপুরুষের পায়ে যিনি পরবর্তীকালে পরমাত্মার মধ্যে চির শান্তি, সুখ ও স্বর্গীয় আনন্দলাভ করে নিজের আশ্রমেই দেহরক্ষা করে গেছেন।

মনে পড়ে দেশব্যাপী সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা। কি তুমুল কাণ্ড! ১৯০৫ সালে বড়লাট লর্ড কার্জন কর্তৃক 'বেঙ্গল পার্টিশন অ্যাক্ট' নামক কুকীর্তির ফলে সারা বাংলা উঠল ক্ষেপে। দাঁড়াল তার বিপক্ষে সব শক্তি নিয়ে। চারিদিকে বিক্ষোভের অনল জ্বলে উঠল, জেগে উঠল বাংলার প্রাণ, বাঙালীর দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ। আনল দেশে জনজাগরণের সাড়া। সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাংলার ছোটবড় জ্ঞানীগুণী কত লোক যে। ঝাঁপিয়ে পড়লেন রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল প্রমুখ দিকপালেরা। জোর গলায় আরম্ভ হল বক্তৃতা। মাঠে মাঠে সভাসমিতিতে লোকে লোকারণ্য। সে-সব জনসমুদ্রে আলাদা করে মানুষ আব দেখা যেত না, তাদের কালো-মাথাগুলি সব এক হয়ে দেখাত একটা প্রকাণ্ড কালো আস্তরণের মত। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল এঁদের বক্তৃতার কথা এতই শুনতাম, সকলেই এঁদের বাগ্মিতায় মুগ্ধ চমৎকৃত। এঁদের পৌরুষোদ্দীপ্ত উদাত্ত তেজস্বী কণ্ঠের প্রতিটি বাণী মূর্ত হয়ে উঠত। জ্বলে উঠত প্রেরণার অগ্নিমন্ত্রে, বেজে উঠত আহ্বান গভীর জলদমন্ত্রে,—জনগণমন উদ্‌বুদ্ধ করে টেনে নিয়ে যেত, ভরে দিত সঙ্কল্পের দৃঢ়তায়।

সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলতে শুনেছি, 'Uncrowned King of Bengal'। যখন তিনি শুনলেন—'Bengal Partition Act is almost a settled fact'—তখন দৃঢ়স্বরে বলেছিলেন, 'I shall unsettle the settled fact'—এমনই আত্মবিশ্বাসে তখন এঁরা ভরপুর। সকলের ভিতর যেন বারুদ জমে আছে, শুধু ফাটার অপেক্ষা। আমাদের মধ্যেও সর্বদাই 'কখন কি হয়' এই রকম একটা বুকভরা উত্তেজনা। আমরা তখন ছোট হলে হবে কি, আমাদের বুকেও এই

সবের ঢেউ এসে লাগত। আন্দোলনের বিপুল টান আমাদের ছোট প্রাণকেও টানত। মামারবাড়ির দৌলতে বলতে গেলে আমরা এইসব পরিবেশের মধ্যেই মানুষ। সেখানে সকলকে এসব নিয়ে এত উৎসুক, এত মগ্ন থাকতে দেখতাম, এতই আলোচনা শুনতাম সদাসর্বদাই যে, আমাদের মন তখন অনেকটা গড়ে উঠেছে, তখনই সে বেশ ইংরেজ-বিদ্বেষী। ইংরেজ যে আমাদের পরমশত্রু এবং তাকে হটানোর জন্যেই এত সব কাণ্ড চলেছে, এ বোধ তখন ভালোভাবেই জেগেছে। দেশের প্রতি টান, তার পরাধীনতার জন্যে কষ্ট—দুই-ই জন্মেছে যথেষ্ট পরিমাণে। আমরা তখন—

'স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি'
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুবজ্ঞান'—

গাইতাম বেশ মানে বুঝে। আর হেমচন্দ্রের—

'বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।
চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।'

খুব উত্তেজনার সঙ্গে আবৃত্তি করতাম, এবং নিজেরাও উত্তেজিত হয়ে উঠতাম।

বাংলার ঘরে ঘরে তখন কী উন্মাদনা! কেবল এই সব কথা এই সব ব্যাপারকে ঘিরে রয়েছে মানুষের মন। যে নির্ভরতা, যে দৃঢ়তা, যে অটল সঙ্কল্প তখন দেখেছি আমাদের ছেলেদের মধ্যে সে-সব মনের ছাপ কোনও কালেও মুছে যাবার নয়। পুলিশের অমানুষিক

অত্যাচারে, প্রহারে জর্জরিত, রক্তাক্ত, মৃতপ্রায় অবস্থায়ও, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে, তবুও সঙ্কল্প থেকে তাদের কেউ একতিলও টলাতে বা বিচ্যুত করতে পারেনি।—'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন'—এই মহাভাবে প্রণোদিত তখন তাদের মন।—'যায় যাবে জীবন চলে'—কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, পরোয়া নেই, তোয়াক্কা রাখে না কোনও কিছুর। যুবকেরা, ছেলেরা সব স্বেচ্ছায় ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে বের হয়ে আসছে। রাশি রাশি বিলিতি কাপড় সব পোড়ানো হচ্ছে। বিলিতি লবণ খাব না, বিলিতি জিনিস ছোঁব না, বিলিতি বসন পরব না—এই হল সকলের পণ। স্বদেশী সঙ্গীতে মুখরিত পথঘাট। এই গানটি শুনে শুনে শিখে নিয়ে আমরাও গাইতাম কণ্ঠ ছেড়ে—

দীনের দীন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অনশনে তনু ক্ষীণ।
সে সাহস বীর্য নাহি আর্যভূমে
পূর্ব গর্ব সর্ব খর্ব হল ক্রমে
চন্দ্রসূর্যবংশ অগৌরবে ভ্রমে
লজ্জা রাহু মুখে লীন।
অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেহ না জানিল কেমনে হরিল,
এমনি কৈল দৃষ্টিহীন।
তুঙ্গদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে
সার শস্য গ্রাসে যত ছিল দেশে
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে,
হায় গো, রাজা কি কঠিন!
স্বচ স্বতো পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে
দেশলাইকাঠি তাও আসে পোতে

প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে যেতে
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।
তাঁতী কর্মকার করে হাহাকার
সুতো জাতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর
হল দেশের কি দুর্দিন।
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ,
ধরবে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ
বাকল টেনা ডোর কোপীন।'

(মনোমোহন বসু)

ঋষি বঙ্কিমের মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত বাঙালী 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে উদ্বেলিত করে কাঁপিয়ে তুলছে চারিদিক। আজো কানে বাজে মেদিনীকম্পিত সেই 'বন্দে মাতরম্' রব। মনে হতো প্রাণমন ভেদ করে চলে গিয়ে ভিতরে কোথায় যেন ধাক্কা মারত, ভাবতে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। সেই 'বন্দে মাতরম্ মহামন্ত্রে মায়ের শক্তি যেন জেগে উঠল। সেই মন্ত্রে হল মায়ের অভিষেক। 'মা' ডাকের এই নতুন আস্বাদে নতুন রসে অনুপ্রাণিত বাঙালী মাতৃপূজার বেদীমূলে দাঁড়াল এসে আপন জীবন-অঞ্জলি হস্তে। প্রবল উদ্যমে চলল উৎসর্গের পালা।

'তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে

শুনতে শুনতে মনে হতো দেশমাতা বঙ্গজননীকে দেখছি যেন দুর্গাপ্রতিমার মূর্তিতে।

বাঙালীর মত সমস্ত অন্তর ঢেলে অমন প্রাণভরে প্রাণ মাতিয়ে বন্দে মাতরম্ বলতে আমি আর কখনও কোনও জাতিকে শুনিনি। 'বন্দে মাতরম্' গান, শুরুতে আমরা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সুর ছাড়াও অন্য সুরে গাইতে শুনেছি। সে সুরের কিছুটা এখনও আমার মনে আছে। কংগ্রেসাদিতে রবীন্দ্রনাথের সুরেই গাইতে শুনেছি, আমরাও গেয়েছি ওই সুরেই। তারপর কবে থেকে যেন রবীন্দ্রনাথের সুরেই 'বন্দে মাতরম্' গাওয়ার প্রচলন হয়।

এই আলোড়নের অঙ্গবিশেষে 'রাখিবন্ধন' এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ হলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা। যখন প্রচার করা হল যে, ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ সাল (৩০শে আশ্বিন, ১৩১২) আইনের সাহায্যে বাংলাদেশকে বিভক্ত করা হবে, তখন রবীন্দ্রনাথ ওই ৩০শে আশ্বিন দিনটিকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করবার জন্যে ওই দিনেই—

'ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই'

এই মহামন্ত্রে 'রাখিবন্ধন' প্রচলিত করেন। রাখিবন্ধনের উদ্দেশ্য এই যে, আইনের সহায়তায় বাংলাদেশকে ভাগ করলেও বিধির বিধান মতে বাংলাদেশ এক, অবিচ্ছিন্ন,—এইটেই বিশেষ করে মনে রাখা ও প্রচার করা।

'বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান
মোদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এতই অভিমান'

গানটি কবির এই সময়ের রচনা।

গানটি গাইতে তখন খুব শোনা যেত। রাখিবন্ধনের ব্যবস্থা দিয়েই শুধু রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হননি। নিজে ছিলেন তার মধ্যে। শুনেছিলাম সকালের কোনও শোভাযাত্রার পুরোভাগে তিনি স্বয়ং ছিলেন এবং শেষপর্যন্ত উপস্থিত থেকে জাতিধর্ম নির্বিচারে প্রত্যেকের হাতে রাখি বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই বিশেষ দিনেই সায়াহ্নে আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে যে বিরাট সভা হয় সেখানেও উপস্থিত ছিলেন।

শেষ মুহূর্তে আনন্দমোহন অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে স্ট্রেচারে করে সেই সভায় নিয়ে আসা হয়। তাঁর অভিভাষণ বাংলা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সভাপতির মূল ইংরেজী লেখাটি তাঁর হয়ে অন্য কেউ পড়েছিলেন।

যতদূব মনে পড়ে শুনেছিলাম যে, সেই সভাশেষে সেখান থেকেও রবীন্দ্রনাথ আবার সান্ধ্যমিছিলের সঙ্গে বের হন। রাখিবন্ধনের সেই দিনটির কথা কখনও ভুলব না, চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে আছে, এবং থাকবে চিরকাল। সব গৃহে সেদিন অরন্ধন পালন করা হয়। আমরাও ফলার করেছিলাম দৈ চিড়ে ইত্যাদি খেয়ে। কী যে আনন্দ পেয়েছিলাম সমস্ত দেশবাসীর সঙ্গে একত্রে এই জিনিসটি পালন করার মধ্যে। রাখিবন্ধনের আগের দিন আমরা আমাদের ছোট পিসিমাদের (ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের পত্নী) কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে বাত্রে ছিলাম। এই বাড়ির সামনেই রাস্তাব উপর খোলা প্রকাণ্ড ঝুলানো বারান্দা ছিল—যেমন চওড়া, তেমনি লম্বা। এইখান থেকে দেখেছিলাম, ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতে রাখি হাতে দলে দলে ছেলেরা শোভাযাত্রা করে গাইতে গাইতে চলেছে, কণ্ঠে তাদের ভাবাবেগের উষ্ণতা। কোথাও শোনা যাচ্ছে তারা গাইছে—

'বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন ;
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন, এক হউক, এক হউক, এক হউক,
হে ভগবান।' (রবীন্দ্রনাথ)

কোথাও শোনা যাচ্ছে—

'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
মোদেব ততই বাঁধন টুটবে,
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।'

(রবীন্দ্রনাথ)

কোথাও দূর থেকে ভেসে আসছে—

'আয় রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই
পরের জিনিস কিনব না
যদি মায়ের ঘরের জিনিস পাই।'

(রজনী সেন)

বীরদর্পে সব গেয়ে চলেছে। এমনতর কত গান কত শোভাযাত্রা কত মিছিল যাচ্ছে আসছে। আমাদের সে-সব দেখার কি আগ্রহ! বার বার দৌড়ে যাচ্ছি আর আসছি। আমাদের রক্তই কি কম গরম হয়ে উঠেছিল? দিকে দিকে শোনা যাচ্ছে দেশমাতৃকার বন্দনাসঙ্গীত নানা সম্মিলিত কণ্ঠে, সুরে। তাদের আকুলকরা গানে আমাদের পাগল করে দিচ্ছে। ইচ্ছে হতো ছুটে চলে যাই ভিড়ের মাঝে, তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইতে গাইতে পথে নেমে পড়ি। কিসের একটা অসম্ভব টানে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে, ঘরে থাকা যেন দায়—

'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে, ডাক দিয়ে সে যায়,
আমার ঘরে থাকাই দায়।'—

রবীন্দ্রনাথের এই লাইন দুটির মত ঠিক অবিকল মনের অবস্থা। সকলের হাতেই রাখির সূত্র। যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে রাখি বেঁধে দিচ্ছে—আমরাও যাকে সামনে দেখছি তাকেই রাখি পরিয়ে দিচ্ছি। সকলের মন-প্রাণ যেন একই সুরে বাঁধা, একই সূত্রে গাঁথা, একই ভাবে বিভোর,—কি যে অভাবনীয় এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, না দেখলে বোঝানো যায় না। আমার মন কেবলই ঘুরে বেড়াতে লাগল গানের দলের পিছনে। যেন নেশার মত কী একটা পেয়ে বসেছে। আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে সেই সব গান কতবার যে গাইছি। কখনও কণ্ঠ ছেড়ে, কখনও আপন মনে। উৎসাহের যেন শেষ নেই। বাংলার নগরে নগরেই শুধু নয়, গ্রামে গ্রামান্তরে, সর্বত্র সবখানে এই সর্বজনীন মহোৎসব মহাসমারোহে

উদ্‌যাপিত হয়েছিল। পরেও, কয়েক বছর ধরে প্রতি বছরই বাংলার ঘরে ঘরে রাখিবন্ধন পালন করা হতো। রবীন্দ্রনাথের কত নবরচিত গানই সে-সময় শোনা যেত। সবই প্রায় আমরা শিখে ফেলেছিলাম। তরে মধ্যে বিশেষ করে এই গানগুলি খুব বেশি গাইতাম—

'আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি'
'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে'
'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা'
'এবার তোর মরাগাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী'
'আমবা পথে পথে যাবো সারে সারে'
'আমরা মিলেছি আজ মায়েৰ ডাকে'
'একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক, জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক'

কার লেখা জানি না, এই গানটি—

'চল চল চল বে ও ভাই জীবন-আহবে চল
বাজবে সেথায় বণভেরী আসবে প্রাণে বল—চল চল চল।'

এবং 'চল রে সবে ভারত সন্তান'—এই গানটি প্রায়ই গাওয়া হতো। সরলা দেবীর এই গানটিও খুব চলত। আমরাও গাইতাম—

'বন্দি তোমায় ভারতজননী বিদ্যামুকুটধারিণী,
বরপুত্রের তপ-অর্জিত গৌরবমণিমালিনী'—

রাখিবন্ধনের আগেই কি পরে ঠিক মনে নেই, আমরা তখন পুরুলিয়ার রয়েছি। বঙ্গদেশে নানা জায়গায় সভা-সমিতি ও সঙ্গে সঙ্গে ধরপাকড় মারধর সব বেশ পুরোদমেই চলেছে। এ সময়ে মনে আছে একদিন আমাকে কোলে করে নিয়ে এক বিরাট সভার মাঝখানে একটি টেবিলের উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। আমি গাইলাম—

'আমরা নেহাত গরীব আমরা নেহাত ছোট,
তবু আছি সাত কোটি ভাই জেগে ওঠো।
জুড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান,
বিদেশে না যায় ভাই গোলারি ধান,

মোটা খাব ভাই রে পরব মোটা
মাখব না ল্যাভেণ্ডার চাইনে অটো।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে
আমরা রব কি উপোসী ঘরে শুয়ে।
হারাস নে ভাই রে এমন সুদিন
মায়ের পায়ের কাছে এসে জোটো।
ঘরের দিয়ে আমরা পরের মেঙ্গে
কিনব না ঠুনকো কাঁচ যায় যে ভেঙ্গে,
শোন্ বিদেশী, আমরা বুঝেছি সব
তোমরা খেল্না দিয়ে মোদের সোনা লোটো।'

(রজনী সেন)

আমার বয়েস তখন আট বছর, ফ্রক পরি। সভাসুদ্ধ লোক অবাক হয়ে দেখছিল ফ্রকপরা মেয়ের টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে ওইরকম সপ্রতিভভাবে গান গাওয়া। সভাশেষে অনেকেই এগিয়ে এল পরিচয় জানবার জন্যে। যিনি কোলে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনিই কি সব বললেন?

১৯০৫ সালের এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির প্রায় সকলেই যোগ দিয়েছিলেন। মামাবাবু [দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস], নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ, দানবীর রাজা সুবোধ মল্লিক, আনন্দমোহন বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, পি. মিত্র, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি গণ্যমান্য বরেণ্য ব্যক্তিরা অনেকেই ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ দৃশ্যত থাকলেও শুনেছি ভিতরে ভিতরে তিনি পূর্ণোদ্যমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন পুরোভাগে কর্ণধাররূপে কলম ধরে। স্বদেশী যুগের ইতিহাসে স্বাদেশিকতার স্তম্ভরূপে যাঁর নাম খোদিত হয়ে থাকবে, তিনি হচ্ছেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, ব্রিটিশ-শক্তি যাঁকে পরাস্ত করতে পারেনি, পারেনি স্পর্শ করতে। যিনি ব্রিটিশরাজের সমূহ শক্তিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে

দাঁড়িয়েছিলেন নিজের অসামান্য আত্মবলে। কত শুনতাম তখন এই ব্রহ্মবান্ধবের কথা, কি অদ্ভুত মানুষ ছিলেন তিনি। কি তেজস্বিতায়, কি বলিষ্ঠতায়, কি নির্ভীকতায় এঁর তুলনা ছিল না। জ্ঞানে, গুণে, পাণ্ডিত্যে, সকল বিষয়েই এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মানুষটির তল কেউ যেন আর খুঁজে পেত না। নিজে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে লণ্ডনে বেদান্ত প্রচাব কবেছিলেন। আর এই সবের ভিতর দিয়ে তাঁর প্রকৃতিগত, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যেব প্রকাশ দেখা যেত।

ব্রহ্মবান্ধবের প্রকাশিত 'সন্ধ্যা' কাগজ তখন খুব সমাদৃত, খুব প্রভাব বিস্তার কবেছে চারিদিকে। এই কাগজে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ তিনি অকুণ্ঠে অকপটে চালিয়ে যেতেন। তাঁর জ্বালাময়ী ভাষায় ছাঁকা ছাঁকা বাক্যপ্রয়োগ ইংরেজের গাত্রদাহের কাবণ হতো। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ আইনের ব্যাপার তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাতে লাগলেন লেখার ছত্রে ছত্রে আগুন ঢেলে দিয়ে, সেই অগ্নিস্রাবের সহায়তায় জনসাধারণের ভিতর আগুন জ্বলে উঠতে দেরি হল না। 'সন্ধ্যা' পড়বার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের দিকে তাঁর অগ্নিবর্ষী লেখনী বড় কম কাজ করেনি। জননী জন্মভূমির মুক্তিপূজায় তিনিও অন্যতম পুরোধা। দৃপ্ততেজে তিনি বলেছিলেন যে, রাজশক্তির ক্ষমতা নেই তাঁকে কিছু করতে পারে। পরে যখন রাজদ্রোহী বলে রাজদ্বারে তিনি অভিযুক্ত হন তখনও তেমনি জোরের সঙ্গে, তেমনি নিশ্চিত সুরেই আবারও তাঁর মুখে নিঃসৃত হয় এই বাণী—'ইংরেজের সাধ্য নাই আমায় জেল দেয়।'—চিত্তরঞ্জন তাঁর পক্ষ সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেই মামলা তিনি শুরুই কেবল করেছিলেন, শেষ আর তাঁকে করতে হল না। এই বাক্‌সিদ্ধ মানুষটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে ক্যাম্প্‌বেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং সেইখানেই তিনি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হলেন। ইংরেজের আইন তাঁকে কিছুই করতে পারল না। প্রবল শক্তিসম্পন্ন ব্রিটিশরাজের

সকল গর্ব খর্ব করে তাদেরই সামনে দিয়ে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে ব্রহ্মবান্ধব চলে গেলেন তাদের নাগালের বাইরে এই বার্তা ঘোষণা করে—

'তোর হাতের ফাঁসি রইল হাতে
আমায় ধরতে পারলি না।'

অদ্ভুত জীবন। অদ্ভুত মৃত্যু! শ্রীঅরবিন্দ কথা প্রসঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি নীরদবরণের লিখিত 'শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা' বই থেকে :

"তখন বাংলায় তিনটি কাগজ চলিত ছিল : যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দে মাতরম্। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন সন্ধ্যার সম্পাদক, ইনি আর একজন মহৎ লোক। এমন বিচক্ষণ লেখক ছিলেন যে, সরকার তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ খুঁজে পেত না।"

আমাদের মামাবাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা ছিল, কিন্তু তাঁকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। দাদামশায়, মামাবাবু, মামিমা, মা, মাসিমা ওঁদের সবাইকে কি অগাধ শ্রদ্ধা সহকারে ব্রহ্মবান্ধবের সম্বন্ধে কথা কইতে শুনতাম। বেশ মনে আছে, আমাদের রসা রোডের বাড়িতে নানা আলোচনার মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করত।

শ্রীঅরবিন্দ যেদিন বরোদার অত বড় সম্মানের চাকরি ছেড়ে দিয়ে শুধু নামমাত্র বেতনে কলকাতার নব-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয় 'ন্যাশানাল কলেজ'-এর প্রিন্সিপাল হয়ে এলেন, সেদিন তাঁর এত বড় ত্যাগের মহত্ত্বে বিস্ময়ে স্তম্ভিত সমস্ত দেশবাসী সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় তাঁর কাছে শির নত করল। এই বিরাট, মহান ত্যাগের ভিতর দিয়ে হল তাঁর সঙ্গে তাঁর দেশবাসীর পরিচয়। শ্রীঅরবিন্দের নাম সেই থেকে আমাদের মনে গাঁথা হয়ে রইল। তিনি যে সম্পূর্ণ অন্য জগতের, অন্য পর্যায়ের, অন্য জাতের মানুষ, তা ছোটবেলা থেকেই আমরা শুনে এসেছি ও সেই চোখেই তাঁকে দেখতে শিখেছি। রাজা সুবোধ মল্লিকের অনুরোধে, পরে তিনি 'বন্দে মাতরম্' দৈনিক কাগজের

সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। বিপিন পালও তাঁর সঙ্গে একত্রে এই কাগজ পরিচালনা করেন। এই 'বন্দে মাতরম্' কাগজে যখন শ্রীঅরবিন্দের লেখার পর লেখা বের হতে লাগল তখন তাঁর সম্বন্ধে সকলের বিস্ময় বেড়েই চলল। সকলের মুখে মুখে তাঁর নাম, তাঁর লেখার কথা—কি তার ভাব, কি তার গভীরতা, কি ওজস্বিনী ভাষা, যুক্তি, সবকিছু সম্বন্ধে কি অদ্ভুত জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি ইত্যাদি। সকল বিষয়েই তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা, শক্তি, ক্ষমতা সকলের সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠল। প্রকাশ পেল এমন একটি মানুষ যার মত আর 'লাখে না মিলল এক'।

শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব শুধু বাঙালী জাতির জীবনে নয়, সারা ভারতবর্ষে শিকড় বিস্তার করেছিল। দেশের চিত্ত জয় করতে তাঁর বিলম্ব হয়নি। 'বন্দে মাতরম্' কাগজে তাঁর লেখা পড়বার জন্যে মানুষ পাগল। বাংলাদেশবাসীর বিশেষ করে যুবকমণ্ডলীর দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করতে চাইলেন শক্তিসাধনার দিকে,—শক্তি চাই, দেশোদ্ধারের প্রকৃত আদর্শের দিকে, মুক্তিসাধনার বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের দিকে। তিনিই প্রথম বলেন—শুধু স্বাধীনতা নয়, চাই ইংরেজের অধীনতাবর্জিত পূর্ণ স্বাধীনতা। বহু জায়গায় তিনি বক্তৃতাদি দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। শুধু কলকাতায় নয়, কলতাতার বাইরেও অনেক জায়গায়। সে-সব অসাধারণ সারগর্ভ বক্তৃতায় যে-সব বস্তু তিনি বিতরণ করতে লাগলেন তা সর্বদেশে সর্বকালেই সুদুর্লভ, বরং সর্বদেশের সর্বকালের অক্ষয় সম্পদ। শ্রীঅরবিন্দ শুধু নেতা ছিলেন না, ছিলেন দ্রষ্টা, যোগী। তাঁর নির্দিষ্ট পথে ভারতবাসী যদি চলতে পারত, তবে ভারতমাতাকে এমন অঙ্গহীন অবস্থায় আজ আমাদের দেখতে হতো না।

'বন্দে মাতরম্' কাগজে রাজদ্রোহিতামূলক কিছু লেখা প্রকাশিত হওয়ায় সম্পাদক হিসেবে শ্রীঅরবিন্দ অভিযুক্ত হন (বোধ হচ্ছে ১৯০৭ সালেই কোনও মাসে)। কিন্তু তিনিই যে সম্পাদক তার কোনও প্রমাণ না পাওয়ায় তাঁকে ছেড়ে দিতে হল। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের নিজের উক্তি, নীরদবরণের পুস্তকটি থেকে তুলে দিচ্ছি—

“নীরদ : সরকার আপনাকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করেনি ?

শ্রীঅরবিন্দ : কি করে করবে ? তেমন কোন আইন ছিল না। প্রেসেরও বেশি স্বাধীনতা ছিল। তাছাড়া, অভিযোগ আনার মত কাগজে কোন লেখা থাকত না। Statesman বলত যে, কাগজ রাজদ্রোহসূচক লেখায় ভর্তি অথচ এমন কৌশলে লেখা যে, সম্পাদককে গ্রেপ্তার করার উপায় নেই। সম্পাদকের নামও তো ছাপান হতো না ; কাজেই, শুধু প্রিণ্টারদের গ্রেপ্তার করতে পারত, কিন্তু একজন গেলে অন্যরা তার স্থান নিত।

পরে সহকারী সম্পাদক, উপেন ব্যানার্জি কতকগুলি চিঠি প্রকাশ করে, তার জন্যে রাজদ্রোহে আমি অভিযুক্ত ও গ্রেপ্তার হই, কিন্তু প্রমাণের অভাবে খালাস পাই।”

যাই হোক, এই ব্যাপারে আদালতে বিপিনচন্দ্র পালের ডাক পড়ে। উদ্দেশ্য, সম্পাদক সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে যদি কিছু জানা যায়। বিপিন পাল চিত্তরঞ্জনের কাছে গিয়ে তাঁর পরামর্শ চাইলেন। চিত্তরঞ্জন তাঁকে তিনটি প্রস্তাব দিয়ে বলেন, (১) ‘হয় আপনাকে পরিষ্কার বলতে হবে যে, অরবিন্দই সম্পাদক, বলা বাহুল্য তাহলে অরবিন্দের জেল হয়ে যাবে, বন্দে মাতরম্ কাগজও তাহলে উঠে যাবার সম্ভাবনা ষোল আনা এবং দেশের যে কাজ শুরু হয়েছে তা যে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই ; (২) নয়ত আপনাকে বলতে হয়, অরবিন্দ সম্পাদক নন, সেটা হবে মিথ্যে কথা বলা’—ব’লে একটু ইতস্তত করে শেষে সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন—(৩) ‘আর এক হতে পারে, আপনি যদি এই সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে আদালতে একেবারে অস্বীকার করেন, জেনে রাখা ভালো যে, এর ফলে আপনার কিন্তু জেল হবে।’—বিপিনবাবু যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হলেন। তাঁকে জেরা করতেই তিনি তাঁর জলদগম্ভীরস্বরে বললেন, ‘এই বিষয়ে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অস্বীকার করি।’ প্রশ্নকর্তারা তাঁর এই উত্তর বোধহয় আশা করেন নি।

বিপিনচন্দ্রের ছয়মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হল। তাঁর সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ যা বলেছেন তাও এইখানে লিপিবদ্ধ করছি নীরদবরণের সেই বইটি থেকে।—

'বিপিন পাল ছিলেন মস্ত বক্তা। সে-সময় তাঁর বক্তৃতায় আগুন জ্বলত। তাকে এক ধরনের অবতরণই বলতে পার। পরে তাঁর সেই বাকশক্তি হ্রাস পায়।"

১৯০৮ সালের সেদিন ছিল ১লা মে। হঠাৎ বারুদের আগুনের মত খবর ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে—মজঃফরপুরে বোমা পড়েছে, দুজন ইংরেজ মহিলা নিহত। এই হত্যার অভিযোগে ক্ষুদিরাম বসু ধৃত। জানা গেল প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম দুজনে ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে যে গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করেন, সে গাড়িতে আরোহী ছিলেন নিরীহ দুটি ইংরেজ মহিলা, মিসেস কেনেডি ও তাঁর কন্যা। ফলে তাঁহাদের মৃত্যু ঘটে। সংবাদ প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে হুলুস্থুল পড়ে গেল—ক্ষুদিরাম বোস ধরা পড়েছে—সে যে কি উত্তেজনা, উন্মত্ত অবস্থা! বাঙালী ক্ষেপে আগুন, ইংরেজ-বিদ্বেষে যেন ফেটে পড়বার মত। উষ্ণতার সীমা হারিয়ে বার বার 'বন্দে মাতরম্‌'-এর উদাত্ত ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে যেন তারই প্রতিবাদ ঘোষণা করে বেড়াতে লাগল।

ক্ষুদিরাম বসু মেদিনীপুরের ছেলে। বয়েস মাত্র সতেরো বছর। বয়েস শুনে আমরা যেন কেমন হয়ে গেলাম—এত ছোট ছেলে! এই বয়সেই তৈরী হয়ে এগিয়ে এসেছে মরণের মুখোমুখি হতে! জীবন দিয়ে জীবন নেবার কঠিন ব্রতে এমন অদম্য উৎসাহে কৃতসঙ্কল্প এই বয়সের এইসব ছেলেরা! ভাবলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। দেশের জন্যে এরা করতে না পারে হেন কাজ নেই; এই দেশের জন্যেই এরা গৃহসুখ সব জলাঞ্জলি দিয়ে ঘরকে করেছে পর, আর পথকে করেছে ঘর। ধন্য এরা, এরাই দেশের রত্ন, দেশের গৌরব।

চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে, প্রাণের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে যতবার শুনছি ছেলেটির ফাঁসি হয়ে যাবে। ইংরেজের আইন ওকে রেহাই দেবে না। মনের মধ্যে এই সব কত কথাই তোলপাড় করছে।

পরের দিন সকলের বিস্ময়কে অভিভূত করে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে স্তব্ধ করে, অকস্মাৎ বজ্রঘাতের মত খবর এল—বোমা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সন্দেহে শ্রীঅরবিন্দ গ্রেপ্তার প্রায় তিরিশজন সহকর্মীসহ। এই খবর দেশবাসীর কাছে বোমা ফাটার মতই সাংঘাতিক। জানা গেল, পুলিশ-প্রহরেরা নাকি শ্রীঅরবিন্দের গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ি থেকে তাঁকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে গেছে। তাঁর মত মানুষকে হাতকড়া পরাবার খবরে সকলে যত ক্ষুণ্ণ তত চটে লাল। সভ্যজগতে, সভ্যসমাজে, সভ্যতার যুগে, সভ্যতাগর্বে এত গর্বিত ব্রিটিশ জাতির এ হেন মার্জিতরুচির এবং ভদ্রতার মাত্রাজ্ঞানের কথা ঘৃণা ও তিক্ততার সঙ্গে বিষ বর্ষণ করে সকলের মুখে মুখে ফিরে বেড়াতে লাগল।

শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মীদের মধ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুধীরকুমার সরকার, নলিনীকান্ত গুপ্ত, শচীন সেনগুপ্ত, সুশীল সেন, হেমচন্দ্র দাস, শৈলেন বসু, ইন্দুভূষণ দত্ত প্রভৃতি অন্যান্য আরো যাঁরা এই সঙ্গে ধরা পড়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেককে ৩২ নম্বর মুরারিপুকুর লেনের বাগান থেকে, এবং কাউকে কাউকে 'নবশক্তি' কার্যালয় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সমস্ত শহরের মন ঝুঁকে পড়ল এই দারুণ ব্যাপারের উপর। দফে দফে কত রকম কত কথা ভেসে আসছে, খবরাখবরের জন্যে সব লালায়িত, পাগল যেন। চলাফেরায় প্রকাশ পাচ্ছে তাদের উদ্‌ভ্রান্ততা যেন শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বাড়িতে কিন্তু একটা বিশেষ থমথমে ভাব ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল। কারো মুখে কথা নেই, মামাবাবু যেন নির্বাক-বেদনার পাষাণমূর্তি। সকলেরই চোখে-মুখে ফুটে আছে অপার বিস্ময়। আর দীর্ঘশ্বাসে

স্পষ্ট হয়ে উঠছে ব্যথাভরা ম্রিয়মাণ অন্তরের অন্তহীন উদ্বেগের চাপ। এমন সব সংবাদের জোর ধাক্কা সামলাতে-না-সামলাতে তার পরের দিনই আবার আরেক সংবাদ ঘোষিত হল—

মোকামাঘাট স্টেশনে ধরা পড়বার উপক্রম হতেই প্রফুল্ল চাকী নিজের রিভলভারের গুলীতে নিজেকে খতম করে দিয়েছে।

এ খবরও দেশবাসীকে টেনে নিয়ে গেল আরেক উত্তেজনার স্রোতের মুখে। সকলের চিত্ত আলোড়িত করে চলতে লাগল তুমুলভাবে উত্তেজনার পর উত্তেজনা। শুনেছি বিপ্লবীদের নিয়ম, ধরা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মহত্যা করে নিজেকে শেষ করে দেওয়া। প্রফুল্ল চাকীর এই কাজে প্রকাশ পেল বিপ্লবীরা যথেষ্ট সুপরিচালিত। কাজেই, ইংরেজের আতঙ্ক বেড়ে যাবারই কথা। যাই হোক, মাত্র দু-তিন দিনের মধ্যে এমন সব কাণ্ড ঘটে যাবার আকস্মিকতায় মনে হল একটা মহাপ্রলয় হয়ে গেল যেন,—এই রকমের আবহাওয়া তখন চারিদিক ঘিরে রয়েছে।

'আলীপুর সেন্‌ট্রাল জেল'-এ হল বোমা ষড়যন্ত্রের বিচারাধীন আসামীদের সকলের স্থান। শ্রীঅরবিন্দ কারাগারে। মনে পড়ে যায় কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের কথা। কবিদের বলা হয়ে থাকে দ্রষ্টা। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,—

'দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূতে, বলো, কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে? বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা।'

লিখলেন,—

'বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান

মহাতীর্থ যাত্রীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর।'

মজঃফরপুরে বিচারের পরে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়ে গেল। অন্তরে যে কি কান্নাই কেঁদে বেড়াতে লাগল ওই ছেলেটিকে ঘিরে। মনে আছে গভীর রাতের নীরব অন্ধকারে বসে তার ভালোর জন্যে ভগবানকে কতই ডেকেছিলাম। মন থেকে কিছুতেই সরাতে পারিনি তার জীবনের ওই নিষ্ঠুর সমাপ্তির কথা।

স্বদেশের মুক্তিপূজায় এই হল প্রথম বলি ফাঁসির যূপকাষ্ঠে। ছেলেটি নাকি হাসতে হাসতে গিয়ে উঠেছিল ফাঁসির মঞ্চে। কবি নজরুলের গানটি মনে পড়ে যাচ্ছে—'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান'—তাঁদের মধ্যে এই সতেরো বছরের বালক ক্ষুদিরাম হলেন অগ্রণী। 'প্রবাসী' পত্রিকায় যখন তাঁর ছবি প্রকাশিত হয়, তখন দেখেছিলাম সরলতামাখা ঐ মুখে স্বর্গীয় পবিত্রতার শুভ্রজ্যোতিঃ। কতদিন পর্যন্ত ঐ মুখখানি চোখের সামনে কেবল ভেসে উঠত। আজও ভুলিনি তাঁকে, ভোলা কি যায়!

আরম্ভ হল আলীপুরের বিখ্যাত বোমা ষড়যন্ত্রের মামলার বিচার 'Alipore Bomb Case' নামে। এই মামলা বোধ করি প্রায় একবছর চলেছিল। প্রথমে জজকোর্টে, পরে আলীপুর সেশন কোর্টে এবং তার পরে হাইকোর্টে। আমরা শুনলাম, আলীপুরে যে বিচারপতির এজলাসে এই মামলার শুনানী আরম্ভ হয় তিনি বিলাতে শ্রীঅরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন। নাম বিচক্রফ্‌ট (Beachcroft)। শুরুতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী ব্যোমকেশ চক্রবর্তী কিছুকাল শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ নিয়ে এই মামলায় অগ্রসর হন। পরে মামাবাবুর হাতে আসে এই মামলা পরিচালনার গুরুভার। তিনি সানন্দে সে-ভার মাথা পেতে নিলেন। আইন ব্যবসায়ে তখনও তাঁর তেমন নাম

হয়নি। তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন যথেষ্ট নামকরা সরকার-পক্ষের আইনজীবী আরড্‌লিনটন।

এ মোকদ্দমার পিছনে তখন মামাবাবুকে যে কি অমানুষিক পরিশ্রম করতে দেখেছি। দিন নেই রাত্রি নেই, আরাম নেই বিশ্রাম নেই, আহার-নিদ্রা ভুলে একমনে তিনি আইনের গাদা গাদা পুস্তকের তলে তলিয়ে, কী যেন খুঁজে ফিরতেন—'ক্ষ্যাপা খুঁজে ফিরে পরশপাথর'—মামাবাবুকে দেখলে মনে হতো আইনের সেই পরশপাথর খুঁজে বার করবার চেষ্টায় তিনি বদ্ধপরিকর। যার স্পর্শে শ্রীঅরবিন্দ এঁদের মুক্তি হবে অনিবার্য। সে-সময়ে আমরা দেখেছি কত রাত্রি ভোর হয়ে গেছে একইভাবে বসে তিনি কাজ করে চলেছেন, খেতে বা শুতে আসবার কথাও তাঁর মনে নেই। এই মোকদ্দমা ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। অনেক সময়ে দেখতাম উপরের টানা বারান্দায় বহুক্ষণ ধরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন, সময়ের জ্ঞান নেই, চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি, মুখের ভাব দেখে মনে হতো তিনি এ রাজ্যে নেই। চোখের সেই দৃষ্টি আর মুখের সেই ভাব আজও যেন স্পষ্ট দেখতে পাই।

এই সময়ে আদালতে তাঁর সওয়াল যাঁরাই শুনেছেন তাঁরাই একবাক্যে বলেছেন যে, যে অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে, অদ্ভুত দক্ষতা বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি আইনের সব কূট জটিল যুক্তিতর্কজাল একে একে খণ্ডন করে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলতেন, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। এক-আধদিন নয়, দীর্ঘ দশ মাস ধরে অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়ে এই অসাধ্যসাধনের তপস্যায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। আদালতের ইতিহাসে আইন বিশ্লেষণের সূক্ষ্মদর্শিতার সে এক সমুজ্জ্বল অধ্যায়। আইনে তাঁর এ হেন জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে সে-সময় আদালতের কোন এক বিচারপতি তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন 'Maker of Criminal Law'.

নলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁর 'স্মৃতির পাতা'য় লিখেছেন—"আমরা সব প্রত্যহের মত বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করে বসেছি—এমন সময় হঠাৎ

কোর্টকক্ষ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল, চিত্তরঞ্জনের কণ্ঠ ধীরে ধীরে উঠে চলল গমকে গমকে যেন—আমরা সব দাঁড়িয়ে উঠলাম, উদগ্রীব উৎকর্ণ নিবাত নিষ্কম্প—শুনলাম চিত্তরঞ্জন দেবাদিষ্ট হয়ে যেন বলে চলেছেন —'He stands not only before the bar of this Court, but stands before the bar of the High Court of History.—Long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as a poet of patriotism, as the prophet of nationalism, and the lover of humanity. Long after he is dead and gone, his words will be echoed and re-echoed, not only in India, but across distant seas and lands'.

বিনা সর্তে সসম্মানে শ্রীঅরবিন্দদের তিনি মুক্ত করে নিয়ে এলেন। আমার মনে আছে আমরা গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম, দেখলাম পর পর কতগুলি ঠিকাগাড়ি ঢুকল ফটকের ভিতরে। বুঝলাম, শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা মুক্তি পেলেন, তাঁরা সব এলেন। বাড়ির ভিতরে মামিমা, মা-মাসিমাদের সব ব্যস্তভাবে চলাফেরা আরম্ভ হয়ে গেছে। এই মোকদ্দমার অনেক খবর আমাদের ছোটমামা সরবরাহ করতেন, কেননা, তিনিও সবে ব্যারিস্টার হয়ে এসেছেন ও আদালতে যেতে শুরু করেছেন। যেদিন মোকদ্দমার রায় বের হবার কথা, মনে আছে সেদিন বাড়িসুদ্ধ সকলের সে কী অবস্থা। উৎকণ্ঠা যেন চরমে উঠেছে, সব শক্ত হয়ে বসে আছেন। ছোটমামাই প্রথমে শুভসংবাদ যেই দিলেন যে, শ্রীঅরবিন্দ বিনা শর্তে মুক্তি পেয়েছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে সে কি আনন্দের সাড়া পড়ে গেল, সকলেই উল্লসিত, আনন্দে অধীর, আত্মহারা। রসা রোডের বাড়ি যেন উৎসবানন্দে পরিপূর্ণ, মুখরিত হয়ে উঠল। আমরাও সেই বিজয়োল্লাসে মেতে হৈ-হৈ করে সারাটা বাড়ি মাথায় করলাম।

এই মামলা যখন চলছে তখন হঠাৎ আলীপুর জেলে একটা ভীষণ চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। সত্যেন এবং কানাই দুজন গুলী করে নরেন গোঁসাইকে হত্যা করে। এই নরেন গোঁসাই সরকারের সাক্ষী হয়। তাই বিশ্বাসঘাতককে শুধু চিবতরে সরিয়ে দেবার জন্যেই নয়, শুনেছি যাতে সে কোর্টে সাক্ষ্য দিতে না পারে তাই জন্যে তাকে তাড়াতাড়ি সরাবার এই ব্যবস্থা। কেননা, কোর্টে জেরা করতে না পারলে নাকি সাক্ষ্যেব কোন মূল্য থাকে না। জেলে এত সতর্ক পাহারার মধ্যেও এমন অসম্ভব কাণ্ড কি করে সম্ভব হল, জেল-কর্তৃপক্ষরা সকলেই থরহরি কম্প। সকলের মনেই এই প্রশ্ন, মুখে এই কথা। ওই রুগ্ন রোগা ছেলে দুটির ভিতর কেমন করে এমন বজ্রেব আগুন যে থাকতে পারে তাই দেখে ইংরেজ-শাসকদের ধারাল বুদ্ধি যেন বোকা বনে গেল। কত ফিকির, কত ফন্দি করেও পুলিশের লোকেরা এদের কাছ থেকে বাব করতে সক্ষম হয়নি রিভলভার এরা কোথায় পেল, কে দিল। আজও অবধি এ প্রশ্ন অনেকের মনেই আছে। আমরা শুনেছিলাম কাঁঠালের মধ্যে ভরে কেউ পার করেছিল। ননিলীকান্ত গুপ্ত তাঁর 'স্মৃতিব পাতা' বইটিতে এ বিষয়ে সব বেশ পরিষ্কার খোলাখুলিভাবেই লিখেছেন, রিভলবার ওঁরা কেমন করে ও কোথাও পেয়েছিলেন। তাঁর 'স্মৃতির পাতা' থেকে আর একটুখানি তুলে দিচ্ছি—"পুলিশের বড়কর্তা থাকতে না পেরে শেষটা কানাইকে জিজ্ঞাসা করলেন—কানাইয়ের ফাঁসির হুকুম হয়ে গিয়েছে, দিন গুণছে তখন—'এখন তো সব শেষ, এখন বললে আর দোষ কি? দেখাও না তোমার সৎসাহস, বলত কোথায় পেলে পিস্তলটা'—কানাই গম্ভীর হয়ে ধীরে ধীরে বললে—'It is the spirit of Khudiram who gave me the revolver.'

এইসব ছেলেরা সত্যিই কত যে ভিন্ন প্রকৃতির, আর কত অন্য ধরনেরই যে ছিল। তাই ভাবি, আমাদের দিনে তারা যে এসেছিল, আমাদের এত কাছে স্পর্শের মধ্যে ছিল, তাদের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে

আমাদের জীবনকে কতভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, ধন্য করেছে, তাদের মরণের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের গৌরবান্বিত করেছে, সম্মানিত করেছে, শ্রদ্ধান্বিত করেছে। আমাদের তারা ডাক দিয়েছে উঠবার, জাগবার, চেয়ে দেখবার জন্যে—এ যে জীবনের কত লাভ, কত সৌভাগ্য সেই কথা স্মরণ করে আজ গভীর আনন্দ অনুভব করি।

এই পর্বের শেষ কানাই এবং সত্যেন দু'জনের ফাঁসির সঙ্গে। কানাইয়ের ফাঁসি হয় আগে, সত্যেনের তার কিছুদিন পরে। শুনেছি কানাইয়ের ওজন বেড়ে গিয়েছিল ফাঁসির আগে। আর, তাকে নাকি ঘুম থেকে ডেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ফাঁসি দেবার জন্যে।

এদের জীবনের কথা ভাবলে একদিকে যেমন চোখে জল ঝরে, আর একদিকে তেমন বুক ভরে ওঠে, শিরা-উপশিরায় যেন কিসের চলাচল শুরু হয়ে যায়। কী যে দেখেছি তখন এই চোখে!

আমি সেই গান গেয়ে এঁদের কথা আজ শেষ করি যে-গান শুনেছিলাম তখনকার দিনে দেশবাসীর কম্বুকণ্ঠে—

'ক্ষুদিরাম গেল হাসিতে হাসিতে ফাঁসিতে করিতে জীবন দান
পাপিষ্ঠ নরেনে বধিল কানাই, সত্যেন ধন্য করিল দেশ।'

শ্রীঅরবিন্দ জেল থেকে বের হয়ে 'কর্মযোগিন' পত্রিকা বের করেন, কেননা তিনি জেলে থাকতেই 'বন্দে মাতরাম্' কাগজটি উঠে যায়। শুনেছি, কর্মযোগিন অফিসে গিয়ে সিস্টার নিবেদিতা তাঁকে জানান যে, আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে, সব ঠিক। অতএব তিনি যেন অবিলম্বে কলকাতা পরিত্যাগ করে কোথাও চলে যান। এই সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ নিজে বলেছেন (যা বলেছেন তা নীরদবরণের 'শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা' পুস্তকটি থেকে তুলে দিচ্ছি):

'আমাদের বন্দে মাতরমের আর্থিক অবস্থা ভয়ানক খারাপ ছিল। তবুও কয়েক বছর ধরে আমরা কাগজ চালিয়েছি। দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হয়ে যখন আলীপুর জেলে বন্দী ছিলাম, আর্থিক দুরবস্থার জন্যে কাগজ চালান দুঃসাধ্য দেখে তারা কড়া লেখা বের করে, তাতেই

কাগজ বন্ধ হয়, পরে খালাসের পরে কর্মযোগিন বের করি। সেবারও যখন নিবেদিতার কাছে আমার গ্রেপ্তারের গুজব শুনলাম, "দেশবাসীর প্রতি খোলা চিঠি" নামে একটি প্রবন্ধ লিখি, এবং গোপনে চন্দননগর চলে যাই। সেখানে বন্ধুরা যখন আমায় ফ্রান্সে পাঠাবার কথা ভাবছিল, আমি আদেশ শুনলাম—"পণ্ডিচেরী চলে যাও"।

মণিলাল*: পণ্ডিচেরী কেন?

শ্রীঅরবিন্দ: সে প্রশ্নের অবকাশ ছিল না, শ্রীকৃষ্ণের আদেশ। মানতেই হবে। পরে বুঝতে পেরেছি যে, আমার যোগের কাজের উদ্দেশ্যে এ আদেশ।

আর এক জায়গায় পুরানী (শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য ও আশ্রমের বহু পুরাতন একটি বিশিষ্ট সাধক) নিবেদিতা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞেস করছেন ('শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা' নীরদবরণের লিখিত পুস্তক হতে উদ্ধৃত):

'আজ পুরানী কথা শুরু করল; বলল যে, হার্বাটের স্ত্রী নিবেদিতার পুরাতন চিঠিপত্র সংগ্রহ করছেন ছাপাবার জন্যে। একটা চিঠিতে নাকি নিবেদিতা বলেছেন যে, শ্রীঅরবিন্দ কলকাতা ত্যাগকালে নিবেদিতাকে বন্দে মাতরমের ভার দিয়ে যান।

শ্রীঅরবিন্দ: বন্দে মাতরম্ তো নয়, কর্মযোগিন। তুমি তাঁকে সেটা বলো, এখন এসব খবর প্রকাশ করায় কোন ক্ষতি নেই। চন্দননগর যাবার পূর্বে তাঁর সাথে আমার দেখা হয়, এবং তাঁকে আমি ভার নিতে বললে তিনি রাজী হন। তাঁর কাছ থেকেই আমাকে গ্রেপ্তার করবার অভিসন্ধিটা জানতে পাই, সরকার-মহলে তাঁর অনেক বন্ধু ছিল। তখন আমি "আমার রাজনৈতিক উইল" প্রবন্ধটা লিখি। তাতে গ্রেপ্তারের মতলবটা স্থাপিত হয়।'

---

*বরোদার ডাক্তার। শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য।

১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে পদার্পণ করেন।

আত্মোৎসর্গের মহিমায় উজ্জ্বল আর একটি আদর্শ দেশভক্তের কথা একটু বলি, যিনি বালেশ্বরে দুই হাতে গুলী চালাতে চালাতে প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুদলের বিপক্ষে একা লড়েছিলেন। শত্রুর গুলীবিদ্ধ হয়ে একটি হাত যখন অচল হয়ে যায়, তখন শুধু অপর হাতটি দিয়েই শেষপর্যন্ত গুলী চালিয়ে যেতে থাকেন যতক্ষণে না অনাহারে ক্লিষ্টদেহ ঢলে পড়ে মাটির উপর। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বীরশ্রেষ্ঠ, বীরত্বের নিদর্শন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—বাঘা যতীন নামে খ্যাত। পূর্বেও একবার বিনা অস্ত্রে ইনি বাঘের সঙ্গে লড়েছিলেন, যেজন্যে এঁর নাম হয় "বাঘা যতীন"। এঁর বিক্রম, তেজ, শক্তি, সাহস—কোনও কিছুরই তুলনা হয় না। এঁর একটি শিষ্য, বীরেন দত্তগুপ্তের রিভলভারের গুলীতে ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, দেশের পরম শত্রু সাম্‌সুল আলাম হাইকোর্টের মধ্যে ভবলীলা সাঙ্গ করেন। ছেলেটি ধরা পড়ে যায় এবং পুলিশের তাড়নায় কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে যতীন্দ্রনাথের নাম প্রকাশ করে ফেলে। ফলে, তাঁকে আলীপুর জেলে বিচারাধীনে আসামী হয়ে বেশ কিছু কাল থাকতে হয়েছিল। 'Howrah Conspiracy Case' নামে এই মামলা বহুদিন ধরে চলে। পুলিশ এঁর বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ করতে না পারায় ইনি খালাস পান দীর্ঘ দেড় বছর পরে।

আমার মামার মনে একটা গভীর দুঃখ ছিল যে, এমন মানুষটিকে দেশের মানুষ তেমন চিনল না। তিনি একদিন আক্ষেপ করে বলেছিলেন—'শালগ্রামশিলা দিয়ে আমরা বাটনা বেটেছি।' মামাবাবু নিজে এঁর মৃত্যুতে অশৌচ পালন করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ এঁর সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা উদ্ধৃত করে দিয়ে সেই মহানচেতা মানুষটির কথা শেষ করি—'He was one of my most trusted lieutenants, a wonderful man who would belong to the front rank of humanity, such beauty and

strength combined in one I have not seen. His stature was like that of a warrior'*

এই যতীন্দ্রনাথেরই একটি শিষ্য, নাম চারু বসু, আলীপুর আদালতে যখন বোমার মামলার শুনানী চলছিল তখন সেই সময় একদিন আদালত-কক্ষে সোজা প্রবেশ করে ঘরভর্তি লোকের সামনে পাবলিক প্রসিকিউটাব আশু বিশ্বাসকে লক্ষ্য করে গুলী চালায় ও সেই গুলীতেই আশু বিশ্বাসের জীবনান্ত ঘটে। অসমসাহসিকতার প্রতিমূর্তি এই ছেলেটি পালাবার কোনও চেষ্টাই করেনি। যে-কাজ কবতে এসেছিল তাবই সাফল্যের তৃপ্তি ফুটে উঠেছিল মৃত্যুভয়লেশহীন ওই মুখে। এই ছেলেটি শুনেছি গিয়েছিল—'হাসতে হাসতে ফাঁসিতে কবিতে জীবনদান।' তলে তলে খবর পাওয়া গিয়েছিল, আশু বিশ্বাস নাকি সবিশেষ চেষ্টায় ছিলেন যাতে বোমা ষড়যন্ত্রের আসামী সকলের মোক্ষম সাজা হয়!

অগ্নিযুগের রক্তরাঙা বুকে এইসব ছেলেরা যে-সব জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেছে, নিজেদেব রক্ত দিয়ে যে-দাগ এঁকে দিয়ে গেছে দেশের মাটির উপর, সে-দাগ কে মুছতে পাবে! দেশের মাটি যদি আজ ফেটেও যায়, তবে সে ফাটা মাটির দাগে দাগে তাদের অঙ্কিত রেখা থাকবে অক্ষয় অমর হয়ে। সাক্ষ্য দেবে কালের বুকে চিরোজ্জ্বল হয়ে।

*Talks with Sri Aurobindo by Nirodbaran.

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম বৎসর, ১৯০৪ সাল শেষ হইয়া ১৯০৫ সাল আরম্ভ হইল ১৯০০ হইতে ১৯০৪—এই পাঁচ বৎসর বাংলার জাতীয় জীবনের মহাসন্ধিক্ষণ। এই পাঁচ বৎসরে বাংলাদেশ যেন এক শতাব্দীর পথ অতিক্রম করিযাছিল।

সকলের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবসান ঘটাইয়া ১৯০৫-এর ২০শে জুলাই ইংলণ্ড হইতে সংবাদ আসিল, পার্লিয়ামেণ্ট লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। বাঙালীর সমস্ত প্রতিবাদ নিষ্ফল হইল। হাজার হাজার সভা আর ভারত-সচিবের নিকট সুরেন্দ্রনাথের মুসাবিদা-করা আশী হাজার লোকের স্বাক্ষর-সম্বলিত আবেদন—সবই ব্যর্থ হইল। শীঘ্রই ইহাকে আইন করিয়া ঘোষণা করা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন ধূমায়িত অবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রজ্বলিত অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইল। স্বদেশী আন্দোলনের এই প্রজ্জ্বলিত পরিবেশে নিবেদিতাকে আমরা দেখিতে পাই একেবারে রণ-রঙ্গিণী মূর্তিতে। সে-বিপ্লব তরঙ্গে তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে ঝাঁপ দিলেন—তাঁহার যৌবনের অগ্নি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, তাঁহার চরণে যেন ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাজিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসিনী রুদ্রাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন।

শান্ত তাপসা হইলেন সিংহবাহিনী রণচণ্ডী।

বাংলার জলস্থল ও জনপদ কাঁপাইয়া একসঙ্গে উঠিল ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কার। মেঘের গর্জন। জলধির কল্লোল। তাহারই মাঝখানে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখারূপে দাঁড়াইয়া নিবেদিতা আহ্বান করিলেন বাঙালী সন্তানকে।...

ইতিপূর্বে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া অরবিন্দের নির্দেশে

গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং "নিবেদিতা তাহাতে ঘর্মাক্ত কলেবরে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।" তরুণ বিপ্লবীদের শিক্ষা দিবার মহড়া পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে। নিবেদিতা তাঁহার লাইব্রেরীর প্রায় দুই শত বই গুপ্ত-সমিতিকে স্বেচ্ছায় দান করিয়াছেন—সবই আয়র্ল্যাণ্ড, ফরাসী এবং রাশিয়ার বিপ্লব-চেষ্টার ইতিহাস-সংক্রান্ত বই। সে সব বইয়ের অধিকাংশই ভারতবর্ষে সেদিন দুর্লভ ছিল। ছেলেরা উৎসাহের সহিত সেগুলি পড়ে। যখন বুঝিতে না পারে, নিবেদিতার কাছে আসে, তিনি তাহাদের বুঝাইয়া দেন। বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বাড়িটি সেদিন এইভাবে সন্ত্রাসবাদীদের একটি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। নিবেদিতা সেই তরুণ ছেলেদের যে কী ভালই বাসিতেন।...

দিবারাত্র এত পরিশ্রম সহ্য হইল না। পরিশ্রমের তুলনায় অবসর ও আহার্য দুই-ই ছিল অত্যন্ত পরিমিত। নিবেদিতার শরীর ভাঙিয়া পড়িল। ১৯০৫ সালের আগষ্ট মাসে হঠাৎ তিনি গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার আসিয়া বলিল—টাইফয়েড। প্রাণ-সংশয় হইয়া উঠিল।... কিন্তু অবশেষে তিনি বাঁচিয়া উঠিলেন। সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের জন্য বসু-দম্পতি নিবেদিতাকে দার্জিলিঙ লইয়া গেলেন।

নিবেদিতা যখন প্রাণ-সংশয় পীড়ায় আক্রান্ত, তখন ৭ই আগষ্ট, কলিকাতার টাউন হলে এক বিরাট সভায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদস্বরূপ 'বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ' সংকল্প গৃহীত হইল। সেই স্মরণীয় সভার সভাপতি ছিলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে 'বয়কট' জন্মলাভ করিল। সভায় এত জনসমাবেশ হইয়াছিল যে, একটি সভা ভাঙিয়া চারিটি সভা করিতে হয়। সেদিন এই বয়কটের প্রস্তাব আসিয়াছিল বরোদা হইতে। অরবিন্দই ইহার রচয়িতা। রাজনীতিতে 'বয়কট' অরবিন্দের

প্রতিভারই মৌলিক দান। সেদিনকার সভায় এই কথা কেহই জানিতে পারে নাই। কারণ, এই বয়কট প্রস্তাব অরবিন্দ নেপথ্য হইতে পাঠাইয়াছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের অসমসাহসিক পুরোধা সঞ্জীবনী-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রকে। দূর হইতেই অরবিন্দ বাংলার হৃৎস্পন্দন অনুভব করিতেছিলেন এবং নেপথ্য হইতে বঙ্গভঙ্গের প্রতিকার হিসাবেই তিনি বাংলার জননায়কদের সম্মুখে এই 'বয়কট' প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন সেদিন। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বাঙালী শপথ গ্রহণ করিল: "যদি বঙ্গভঙ্গ আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে বাঙালী বিলাতি কাপড়, বিলাতি জিনিস বর্জন করিবে।"...

২২শে সেপ্টেম্বর টাউন হলে আর একটি বিরাট জনসভার অধিবেশন হইল। বাঙালী পূর্বসঙ্কল্পে দৃঢ় থাকিবার প্রস্তাব পুনরায় গ্রহণ করিল। তারপর ১৬ই অক্টোবর রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে রাখীবন্ধন উৎসব। বাংলার কবির কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল জাগরণের এক নূতন মাঙ্গলিক। বেদনার প্রতিঘাতে মিলনের রাখীসূত্র হস্তে বাঁধিয়া বাঙালী শপথ গ্রহণ করিল: ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই।

সেই উত্তাল পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন:

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন—
এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।

নিবেদিতার সমস্ত মনপ্রাণ পড়িয়াছিল কলিকাতায়। আরোগ্য-লাভ করিয়া, শরীরে বল পাইয়া তিনি এইবার কলিকাতায় ফিরিবার সঙ্কল্প করিলেন।...

ডিসেম্বরে নিবেদিতা কলিকাতায় ফিরিলেন।...

নিবেদিতা ফিরিয়াছেন শুনিয়া নেতৃস্থানীয় অনেকেই সন্ধ্যায় বাগবাজারের সেই বাড়িতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তরুণের দল আসিয়া পরামর্শ চাহিল।...

১৯০৫। ডিসেম্বর। এইবার কংগ্রেসের অধিবেশন বারাণসীতে। স্মরণীয় এই অধিবেশনের সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে। সবেমাত্র লণ্ডন হইতে ফিরিয়াছেন তিনি। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র। কংগ্রেস বসিবার তিন দিন পূর্বে নিবেদিতা কাশীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভারতের এক তুমুল উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে এই অধিবেশন। মহারাষ্ট্র আর পাঞ্জাব ভিন্ন ভারতের ওপর কোনো প্রদেশই সেদিন বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হন নাই—নিবেদিতা ইহা জানিতেন। বারাণসী কংগ্রেসে নিবেদিতার আসিবার আরো একটি কারণ ছিল। কলিকাতায় থাকিতে থাকিতেই তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে অরবিন্দও কংগ্রেসের এই অধিবেশনে যোগদান করিতে আসিতেছেন। অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করাও দরকার নিবেদিতার। গোখলেকে নিবেদিতা বলিলেন—"কংগ্রেস যেন বয়কত সমর্থন করে।"

গোখলে : কিন্তু বয়কট কথাটার মধ্যে একটা প্রতিশোধ ও বিদ্বেষের ভাব রয়েছে না?

নিবেদিতা : প্রতিশোধ ও বিদ্বেষই তো এখন আমাদের একমাত্র পন্থা।

গোখলে : কংগ্রেস তা সমর্থন করতে পারে না।

নিবেদিতা : কিন্তু বাঙালী তা পারে—এটুকু তো বলতে পারবেন?

প্রবল উত্তেজনার মধ্যে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হইল। বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে গোখলে নির্দিষ্ট সময়ে কংগ্রেস

তোরণে আসিয়া পৌঁছিলেন—তাঁহার পশ্চাতে শোভাযাত্রা। গোখলে নামিলেই তাঁহাকে স্বাগত জানাইবার জন্য নিবেদিতা অগ্রসর হইলেন। ইহাই এ-অঞ্চলের নিয়ম। নিবেদিতা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন এক পাত্র দুগ্ধ—বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ। তারপর গলায় পরাইয়া দিলেন শেফালি জরির থোপনা-গাঁথা ফুল, কর্পূরের মালা; অনুচ্চস্বরে বলিলেন—"দেখবেন, বয়কটের দাবী কংগ্রেস যেন ন্যায্য বলিয়া ঘোষণা করে—এ জনতারই দাবী।" তারপর রবীন্দ্রনাথ উঠিয়া 'বন্দে মাতরম্' গাহিবার পর গোখলে মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলেন, জনতার দাবীকে ন্যায্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। নিবেদিতার প্রভাব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত।

স্থান—কাশীর তিলভাণ্ডেশ্বরের সংকীর্ণ গলিতে অবস্থিত নিবেদিতার বাড়ি। সময়—কংগ্রেসের অধিবেশনের এক দিন পরে। সন্ধ্যাবেলায় অরবিন্দ আসিলেন নিবেদিতার সহিত দেখা করিতে। চরমপন্থী দলের প্রতিনিধি হিসাবে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কয়েক জন আসিলেন। রমেশচন্দ্র প্রমুখ নরমপন্থীরাও এখানে নিবেদিতার সহিত পরামর্শ করিতেন। প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার তিলভাণ্ডেশ্বরের বাসাটি নেতাদের বৈঠকখানা হইয়া উঠিল। অনেক রাত্রি অবধি এখানে বৈঠক চলিত। ঘরের এক কোণে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া নিবেদিতা স্বাগত জানাইতেন অভ্যাগতদের। তাঁহাকে ঘিরিয়া অর্ধচন্দ্রাকারে মণ্ডলী করিয়া বসিতেন সকলে। গোখলে পর্যন্ত আসিতেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রদত্ত গোখলের বক্তৃতা নিবেদিতা দেখিয়া দিয়াছিলেন। নিবেদিতার তিলভাণ্ডেশ্বরের এই বাড়িতেই একদিন সান্ধ্যবৈঠকে বিখ্যাত 'ভারত সেবক সংঘ' ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল।

গোখলের সহিত নিবেদিতার যে-সব কথাবার্তা হইয়াছে, নিবেদিতা তাঁহাদের কাছে সব খুলিয়া বলিলেন। চরমপন্থীরা

গোখলের মনোভাব সমর্থন করিলেন না। অন্যান্য সকলে চলিয়া যাইবার পর নিবেদিতা অরবিন্দকে বলিলেন—বিপ্লব আসিতে আর দেরী নাই। আপনার কি মনে হয়?

অরবিন্দ: বিপ্লব আসিয়া গিয়াছে।

নিবেদিতা: এ বিপ্লবের নেতা কে?

অরবিন্দ: টিলক। আমার বিশ্বাস তিনি একজন অসামান্য বিপ্লবী নেতা। চরমপন্থীদলের নেতৃত্ব তাঁহাকেই দেওয়া উচিত।

নিবেদিতা: বয়কট্-প্রস্তাব কি আপনার রচনা?

অরবিন্দ: হ্যাঁ। আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?

নিবেদিতা: প্রস্তাবটি পাঠ করিয়াই বুঝিয়াছিলাম।

অরবিন্দ হাসিলেন।

নিবেদিতা: কিন্তু আর কতকাল অন্তরালে থাকিয়া কাজ করিবেন? 'ভবানীমন্দির'কে বাস্তবে রূপায়িত করিবেন না? এইবার সম্মুখে আসুন। লগ্ন তো আসিয়া গেল। আমরা আপনার প্রতীক্ষায় রহিয়াছি।…

১৯০৬। মার্চ।

কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল, কিন্তু জাতির জীবনে সন্ধিক্ষণ আসিতে বিলম্ব হইল না। কাশী কংগ্রেসের তিন মাসের মধ্যেই সশস্ত্র বিপ্লববাদ প্রচারের জন্য অরবিন্দ-নিবেদিতার প্রেরণায় বিপ্লবী-দলের মুখপত্র 'যুগান্তর' আবির্ভূত হইয়া দেশের তরুণদের চেতনায় যুগান্তর সৃষ্টি করিল। প্রথম হইতেই যুগান্তর পত্রিকা খোলাখুলিভাবে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে লাগিল। যুগান্তরের সূচনা হইতেই নিবেদিতা ইহার সহিত জড়িত হইয়া পড়িলেন। বাংলাদেশে অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতির দ্বিতীয় পর্বের আরম্ভ এইখান হইতেই। নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়িতে বসিয়াই বারীন্দ্র ও ভূপেন্দ্রনাথ যুগান্তরের সকল রকম পরিকল্পনা স্থির করিয়া প্রথম সংখ্যা লিখিয়া ফেলিলেন।

সম্পাদক কে হইবে? এই প্রশ্ন যখন উঠিল, তখন ভূপেন্দ্রনাথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া নিবেদিতা বলিলেন—"ভূপেন"।

যুগান্তরের স্তম্ভে দিনের পর দিন নির্জলা বিপ্লব প্রচারিত হইতে লাগিল—পিছন হইতে প্রেরণা দিতে লাগিলেন নিবেদিতা ও অরবিন্দ। অরবিন্দ এই সময় বরোদা হইতে কলিকাতায় আসিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। তখন হইতে বিপ্লবের ত্রিধারা প্রবাহিত হইল। অরবিন্দ আসিতেই বাংলায় যেন নব-প্রাণের সঞ্চার হইল। ঘটনার স্রোত ইতিহাসের বুকে দ্রুত আবর্তিত হইয়া চলিল যৌবন জল-তরঙ্গের মতন। ১৪ই এপ্রিলের ইতিহাস-বিখ্যাত বরিশাল সম্মিলনের প্রভাব নিবেদিতা ও অরবিন্দের জীবনে তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল। নিবেদিতা এই সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন না; অরবিন্দ ছিলেন। "বরিশালে ফুলারী দমন-নীতির চরম প্রকাশ বিপ্লবী অরবিন্দ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইলেন। বাঙালী সেদিম রক্তদান করিয়া রাজাদেশ অমান্য করিল, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধেব জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইল—বিপ্লবী অরবিন্দ তাহা দেখিলেন এবং এই প্রত্যক্ষ ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মুখ নীবব ছিল, কিন্তু মন নীরব ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের কথা, আয়ার্ল্যাণ্ডের বিদ্রোহের কথা একে একে তাঁহার সদ্য-উত্তেজিত মনের উপব দিয়া চলচ্চিত্রের ছবির মত ছায়াপাত করিয়া গেল। আর তাঁহার বিপ্লবী মন যে স্তব্ধ হইয়া কি সংকল্প করিল" - তাহা তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া সর্বপ্রথমে নিবেদিতার নিকট ব্যক্ত করিলেন। বরিশালের সব সংবাদই নিবেদিতা কলিকাতায় বসিয়া পাইয়াছিলেন। তারপর "নিরীহ, নীরব অরবিন্দ সেদিন বরিশাল হইতে যে অহিংসভাব অবলম্বন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন নাই"—ইহা জানিতে পারিয়া নিবেদিতার হইয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিল।...

বাংলার দুই কূল প্লাবিত করিয়া বিপ্লবের ভাবগঙ্গা বহিয়া চলিল। নিবেদিতা উদ্দাম স্রোতোধারাকে সেদিন পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন

তুই জন—অরবিন্দ আর নিবেদিতা। ফুলার-বধের আয়োজন চলিল যুগান্তরের আড্ডায়। বাংলার এই প্রথম বৈপ্লবিক কর্মের—ফুলার-বধের এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্য নায়িকা সেদিন ছিলেন নিবেদিতা। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলিয়াছেন—"অরবিন্দ ও নিবেদিতার একত্রে মিলিত পরামর্শ অনুসারেই এই ভয়ঙ্কর বৈপ্লবিক কর্মের সূত্রপাত হইয়াছিল।"

স্বীয় জন্মভূমি আয়ার্ল্যাণ্ডের অপূর্ব স্বাধীনতা-সংগ্রামের দৃষ্টান্ত নিবেদিতার চক্ষের সম্মুখে জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া উঠিত। পুনরভ্যুত্থানের প্রাণস্পর্শী আহ্বানে ভারতবাসীর মন জাগিয়া উঠিয়া মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় যখন উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, তখনই নিবেদিতার ললাট-নেত্রের প্রদীপ্ত আগুনে ইতিহাসের দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আর বাংলার আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া বাজিয়া উঠিল বিপ্লবের দুন্দুভি। নিবেদিতাকে আমরা দেখিতে পাই নাগমাতারূপে। উদ্ধত রাজশক্তির ভ্রূকুটিকে হেলায় উপেক্ষা করিয়া নিবেদিতা সেদিন বাংলার নাগশিশুদের কর্ণে মাভৈঃ মন্ত্র শুনাইয়াছিলেন।...

অরবিন্দ বাংলায় আসিলেন।

কলিকাতা তখনো ভারতবর্ষের রাজধানী।

সেই রাজধানীতে আসিলেন অরবিন্দ, যেমনভাবে নিবেদিতা একদিন আসিয়াছিলেন ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে। নিবেদিতার মতনই সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, সম্ভাবনাময় জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া, বরোদা রাজ-কলেজের উচ্চবেতনের চাকরি ত্যাগ করিয়া, অরবিন্দ বাংলায় আসিলেন। যে মুহূর্তে স্বদেশী আন্দোলনের কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া দেশ-জননী তাঁহার আকুল আহ্বান পাঠাইলেন, অরবিন্দ সেই মুহূর্তেই ইতিহাসের গতিপথে উদ্ভূত বাংলার অগ্নিগর্ভ বিপ্লব-তরঙ্গে নিঃশঙ্কচিত্তে ঝাঁপ দিলেন।

এক দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে ভারতের জন্য নিবেদিতার আত্মোৎসর্গ আর পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য অরবিন্দের এই আত্মোৎসর্গ,

উভয়েরই ঐতিহাসিক প্রেরণা ও মূল্য এক। অরবিন্দ বাংলায় আসিয়া দেশব্যাপী যে বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করিলেন, নিবেদিতা তাঁহার সকল শক্তি হইয়া তাহাতে যোগদান করিলেন। বলিলেন—"আর কথা নয়, এইবার চাই কাজ।" এইভাবে সেদিন বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে অরবিন্দ এবং নিবেদিতার যুগ্ম-নেতৃত্ব বহ্নি-বলয় ঘেরা এক নূতন যুগের সূচনা করিয়া দিয়াছিল। সে ইতিহাস আজো সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ হয় নাই।

সদ্য-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করিলেন অরবিন্দ নামমাত্র বেতনে। সেই সঙ্গে নেতৃবর্গ ও কর্মীবৃন্দের সহিত মিলিয়া তিনি কাজও আরম্ভ করিয়া দিলেন। একদিকে চলিল গুপ্ত-সমিতি গঠনের কাজ, অন্যদিকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক দলগঠন ও জাতীয় আদর্শ প্রচারের কাজ।...

অরবিন্দের দেশসেবার এই আদর্শের মধ্যে নিবেদিতা যেন তাঁহার গুরুর দেশপ্রেমের আদর্শকে নূতন করিয়া পাইলেন; তাই না শান্তশিষ্ট এই নিরীহ মানুষটির স্বদেশপ্রেম সেদিন নিবেদিতাকে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল।

"অরবিন্দ ছিলেন আন্দোলনের কাণ্ডারী। তিনি যে জাতীয়তার পাঠ দিতেন, আসলে তাহা আধ্যাত্মিকতা। ক্রমে জাতির আচার্য হইয়া উঠিলেন অরবিন্দ। যাহারা বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করিবে তাহারা যেন উপলব্ধি করে যে দেবতার হাতে তাহারা যন্ত্রমাত্র, সেই ছিল তাঁহার আদর্শ। ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া দেশসেবাকে গ্রহণ করিতে হইবে জীবনধর্ম হিসাবে। এই ব্রত হইবে আত্মনিবেদন আনুগত্যের সাধনা।...এই কর্মযোগ বিনা দ্বিধায় দুঃখ বরণের ব্রত।"

নিবেদিতার মনে পড়িল বিবেকানন্দও জাতিকে এই কর্মযোগে দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বাঙালীর হইয়া নিবেদিতা তাই অরবিন্দকে জাতীয় আন্দোলনের এবং সশস্ত্র বিপ্লবের দীক্ষাগুরু বলিয়া

বরণ করিয়া লইলেন। নিবেদিতা সবিস্ময়ে দেখিলেন—দৈববাণীর মতন অরবিন্দের কথা; দিন দিন লোকের নিকট সেই কথার মূল্য বাড়িতেছে। বাংলায় আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এক প্রচণ্ড কর্মপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাব সহিত নিবেদিতার কর্মপ্রবাহ আসিয়া সংযুক্ত হইল। ইহাকে ইতিহাসের নেপথ্য-বিধান ভিন্ন আর কি বলিব? সতীশচন্দ্রের 'ডন্' বিপিনচন্দ্রের 'নিউ-ইণ্ডিয়া', উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' এবং বিপ্লবীদলের 'যুগান্তর' যে-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, ১৯০৬ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত অরবিন্দের 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা সেই ক্ষেত্রকে প্রশস্ততর ও ব্যাপকতর করিয়া দিল। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে প্রাণময় ও জীবন্ত বস্তু এইসব সংবাদপত্রগুলি। নিবেদিতা ইহার প্রত্যেকটির সহিত প্রথম হইতেই সংশ্লিষ্ট। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সহিতও তিনি জড়িত হইলেন। 'বন্দে মাতরম্' ইংরেজ-বর্জিত পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিল। চরমপন্থী দলের আদর্শ ইহাই। নিবেদিতার আদর্শও তাহাই। স্বদেশী আন্দোলনের এই পর্বে অরবিন্দেব পার্শ্বেই নিবেদিতার স্থান, কি নিবেদিতার পার্শ্বে অরবিন্দের স্থান—তাহা বিতর্কের বিষয় হইলেও, সমসাময়িক ইতিহাস ইহাই প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-টিলক-প্রভাবিত বিপ্লবী অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিলেন নিবেদিতা। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের নিজের উক্তি এই: "বাংলায় আমার রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় আমাকে যিনি সবচেয়ে বেশী সহায়তা করিয়াছেন এবং নানাভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়াছেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্যা শিষ্যা—মহীয়সী নিবেদিতা।" ..

'বন্দে মাতরম্' ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিল, জাতির ধমনীতে যেন নবরক্তপ্রবাহ বহাইয়া দিল—এমনই তেজঃপূর্ণ ছিল ইহার প্রত্যেকটি রচনা। 'বন্দে মাতরম্'-এর পূর্ণ-স্বাধীনতার আদর্শ ঐশীমন্ত্রের মত কার্য করিল—জাতি যেন নব-জন্ম

গ্রহণ করিল। ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে নবযুগ-জীবনের মহামন্ত্র নিবেদিতার কণ্ঠ ও লেখনী হইতেও সমান মূর্ছনায় নির্গত হইয়াছিল। পরাধীন জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তিনি আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন অরবিন্দের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অরবিন্দের মুখে দৃষ্টি রাখিয়া ভগিনী নিবেদিতাও তাতে বিপুল ঝঙ্কার দিলেন।…

স্থান—দমদমে আনন্দমোহনের 'আরাম কুঠি'। সময়—সন্ধ্যার একটু পরে। নিবেদিতা রোগশয্যায় শুইয়া আছেন। অরবিন্দ আসিলেন নিবেদিতাকে দেখিতে। প্রথমেই নিবেদিতা তাঁহাকে কংগ্রেসের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

নিবেদিতা : কী সংবাদ, বলুন ?

অরবিন্দ : 'বয়কট' তো কেউ সমর্থন করল না।

নিবেদিতা : টিলক ?

অরবিন্দ : একা টিলকের সমর্থনে কি হবে, মালব্য পর্যন্ত প্রতিবাদ করলেন। আর গোখলে তো মঞ্চের সামনে লাফিয়ে চেঁচিয়ে বললে—"বিপিন পালের ইংরেজ-গভর্নমেণ্টকে 'বয়কট' প্রস্তাবের সঙ্গে আমাদের কোন সংস্রব নেই।"

নিবেদিতা : লজপৎ রায় ?

অরবিন্দ : তিনিও এবার কিছুটা পিছু হটেছেন। এবারকার কংগ্রেসে একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

নিবেদিতা : কি ?

অরবিন্দ : বাংলার নেতৃত্ব কেউ মানতে চায় না।

নিবেদিতা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—কংগ্রেসের মধ্যে কিছুমাত্র অনৈক্য না থাকে, এই আমার ইচ্ছা, হয়ত এ একটা আদর্শ। গুরুর আদর্শ ছিল অখণ্ড ভারত। অখণ্ড কংগ্রেস না হলে অখণ্ড ভারত কি সম্ভব ? ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ ঘুরে বৈচিত্র্যের মধ্যে আমি ঐক্যের সন্ধান পেয়েছি—হয়ত

এও একটা আদর্শ। বাংলার কাছ থেকেই সমস্ত ভারত আজ অনুপ্রেরণা লাভ করেছে। আদর্শের জন্য মরেও সুখ আছে।

অরবিন্দ: কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে এ আদর্শ বাস্তবরূপ গ্রহণ করবে বলে তো আমার বিশ্বাস হয় না। কংগ্রেসের বিরোধ বেড়েই চলেছে। কলকাতা কংগ্রেসে এবার তা প্রত্যক্ষ করলাম।

নিবেদিতা: বৈচিত্র্য বিরোধের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। নিরুৎসাহ হলে চলবে না, কাজ আমাদের করে যেতেই হবে।···

১৯০৭। এপ্রিল মাস। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন দমন করিবার জন্য রাজশক্তি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বরিশালের প্রত্যক্ষ দমন-নীতির পরিবর্তে এইবার হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে লেলাইয়া দেওয়া হইল। মার্চ মাসে ঢাকার নবাব সলিমুল্লার প্ররোচনায় কুমিল্লায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত ধরিয়া এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে জামালপুরে বাসন্তী-পূজার সময়ে মুসলমানেরা বাসন্তী-প্রতিমা ভাঙিয়া ফেলিল। হিন্দু-পুরস্ত্রী মুসলমানের হাতে ধর্ষিতা হইল। মুসলমানদিগকে হাত করিয়া সরকার যখন স্বদেশী আন্দোলনকে আঘাত করিতে উদ্যত, ঠিক সেই সময় অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় বাঙালীর পৌরুষকে ধিক্কার দিয়া যাহা লিখিলেন তাহা আগ্নেয়গিরির প্রস্রবণ। জামালপুরের সংবাদে বিচলিত হইয়া টিলকও তাঁহার কাগজে একই অগ্নিবর্ষী সুরে ঝঙ্কার তুলিলেন। নিবেদিতা ঠিক এই সময়েই বাংলার বিপ্লবী যুবকদের আইরিস সিন্-ফিনদের টেক্‌নিক শিক্ষা দিতেছেন। 'যুগান্তর'-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথকে তিনি জামালপুরে পাঠাইলেন তদন্ত করিবার জন্য। ইতিহাসের দুর্দমনীয় বেগ বাঙালী জাতিকে সেদিন ওইভাবেই বিপ্লবের পথে লইয়া গিয়াছিল। তাহারই পুরোভাগে দাঁড়াইয়া নিবেদিতা যেন অঙ্গুলি সংকেত করিয়াছিলেন।

১৯০৭। মে মাস। পাঞ্জাবে কৃষিকর বৃদ্ধি হইয়াছে। বারি-দোয়াব খালে চেনার বস্তির প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। লজপৎ রায় ও অজিত সিংহের নেতৃত্বে তাহারা বর্ধিত কর হ্রাস না পাওয়া পর্যন্ত চাষবাসে বিরত হইল। রাওলপিণ্ডিতে ক্ষিপ্ত কৃষক-জনতা সাহেবদের বাংলো ও বাগান আক্রমণ করিয়া তছনছ করিয়া দিল। খাল ও রেলপথ ধ্বংস করা হইল। ইহার ফলে ভারত সরকার লজপৎ রায় ও অজিত সিংহকে গ্রেপ্তার করিয়া ব্রহ্মদেশে মান্দালয় দুর্গে পাঠাইলেন। উৎসাহ ও আতঙ্কের মধ্যে কলিকাতায় ইহার ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। অরবিন্দ রাত্রিতে ঘুমাইতেছিলেন। লজপৎ রায়ের নির্বাসনের সংবাদ পাইবামাত্রই 'বন্দে মাতরমের' জন্য অরবিন্দের অগ্নিবর্ষী লেখনীমুখে বাহির হইল এই কয়টি ছত্র :

...ভারত হইতে লজপৎ রায়কে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। ইহার "আর কোনো সমালোচনার প্রয়োজন নাই। তাঁহার গ্রেপ্তার উপলক্ষে প্রতিবাদ-সভা নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রতিবাদ সভা? বক্তৃতা দিবার কিংবা প্রবন্ধ লিখিবার দিন আজ নয়। ইংরেজ আমাদের শক্তি পরীক্ষায় চ্যালেঞ্জ করিয়াছে। আমরা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিলাম। পঞ্চনদের মানুষ—সিংহের জাতি তোমরা—যাহারা তোমাদের অস্তিত্বকে ধূলায় মিশাইতে স্পর্ধা করে তাহাদের তোমরা দেখাইয়া দাও যে, একজন লজপৎ রায়কে লইয়া গেলে তাহার স্থলে শত শত লজপৎ রায় উঠিয়া দাঁড়াইবে।"

১০ই মে-র 'বন্দে মাতরম্'-এ এই কয়েক ছত্র সমগ্র ভারতে উত্তেজনার বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ছড়াইয়া দিল। 'বন্দে মাতরম্'-এ অরবিন্দ যাহা লিখিলেন, ঠিক সেই সময়ে টাউন হলের এক সভায় নিবেদিতা একটি বক্তৃতায় তাহাই বলিলেন। বক্তৃতার বিষয়—'ডাইনামিক্ রিলিজিয়ন'। সভাপতি—বিপিনচন্দ্র পাল। নিবেদিতাও বলিলেন —আর কথা নয়। এস, এইবার আমরা কাজ আরম্ভ করি।

অরবিন্দের লেখার সহিত একেবারে অক্ষরে-অক্ষরে মিলিয়া গেল।

দেখা যাইতেছে, অরবিন্দ ও নিবেদিতা ঠিক একই সময়ে একই ইঙ্গিত করিতেছেন। এই দুই অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন বিপ্লবীর চিন্তাস্রোত একই খাতে প্রবাহিত হইতেছে। নিবেদিতার এই বক্তৃতা শুনিয়াই সেদিন বিপিচন্দ্র তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া বলিয়াছিলেন—"ইহা ডাইনামিক রিলিজিয়ন নহে। ইহা সাক্ষাৎ ডিনামাইট, অর্থাৎ বিস্ফোরণ।" বিপিনচন্দ্র জানিতেন না, নিবেদিতা ঠিক সেই সময়ে সকলের অজ্ঞাতসারে বিপ্লবীদের লইয়া হাতে-কলমে ডিনামাইটই তৈয়ারীর দুঃসাহসিক কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। আইরিস-বিপ্লবেব উত্তপ্ত আবহাওয়াব মধ্যে একদা যাঁহাব জন্ম, তাঁহার রক্তে বোমা-ডিনামাইটের উপাদান তো থাকিবেই। অরবিন্দ যখন 'বন্দে মাতরম্'-এ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও সক্রিয় প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন তখন নিবেদিতা সকলেব অজ্ঞাতসাবে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের ল্যাবোরেটরীতে বিপ্লবী যুবকদের লইয়া বোমা প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি শিখাইতে ব্যস্ত।...

২রা জুলাই। পুলিশ অতর্কিতে 'যুগান্তর' পত্রিকার কার্যালয়ে আসিয়া হানা দিল। খানাতল্লাস করিল। সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তখন নিবেদিতার নির্দেশে জামালপুরে। জামালপুরেব হাঙ্গামার তদন্ত করিয়া দুই দিন পরে ভূপেন্দ্রনাথ যখন কলিকাতায় ফিরিয়া 'যুগান্তর' কার্যালয়ে আসিলেন, পুলিশ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল। 'বন্দে মাতরম্'-এ অরবিন্দ লিখিলেন—"আরো অত্যাচার চাই।"

ভূপেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হইবার পর নিবেদিতা পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

'যুগান্তরের' দুইটি বিশেষ প্রবন্ধের জন্য আমাকে আসামী করা হইল। আমার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হইল। মোকদ্দমার সময়ে কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট স্তুইনহো যখন বিশ হাজার টাকা জামিন তলব করেন, তখন ভগিনী নিবেদিতা এই জামানৎ টাকা দিতে রাজী হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং আদালতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই জামিনের ব্যাপারে 'ইংলিশম্যান' কাগজ নিবেদিতাকে দেশদ্রোহী বলিয়া গালি দিল। ভূপেন্দ্রনাথের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল। বাংলায় ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভূপেন্দ্রনাথই প্রথম শহীদের গৌরব লাভ করিলেন। তিনি আদালতে হাসিমুখে এই দণ্ডের আদেশ গ্রহণ করিলেন।...

পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি এইবার গিয়া পড়িল নিবেদিতার উপব। গ্রেপ্তার অথবা নির্বাসন—যে কোনো মুহূর্তে সম্ভব। গভর্নমেণ্টের নিকট নিবেদিতার কার্যকলাপ কিছুই অবিদিত ছিল না। তাঁহারা নিবেদিতা সম্পর্কে অতিশয় সজাগ ছিলেন—বিশেষ করিয়া কার্লাইল সাহেব, যিনি সার্কুলার জারি করিয়া 'বন্দে মাতরম্' নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। অরবিন্দ প্রমুখ জাতীয় দলের নেতারা নিবেদিতাকে তাই কিছুদিনের জন্য ভারত ছাড়িয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন।...

যাইবার পূর্বে অরবিন্দের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদিতা তাঁহাকে বলিয়া গেলেন—মনে রাখিবেন, বিধাতা আপনার দক্ষিণ হস্তে কঠোর আদরে দুঃখের যে দারুণ দীপ দিয়াছেন —দেশের অন্ধকার বিদ্ধ করিয়া ধ্রুবতারার মত সেই আলো আজ জ্বলিয়াছে। আপনি বিপ্লবের রুদ্রদূত। দেখিবেন—সে আলো যেন নিভিয়া না যায়। সাগরপার হইতে আমি যেন আপনার জয়শঙ্খ শুনিতে পাই ওয়া গুরু কি ফতে।

কিন্তু বিদ্যালয়ের কি হইবে? বত্রিশ নাড়ির টান যে জড়াইয়া আছে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে—তাঁহার গুরুর আশীর্বাদ-পূত এই নিবেদিতা বিদ্যালয়। ইহাই তো তাঁহার কর্মের কেন্দ্র, সাধনার পীঠস্থান। ভগিনী ক্রিস্টিন ও ভগিনী সুধীরাকে ডাকিয়া বলিলেন— তোমাদের ওপর স্কুলের ভার রইল। স্কুলের মেয়েদের শিক্ষার যেন কোন ত্রুটি না হয়। যদি কখনো টাকার দরকার হয়—সোজা চলে যাবে জগদীশ বোসের কাছে।

দুয়ারে মঙ্গল-ঘট পাতিয়া মেয়েরা তাহাদের প্রিয় শিক্ষয়িত্রীকে

বিদায়-সম্ভাষণ জানাইল। নিবেদিতার নয়নের অশ্রু আর বাধা মানিল না।

তাৎপর তরুণ বিপ্লবীদের কয়েকজনকে নিবেদিতা তাঁহার বাগবাজারের বাড়িতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহার মধ্যে ছিলেন উল্লাসকর, বারীন্দ্র ও হেমচন্দ্র। নিবেদিতা তাঁহাদের বলিলেন – তোমাদের একজন সহকর্মী জেলে গিয়েছে। তার শূন্য স্থান পূর্ণ করতে হবে। তোমরা জেনো, কালের ভেরী বেজেছে, রুদ্রের আহ্বান এসেছে। আমি দেখেছি, দেশজননী তোমাদের ললাটে রক্ত-তিলক পরিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের সামনে অগ্নিপরীক্ষা। এই রুদ্রযজ্ঞে হয়ত তোমাদের কয়েকজনকে জীবনাহুতি দিতে হবে। তোমাদের এক হাতে অরবিন্দ তুলে দিয়েছেন গীতা আর অন্য হাতে আমি দিয়েছি বোমা। আমি যেন ফিরে এসে দেখি, তপ্ত রৌদ্রদাহ উপেক্ষা করে বিপ্লবের পথে তোমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছ। ওয়া গুরু কি ফতে! বিদায়ের কালে নাগমাতা নিবেদিতা বাংলার নাগ-শিশুদেব শুনাইয়া গেলেন এই আশ্বাস বাণী। ইহাদের কাহারও পিছনের টান নাই, অতীতের সংস্কার নাই, ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতায় ইহাদের প্রত্যেকের হৃদয় উদ্ভাসিত। কিন্তু নিবেদিতাকে বিদায় দিতে গিয়া প্রত্যেকেরই চক্ষু সেদিন সজল হইয়া উঠিয়াছিল।

নিবেদিতা ভারত ছাড়িয়া লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কারাগার বা নির্বাসনের ভয়ে তিনি পলায়ন করেন নাই। চির নিঃশঙ্কচিত্ত তিনি। ইতিহাস-বিখ্যাত বিপ্লবীদের রীতি ইহাই। ভারতের বাইরে আসিয়া ভারতের জন্য আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে পারিবেন আশা করিয়াই নিবেদিতা ভারত ত্যাগ করিয়া চলিলেন।...

নিবেদিতা লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া রহিল ভারতবর্ষে—বাংলাদেশে—বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের সেই ছোট্ট স্কুল বাড়িটিতে, যেখানে বসিয়া তিনি সহস্র রকম কর্মের আবর্ত রচনা করিয়াছিলেন।...

দিন যায়।

ভারতবর্ষ হইতে নিবেদিতা একটি একটি করিয়া ভীষণ সংবাদ পাইতে লাগিলেন।

সংবাদপত্র-দলনের সূচনা তিনি স্বচক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছিলেন। এখন লণ্ডনে বসিয়া সংবাদ পাইলেন, 'বন্দে মাতরম্'-এর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হইয়াছিল। বিচারে অরবিন্দ মুক্তিলাভ করিয়াছেন, কিন্তু এই মোকদ্দমায় ইংরেজের আদালতে সাক্ষী দিতে অস্বীকৃত হইয়া বিপিনচন্দ্রের ছয় মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। কিংসফোর্ডের আদালতের সম্মুখে চৌদ্দ বৎসরের বালক সুশীলকে প্রচণ্ড বেত্রাঘাতের দণ্ড দিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সংবাদ অসিল, উপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন রাজদ্রোহের অভিযোগে। ইংরেজের আদালতে কৈফিয়ৎ দিতে তিনিও অস্বীকৃত হইয়াছেন। 'সন্ধ্যা'র মামলার সংবাদের জন্য লণ্ডনে উৎকণ্ঠায় নিবেদিতা যখন দিন যাপন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার নিকট একদিন দুঃসংবাদ গিয়া পৌঁছিল—উপাধ্যায় আর নাই। বিচারাধীন অবস্থায় হাসপাতালে তিনি মারা গিয়াছেন। এই মর্মান্তিক সংবাদ নিবেদিতার মনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল। উপাধ্যায় নাই, নিবেদিতার মনে হইল, 'সন্ধ্যা'র প্রদীপও তাহা হইলে নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে।…

দিন যায়।

সংবাদ আসিল—মুরারীপুকুর বাগানে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি চলিতেছে। সংবাদ আসিল—সভাসমিতি নিষিদ্ধ করিয়া বড়লাট আইন পাশ করিয়াছেন। সংবাদ-পত্র গিয়াছে, এইবার প্রকাশ্য সভাসমিতি বন্ধ হইবে। সংবাদ আসিল—ছোটলাট ফ্রেজারের ট্রেন উল্টাইবার জন্য লাইনের উপর বোমা ফাটান হইয়াছে। ইহার নেপথ্য নায়ক ছিলেন অরবিন্দ। সংবাদ আসিল—গোয়ালন্দ ষ্টেশনে

ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এ্যালেনকে গুলী করা হইয়াছে। তারপরই সুরাট কংগ্রেসের দক্ষযজ্ঞের সংবাদ পাইলেন নিবেদিতা। চন্দননগরে মেয়রের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। বিপ্লবী যুবকদের এই সব অসমসাহসিক বৈপ্লবিক কার্যের সংবাদে নিবেদিতা বুঝিলেন, বাংলাদেশে রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

১৯০৭ শেষ হইয়া ১৯০৮ আরম্ভ হইল।

সংবাদ-পত্র আইনের বলে ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে সমস্ত জাতীয়তাবাদী পত্রিকার কণ্ঠরোধ করা হইয়াছে। এইবার নিবেদিতা বুঝিতে পারিলেন, লণ্ডনে তাঁহার কি কাজ। য়ুরোপে, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যে-সব ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা পলাতক জীবন যাপন করিতেছেন, তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে তাঁহাকে। আর নিষিদ্ধ পত্র-পত্রিকাগুলি আবার গোপনে ছাপাইযা বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে তাঁহাকে। অসীম সাহসিকতার সঙ্গে তিনি এই কার্যে ব্রতী হইলেন। বাংলার স্বদেশীর এই প্রজ্বলিত অবস্থার উত্তাপ লণ্ডনে নিবেদিতার দেহমনকে ছাইয়া ফেলিল। তাঁহার অন্তরে বিপ্লবের যে অগ্নিশিখা জ্বলিতেছিল তাহা আরও লেলিহান হইয়া উঠিল।

১৯০৮। মে মাস। ভারতবর্ষ হইতে নিদারুণ সংবাদ আসিল। মজঃফরপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর বোমা ছুঁড়িতে গিয়া কিশোর বিপ্লবী-যুগল ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী দুই জন ইংরেজ-মহিলাকে ভ্রমক্রমে নিহত করিয়াছে। অরবিন্দ প্রমুখ ৪৭ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সংবাদ আসিল—মজঃফরপুরের বোমার ব্যাপারে প্রবন্ধ লিখিবার ফলে টিলকের ছয় বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে এবং মহারাষ্ট্রের সিংহকে মান্দালয় দুর্গে আবদ্ধ করা হইয়াছে। সংবাদ আসিল—ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইয়াছে। সংবাদ আসিল—আলীপুর

জেলে সত্যেন ও কানাই রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। ইংরেজের জেলের মধ্যে বিপ্লবীরা যে এমন অভাবনীয় কাণ্ড করিতে পারিয়াছে—ইহাতে নিবেদিতার অন্তরের বিপ্লবী নারী উল্লসিত না হইয়া পারিল না। সংবাদ আসিল—ওভারটুন হলে ছোটলাট ফ্রেজারকে গুলী করা হইয়াছে। প্রকাশ্য রাজপথে পুলিশ অফিসার নন্দলাল ব্যানার্জিকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। অবশেষে সংবাদ আসিল যে, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রমুখ নয় জন জাতীয়তাবাদী নেতাকে বিনা বিচারে বাংলা হইতে দূর দেশান্তরে নির্বাসিত করা হইয়াছে। এইসব সংবাদ শুনিয়া নিবেদিতার মনে হইল, ভূপেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের সময়ে অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্'-এ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'আরো অত্যাচাব' চাহিয়াছিলেন। অত্যাচরের চরম হইল। বাঙালীর এই অকুতোভয়তাব শিক্ষাগুরু সেদিন ছিলেন এই নিবেদিতা।...

১৯০৯। জুনের শেষ। আর প্রবাসে থাকিতে নিবেদিতার মন চাহিল না। ভারতবর্ষে যাইবার জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। বসু-দম্পতির সহিত তিনি বার্লিন হইয়া ১লা জুলাই জেনেভায় আসিলেন। জেনেভায় আসিয়া সংবাদ পাইলেন যে, লণ্ডনে মদনলাল ধিঙড়া নামক একজন পাঞ্জাবী যুবক কার্জন উইলিকে হত্যা করিয়াছে। নিবেদিতা বুঝিলেন, বিপ্লবেব অগ্নিশিখা ভারতের বাহিরেও পরিব্যাপ্ত হইতে চলিয়াছে। চারিদিকের আকাশ থম্ থম্ করিতেছে। এই সঙ্কটের মধ্যে নিবেদিতা ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। জাহাজে উঠিবার সময়েই তিনি বেশ পরিবর্তন করিলেন ও মিস্ মার্গট এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিলেন। সেই নামেই এবং সেই পোশাকেই জুলাই মাসের মাঝামাঝি একদিন তিনি একাকী বোম্বাই বন্দরে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। কেহ কিছুই সন্দেহ করিল না।

এই ছদ্মবেশের প্রয়োজন ছিল। কারণ, তিনি ভারতে ফিরিবেন শুনিয়া বন্ধুরা নিবেদিতাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি এখানকার মাটিতে পা দিলেই পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবে।

১৯০৯ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি এক অপরাহ্ণে বোম্বাই বন্দরে জাহাজ হইতে নামিলেন এক সুবেশা য়ুরোপীয় মহিলা; পাসপোর্টে নাম লেখা রহিয়াছে—মিস্ মার্গট। জাহাজ তখনো বন্দরে পৌঁছায় নাই। ডেকের উপর দাঁড়াইয়া সেই মহিলা এক প্রিয়দর্শন ভারতীয়ের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আরেকজন ভারতীয় মহিলা—সেই ভারতীয়েরই স্ত্রী তিনি। বন্দরে জাহাজ ভিড়িবার পূর্বেই য়ুরোপীয় মহিলাটি তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। অবশেষে জাহাজ বন্দরে ভিড়িল। মহিলাটি ধীর পদবিক্ষেপে অন্যান্য যাত্রীদের সহিত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলেন। পরিধানে নূতন ফ্যাসনের পরিচ্ছদ, মাথায় পালক-লাগানো বড় একটি সাদা টুপি আর নিখুঁত কাট-ছাঁটের গাউন পরনে।

এই মহিলা নিবেদিতা।

সর্বপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হওয়াই তিনি ভারতে ফিরিলেন। কেহ কিছুই সন্দেহ করিল না। বোম্বাই হইতে কলিকাতা পর্যন্ত নিবেদিতা রিজার্ভ কামরায় আসিলেন। সতর্ক এবং অভিজ্ঞ বিপ্লবী তিনি। তাই সোজা পথে না আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে কলিকাতায় আসিলেন। ছদ্মবেশেই বাগবাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিন সপ্তাহ তিনি ঘরের বাহির হইলেন না। তখনো সেই বাড়ির ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের গতিবিধির উপর পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি রহিয়াছে। নিবেদিতার ফ্যাসান-দুরস্ত সাজ-পোশাকে কাহারও মনে কোনো সন্দেহ জাগিল না। আরো কিছুকাল তিনি এইভাবে নির্বিবাদে শহরে ঘোরাফেরা করিয়া পুরাতন কর্মকেন্দ্রগুলির সহিত পুনরায় যোগস্থাপন করিলেন।

নিবেদিতা কলিকাতায় পৌঁছিবার তিন মাস পূর্বেই অরবিন্দ আলীপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হইয়া, এক বৎসর কারাবাসের পর মুক্তিলাভ করিয়াছেন। নিবেদিতা আসিয়া দেখিলেন বিপ্লবের আন্দোলন স্তিমিত—দমন-নীতির প্রকোপে সারা বাংলা যেন ত্রস্ত; 'বন্দে মাতরম্'-এর তূর্য-নিনাদ নিস্তব্ধ। যখন-তখন যেখানে-সেখানে সন্দেহবশে খানাতল্লাসী লাগিয়াই আছে। ইহার প্রত্যুত্তরে যেখানে-সেখানে বোমা ফাটিতেছে। বাংলার আবহাওয়া আবার উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আলীপুর বোমার মামলায় বারীন্দ্র-প্রমুখ পনর জনের কঠিন শাস্তি হইয়াছে। টিলক প্রভৃতি অন্যান্য নেতাদের কেহ দ্বীপান্তরে, কেহ কারাগারে, কেহ বা কোনো দুর্গে বন্দী-জীবন যাপন করিতেছেন। বিপ্লবীদের কেহ আত্মগোপন করিয়াছেন ঘন অরণ্যে, কেহ বা গৈরিকবাসের অন্তরালে। বেলুড় মঠ পর্যন্ত পুলিশের দৃষ্টি হইতে রেহাই পায় নাই। এই পরিস্থিতির মধ্যে নিবেদিতা সেদিন ছদ্মবেশে কলিকাতায় ফিরিলেন। অরবিন্দ অধীর আগ্রহে নিবেদিতার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।···

৬নং কলেজ স্কোয়ার। কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' কার্যালয়।

একদিন নিবেদিতা আসিলেন এইখানে অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। দুই বৎসর পরে অরবিন্দ ও নিবেদিতা পুনরায় মিলিত হইলেন। নিবেদিতা আসিয়া দেখিলেন, অরবিন্দ বদলাইয়া গিয়াছেন। শীর্ণ মুখের মধ্যে অন্তর্ভেদী চক্ষু দুইটি কেবলমাত্র জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। এ যেন নূতন অরবিন্দ, নিবেদিতার মনে হইল। দুইজনে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল। অরবিন্দের টেবিলের উপর একখানি পত্রিকা পড়িয়া ছিল। নিবেদিতা উহা উঠাইয়া লইয়া দেখিলেন ইংরেজীতে লেখা রহিয়াছে: 'কর্মযোগিন্'। প্রচ্ছদপঠে কুরুক্ষেত্রের রথী ও সারথির চিত্র—তাহার নিম্নে গীতার সেই অমরবাণী উদ্ধৃত: "তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"। সম্পাদক—অরবিন্দ ঘোষ।

নিবেদিতা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, এক বছর তো জেলে ছিলেন, কি করে কাটালেন?

অরবিন্দ: যোগের অনুশীলন করেছিলাম এই সময়ে। জেলে গীতা আর উপনিষদ কাছে ছিল। গীতার সাহায্যে যোগ আর উপনিষদের সাহায্যে ধ্যান করতাম।

নিবেদিতা: জেলে আর কি নূতন অনুভূতি হলো আপনার?

অরবিন্দ: বিচিত্র সেই অনুভূতি—অবিশ্রাম বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর শুনেছি; তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করেছি। পনর দিন ধরে তিনি আমার সঙ্গে কথা কয়েছেন।

নিবেদিতার সমস্ত দেহ-মন শিহরিয়া উঠিল।

তারপর অরবিন্দ বলিলেন, জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম অনুবর্তীরা সবাই নিরুদ্যম, দলে ভাঙন ধরেছে। এবার আমার সাধনা হলো কর্মযোগীর আর মুখপত্র এই নতুন কাগজ 'কর্মযোগিন্'। এত দিন বলে এসেছি জাতীয়তাবাদ ধর্ম, এখন থেকে প্রচার করব সনাতন ধর্মই জাতীয়তাবাদ। বলব, সনাতন ধর্ম বিশ্বাসের ধর্ম নয়, জীবনে ফুটিয়ে তোলার ধর্ম। আরো বলব যে, কেবল রাজনীতি করলেই চলবে না, দেশের জীবন নতুন করে গড়তে হবে।

নির্বাক বিস্ময়ে নিবেদিতা শুনিতেছিলেন অরবিন্দের কথাগুলি। তাঁহার মনে হইল সদ্য কারামুক্ত রাজবিদ্রোহীর কণ্ঠে নূতন সুর আর 'বন্দে মাতরম্' অপেক্ষা গভীরতম সুর 'কর্মযোগিন্'-এর। বুঝিলেন, বহু শতাব্দীর ইতিহাস অতিক্রম করিয়া কুরুক্ষেত্রের রণভূমি হইতে আসিয়াছে সেই মহামানবের বাণী: 'হে অর্জুন! তুমি যোগী হও, যোগই কর্মের কৌশল'। সেই বাণীই আজ অরবিন্দের 'কর্মযোগিন্'-এর রচনায় প্রতিধ্বনিত। কিন্তু সেই সঙ্গে নিবেদিতার ইহাও মনে হইল যে, অরবিন্দের মতের এই বিপরীতমুখী পরিবর্তন লোকে সহজে গ্রহণ করিবে না, হয়ত কেহ উপহাসও করিবে। কিন্তু নিবেদিতা ইহাও জানেন যে, মানুষের মুখ চাহিয়া কথা বলিবার মানুষ অরবিন্দ

নহেন। তাঁহার সাধনা পুঁথির নির্দেশ মানিয়া চলে নাই কোনো দিন; তাহার ভিত্তি ছিল অন্তরেব স্বতঃ উৎসারিত অনুভূতি। তাঁহার চিত্তের প্রতিষ্ঠাভূমি ভারতীয় আদর্শের মধ্যেই।

আসল কথা কি জানেন, অরবিন্দ বলিলেন, জেলে থাকতেই বুঝেছিলাম—কর্মপন্থার পরিবর্তন দরকার। জাগ্রত দেশাত্মবোধকে আমি তাই উত্তেজনার পথ থেকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করতে চাই। দেশের স্বাধীনতা এখনো আমার ধ্যান-জ্ঞান জানবেন। আসুন, আবার দেশ-হিতৈষণার আগুন জ্বালিয়ে তুলি। নিষ্ক্রিয় নয়, শক্তির সক্রিয় রূপ দেখতে চাই। 'কর্মযোগিন'-এ লিখবেন তো? আমি আপনার প্রতীক্ষাতেই ছিলাম।

নিবেদিতা: নিশ্চয়ই লিখব। আপনার এই অনুভূতির মধ্যেই দুই যুগের সন্ধি হবে, দেখতে পাচ্ছি।

সেদিনের মত নিবেদিতা অববিন্দেব নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলেন।···

গভীর রাত্রি। আজ অরবিন্দকে দেখিয়া এবং তাঁহার কথা শুনিয়া নিবেদিতার মনে হইল তিনি যেন নবজীবনের মূর্ত প্রতীক, ভারতের পুরাতন মাটিতে উদ্ভিন্ন নবযুগের অঙ্কুর। মনে হইল, তাঁহার গুরু দেশকে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন অরবিন্দ যেন তাহারই যুক্তিসিদ্ধ ফলশ্রুতি। স্বামীজির সাধন-সংবেগ আজ যেন অরবিন্দের জীবনে খরস্রোত হইয়াছে। মনে পড়িল বিবেকানন্দের সেই বজ্রনির্ঘোষ—'হে ভারত, ওঠ, জাগ'। রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে নিবেদিতা যেন সেই কণ্ঠস্বর নূতন করিয়া শুনিতে পাইলেন অরবিন্দের কথাগুলির মধ্যে। তাঁহার অন্তর বলিয়া উঠিল—ভারতের প্রাচীন আচার্যদের উত্তরপুরুষ এই অরবিন্দ। যোগ-চেতনার গঙ্গোত্রী হইতে চিৎশক্তির মুক্তধারাকে প্রবাহিত করিয়া দিবেন তিনি সকলের জন্য। ক্ষত্রবীর আজ যোগী।

সেদিন নিবেদিতার মতন আর একজন অরবিন্দকে ঠিক এই-ভাবে চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ। দেশের পক্ষ হইতে, জাতির পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এই রাজবিদ্রোহীকে তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করিয়া লিখিয়াছিলেন : 'হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি তুমি'।

অরবিন্দ ও নিবেদিতা যে সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিয়াছেন, ইতিমধ্যে তাহা ভারতের বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কারামুক্তির পর অরবিন্দের পরিবর্তিত কর্মপন্থা দেখিয়া এবং তাঁহার 'কর্মযোগিন্' এবং 'ধর্ম' কাগজ দুইখানিতে নূতন সুর শুনিয়া যে যাহাই বলুক, ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দিবে যে, এই দুই মহাবিপ্লবীই বিংশ শতকের প্রথম দশকে ভারতে বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন।...

অরবিন্দের সহিত নিবেদিতা আবার কর্মক্ষেত্রে নামিলেন। অরবিন্দ বাংলার নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, জাতীয় দলকে কর্তব্য সাধনে আহ্বান করিলেন। এইভাবে লেখনী ও বক্তৃতার দ্বারা তিনি পুনরায় বাংলাকে উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আর দেশের যেন আগেকার মত সাড়া দিবার ক্ষমতা ছিল না। রাজনীতিক আন্দোলন একেবারে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। একা তিনি কি করিবেন? এক দিকে মধ্যপন্থীদের বিপক্ষতা, অন্যদিকে জাতীয় দলে নেতার অভাব। ১৯১০ সালের লাহোর কংগ্রেসে সভাপতি মালব্য প্রকাশ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের নিন্দা করিলেন; কোনো সংবাদপত্রই তাহার প্রতিবাদ করিল না। এই কংগ্রেসে টিলক নাই, বিপিনচন্দ্র নাই, অরবিন্দ নাই, এমন কি নিবেদিতাও নাই, যে নিবেদিতার প্রভাব কাশী কংগ্রেসে সকল দলের নেতাই অনুভব করিয়াছিলেন। দেশবাসীর সেই তেজ ও সাহস যেন কোথায় আজ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

দেশের ভাগ্যচক্র তখন অন্য দিকে ঘুরিতেছে।

১৯১০-এর প্রারম্ভেই ইংলণ্ড হইতে মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব ভারতে আসিয়া পৌঁছিল। ঠিক এই সময়েই বাংলার নির্বাসিত নেতৃবৃন্দ মুক্তি পাইলেন। নিবেদিতা এই নির্বাসিতদের মুক্তি উপলক্ষে তাঁহার বিদ্যালয়ের তোরণদ্বারে মঙ্গল-ঘট পাতিয়া উহা কদলীবৃক্ষ ও আম্রপল্লবে সজ্জিত করিলেন।

এই সময়ে একদিন নিবেদিতা অরবিন্দকে বলিলেন—শুনিলাম স্থরেন্দ্রনাথ ও ভূপেন বসু ইহারা এই শাসন-সংস্কার মানিয়া লইতে রাজী হইয়াছেন ?

অরবিন্দ: মডারেটদের পক্ষে এ-ই স্বাভাবিক। আপনার গোখলেও তো এই ভুয়া সংস্কার দুই হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

নিবেদিতা: আর একবার ইহার বিরুদ্ধে কলম ধরুন। দেশের লোককে বুঝাইয়া দিন, এই শাসন-সংস্কার ভারতবাসী যেন প্রত্যাখ্যান করে।

অরবিন্দ: কলম ধরিতে পারি; কিন্তু দেখিতেছি, দেশের ভাগ্যচক্র এখন অন্যদিকে ঘুরিতেছে। লর্ড মিণ্টোর বক্তৃতার প্রতিবাদ তো করিলাম—কত কবিয়া বলিলাম, ভারতের সন্ত্রাসবাদীরা অরাজকতা চাহে না, কোনো সায় দিলেন ?

নিবেদিতা: কিন্তু আপনি তো লোকের মুখ চাহিয়া কাজ করেন না।

তারপরই 'ধর্ম' পত্রিকায় দ্বিতীয় সংখ্যায় অরবিন্দ লিখিলেন: "শাসন-সংস্কারের ছায়ায় যে ভেদনীতি-বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে লর্ড মর্লি তাহা রোপণ করিয়াছেন; দেশহিতৈষী গোখলে মহাশয় জল সিঞ্চন করিয়া তাহা সযত্নে পালন করিতেছেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়কে ছলনা করা—ভেদনীতির ইহাই দ্বিতীয় অঙ্গ এবং শাসন-সংস্কারের বিষময় ফল। এই সংস্কারে বাঙালীর লেশমাত্র আস্থা নাই।"

কিন্তু অরবিন্দ ও নিবেদিতার সকল চেষ্টা বিফল হইল।...

দিন যায়। বোসপাড়ার ভাঙা বাড়িটির উপর দৃষ্টি পড়িল পুলিশের। বাহির হইতে দেখিতে বাড়িটি নিরীহ, কিন্তু ভিতরে উহা যেন একটি আগ্নেয়গিরি। এখানে অরবিন্দ ঘোষের আনাগোনা। এক দিন গভীর রাত্রে সদর দরজায় করাঘাত পড়িল। ভিতরে তখন অরবিন্দ ও নিবেদিতায় 'কর্মযোগিন্'-এর ভবিষ্যৎ লইয়া আলোচনা চলিতেছে। এত রাত্রে দরজায় করাঘাত। বুদ্ধিমতী নিবেদিতা বুঝিলেন, পুলিশ আসিয়াছে। কিন্তু অরবিন্দের মুখে উদ্বেগের লেশমাত্র নাই। তাড়াতাড়ি পোশাকের আলমারির মধ্যে তিনি অরবিন্দকে রাখিয়া দিলেন। দরজা খুলিয়া পুলিশের লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন অকম্পিত স্বরে—"কি চাই?"

"আরবিন্দ ঘোষকে।" উত্তর হইল।

"তিনি এখানে নাই।"

"আমাদের সংবাদ কিন্তু অন্যরূপ।"

পুলিশ তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিল। কিন্তু সেই বিপজ্জনক লোকটিকে কোথাও পাওয়া গেল না। পুলিশ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

ক্রমে কলিকাতায় অরবিন্দের টিকিয়া থাকা দায় হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে তিন বার তাঁহার নির্বাসনের গুজব উঠিয়াছে। কি করিবেন এখন তিনি। অরবিন্দ 'কর্মযোগিন্'-এর ম্যানেজার রামচন্দ্র মজুমদারকে এক দিন পাঠাইলেন নিবেদিতার নিকট পরামর্শের জন্য। নিবেদিতা তাঁহাকে বলিলেন: "তোমাদের কর্তাকে বলো কিছু দিন কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকতে; সেই ভাবেই তিনি অন্যের মারফৎ অনেক কাজ করতে পারবেন।" তারপর কয়েক দিন পরে নিবেদিতা নিজেই একদিন আসিয়া অরবিন্দকে বলিলেন—"ঈশপের সেই গল্পটি মনে আছে তো? পালে এক দিন সত্য সত্যই বাঘ পড়িতে পারে। ফাঁসির দড়ি আপনার গলার কাছ দিয়া একবার ফস্কাইয়া

গিয়াছে। মনে রাখিবেন, ইহাতে ইংরেজের কম আক্রোশ হয় নাই।"

পরদিন 'ধর্ম' পত্রিকায় অরবিন্দ লিখিলেন: "যাকেই নির্বাসন কর এবং যত লোককেই নির্বাসন কর, কালচক্রের গতি থামিবার নয়।" অরবিন্দ একদিন নিবেদিতাকে বলিলেন—"গ্রেপ্তার আপনাকেও তো করিতে পারে?"

নিবেদিতা হাসিয়া বলিলেন—"গায়ের চামড়ার রঙ্টাই যে ইহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আইরিশ বিপ্লবের কোলে মানুষ হইয়াছি—কারাগার বা নির্বাসনে আমার ভয় আছে মনে করেন? এই যে কলেজ স্ট্রীটে আপনার এই বাসায় কত লোক আসিতে ভয় পায় আর আমি কেমন স্বচ্ছন্দে দুই বেলা আসিতেছি যাইতেছি—পুলিশ কি দেখিতে পায় না মনে করেন?"

অরবিন্দ: নিশ্চয়ই দেখিতে পায় আর সেই সঙ্গে তাহারা ইহাও দেখিতে পায় যে, আপনি একজন মেমসাহেব, এ্যানার্কিস্ট নহেন।

কিন্তু গুজব একদিন সত্যে পরিণত হইবার উপক্রম হইল। কোনো এক সূত্রে নিবেদিতা খবর পাইলেন, সরকার অরবিন্দ ঘোষকে নির্বাসনে পাঠাইবার মতলব করিয়াছে। তিনি তখনই অরবিন্দকে সতর্ক করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। যেমন করিয়াই হউক অরবিন্দকে নির্বাসন হইতে রক্ষা করিতে হইবে—নিবেদিতার অন্তর বলিল। আর একদিন। নিবেদিতা বাগবাজার হইতে কলেজ স্ট্রীটে আসিলেন নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে। অরবিন্দ সেখানে নাই। সেখান হইতে নিবেদিতা ছুটিলেন ১৪নং শ্যামবাজার স্ট্রীটে 'কর্মযোগিন্' কার্যালয়ে।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। রাস্তার দুই একটি গ্যাসের আলো সবেমাত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছে। জনবিরল সেই রাস্তার অদূরে ছদ্মবেশে গোয়েন্দা-পুলিশ চৌদ্দ নম্বর বাড়িখানির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া নিঃশব্দে

ঘোরাফেরা করিতেছে। নিবেদিতা দরজায় কড়া নাড়িতেই একজন যুবক আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। নিবেদিতা ঝড়ের বেগে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন। দেখিলেন নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে, প্রশান্ত মনে অরবিন্দ একখানি তক্তপোষের উপর বসিয়া একমনে লিখিতেছেন।

"কী আশ্চর্য, আপনি এখনও নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছে?"

"দুশ্চিন্তার তো কোনো কারণ দেখিতেছি না।"

"আপনার নামে যে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইয়াছে। আজই, এই মুহূর্তে আপনাকে পলাইতে হইবে। কোথায় যাইবেন, বলুন?"

"ভগবান যেখানে লইয়া যাইবেন।" এই বলিয়া অরবিন্দ চুপ করিলেন। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে অতিবাহিত হইল। তারপর অরবিন্দ আবিষ্টের মত বলিলেন—"চন্দননগর।"

সেদিনও নিবেদিতা অরবিন্দের সেই নিরুদ্দেশ যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করিয়া দিতে বিস্মৃত হন নাই। এই টাকা তিনি জগদীশচন্দ্র বসুর নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়াছিলেন। সেদিন কেহই ইহা জানিতে পারে নাই। মন্ত্রগুপ্তিতে এমনি সিদ্ধ ছিলেন তিনি। এমন করিয়াই নিবেদিতা বাংলার সমস্ত বিপ্লবী শক্তিতে প্রেরণা জোগাইয়াছিলেন। যাইবার পূর্বে অরবিন্দ নিবেদিতার হস্তে 'কর্মযোগিন্'-এর সমস্ত ভার তুলিয়া দিয়া গেলেন।

অরবিন্দ নাই। নিবেদিতা এখন একা। তাঁহার চক্ষের সম্মুখেই স্বদেশী আন্দোলন দিন দিন মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে, এখন স্থির চিত্তে তাঁহাকে কাজ করিতে হইবে। অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটিল। আট বৎসর পূর্বে এক জনের অসমাপ্ত কার্যের গুরুভার দায়িত্ব লইয়াছিলেন তিনি। আজ আবার আরেক জনের আরব্ধ কার্য তাঁহাকে শেষ করিতে হইবে। একই ধরনের কাজ—ঠিক তেমন করিয়াই শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। গুরুর স্বপ্ন ছিল ভারতের

মুক্তি। অরবিন্দের স্বপ্নও তাই। এইবার মহাভারতের শেষ পর্বে পৌঁছাইলেন নিবেদিতা। রাত্রিতে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। গঙ্গা-বক্ষে হাজার তারার ঝিকিমিকি—যেন অগণিত আশার আলো। নিবেদিতার অন্তর অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হইল—"ওয়া গুরু কি ফতে।"

রাত্রির সেই নিস্তব্ধ প্রহরে গঙ্গার বীচিভঙ্গ দেখিতে দেখিতে নিবেদিতা একবার ক্ষণেকের জন্য পশ্চাতের দিকে চাহিলেন। বাংলার স্বদেশী অন্দোলনের পূর্বাপর ইতিহাস মনের মধ্যে একবার আলোচনা করিলেন। ইতিহাসের মহাক্ষণ তিনি একদা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন আইরিশ-বিপ্লবের মধ্যাহ্নে, সেই মহাক্ষণ এই বাংলা দেশেও তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন। প্রত্যক্ষ করিলেন একটি বিরাট ও বিপুল সমুদ্র-বন্যার মতন স্বদেশী আন্দোলন দেশে আসিল। তাহা কূল ভাসাইল, বাঁধ ভাঙিল, সকল সীমা অতিক্রম করিল। বাঙালী ইহার জন্য যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করিল, কষ্ট সহ্য করিল, তাহাতে লাভ কম হইল না। এই বন্যার পলি পড়িয়া সারা দেশ এবং সমগ্র লোকচিত্তে আজ যে উর্বরতা ও ফলোন্মুখতা আনিয়াছে, আগামী দিনের সাধনাকে তাহাই সম্ভব করিবে এবং তাহা হইতেই পরবর্তী কালের সাধকগণ প্রচুর ফসল উঠাইবেন। ইহা তো একটি আন্দোলন মাত্র নয়, ইহা যেন নব-জীবনের প্রতি স্তরে নব-জীবনের দুর্বার তরঙ্গাঘাত। আজিকার এই চিন্তা ও ভাবধারা, স্বপ্ন ও ধ্যান দূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত হইবে। গুরু বলিতেন, ভারতের স্বাধীনতা নিয়তি-নির্দিষ্ট, আজ হউক, কাল হউক এ-দেশ স্বাধীন হইবেই। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন, কি তাহারই সূচনা নয়? ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে এই আন্দোলন, আন্দোলন মাত্র নয়—ইহা অভ্যুত্থান ইহা অভ্যুদয়। অনেকের সহিত মিলিয়া তিনিও যে এই আন্দোলনের আভ্যুদয়িক রচনা করিতে পারিয়াছেন, ইহাই তো তাঁহার জীবনের গৌরব। নিবেদিতা ফিরিয়া আসিয়া সেই রাত্রেই "স্বদেশী

আন্দোলন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। মনের এই ভাবনা প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহারে নিবেদিতা লিখিলেন :

"এই স্বদেশী আন্দোলন কেবল রাজনীতিক জাগরণ নহে। পরন্তু আন্দোলনের প্রেরণায় সমাজ-চিত্ত, ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতি বাঙালীর জীবনের সর্বক্ষেত্র যেন সহস্রদল কমলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা আমাদের জীবনের সর্বপ্রান্তরে সব স্রোতধারা সৃষ্টি করিয়াছে ; এই আন্দোলন ভারতবর্ষকে তাহার আত্মোপলব্ধির আদর্শ দিয়াছেন। বাংলাদেশের অগ্নিসাধকেরা ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, যে-আদর্শ নিজেদের মধ্যে পাইয়াছেন, যে ভাবে তাঁহারা দুঃসাহসিক অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন আর আপনাদের অস্থিপঞ্জর জ্বালাইয়া তাঁহারা অন্ধকারময় পথে অগ্রসর হইবার জন্য যে মশাল রচনা করিয়াছেন—তাহা একটি ইতিহার সৃষ্টি করিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলন ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বাংলার একক সাধনা।"...

৪ঠা এপ্রিল 'কর্মযোগিন্'-এর শেষ সংখ্যা বাহির হইল। ইতিমধ্যে নিবেদিতা সংবাদ পাইয়াছেন, অরবিন্দ নির্বিঘ্নে পণ্ডিচেরী পৌঁছিয়াছেন। তারপর সকলের সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটাইয়া নিবেদিতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সঙ্গে পলাতক দেশনেতার প্রকৃত ঠিকানা ইংরেজি কাগজওয়ালাদের জানাইয়া দিলেন।

নিবেদিতার কার্য শেষ।

অধ্যাত্মশক্তির সহায়ে এক নূতন ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিবার বিরাট ব্রত-লইয়া অরবিন্দ চলিয়া গিয়াছেন। নিবেদিতা পড়িয়া রহিলেন একা।

শ্রীঅরবিন্দ **শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**

শ্রীঅরবিন্দের জীবন এবং তাঁর শিক্ষার গূঢ় তাৎপর্য সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। তার দর্শন হ'ল মানবাত্মার অশ্রান্ত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে গ'ড়ে তোলা এক সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ চিন্তাধারা। এই আধ্যাত্মিক প্রয়াসের শিখরে উঠে যাওয়া আমাদের মধ্যে অতি অল্প কয়েকজনের ভাগ্যেই ঘটে। কারণ তার জন্য প্রয়োজন দেহমনের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব, আর যে-জিনিস আরো দুরূহ—সূক্ষ্মের খাতিবে স্থূলের মায়া ত্যাগ করা। অতীতে ঋষিরা উঠে গিয়েছিলেন এই স্থূলের দাবীর ঊর্ধ্বে—যুদ্ধ-বিগ্রহের ঊর্ধ্বে—সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ঊর্ধ্বে—সৃষ্টির শাশ্বত সত্যসমূহেব অনুসন্ধানে।

ইতিহাসে আমাদের নিকটতর কালে দেখি শিখগুরু গোবিন্দ, শিষ্যবৃন্দের কাছ থেকে জাগতিক জীবন বিষয়ে তাঁর নেতৃত্ব-প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করলেন, বললেন এরকম ক্ষণভঙ্গুব জিনিস দিয়ে তাঁকে প্রলুব্ধ না করতে। তেমনি ১৯২২ সালে যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর রাজনীতিক যজ্ঞে শ্রীঅরবিন্দের সাহায্য চান তখন এই ঋষিও তাতে অস্বীকার করলেন, জানালেন, পূর্ণ আধ্যাত্মিক সিদ্ধির অপেক্ষা করছেন তিনি, তা না হ'লে মানবজাতির প্রকৃত উদ্ধারের চেষ্টা শুধু বিভ্রমের সৃষ্টি করবে।

মহাযোগীব এই আধ্যাত্মিক প্রয়াস সাধারণ লোকে বুঝতে পারে না। শুধু বোধ করি কালের আহ্বান আজকের মত অত সুতীব্র আর কখনো হয়ে ওঠে নি। ভারতের ব্যাধি আজ পার্থিব জীবনের উপাদানসামগ্রিক ন্যূনতা নয়। আধ্যাত্মিক সম্পদের ভাণ্ডার আজ তার দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। তার আত্মা খিন্ন, ক্রমেই আরো অলনত হয়ে চলেছে—কোন জয়ের লক্ষ্যে নয়, এমন এক সাংঘাতিক নৈতিক অধঃপতনের দিকে যে ভাবলেও ভয় হয়।

দেশের সরকারও এমনই এক পাপচক্রে বন্দী। নৈতিক আদর্শের সেখানে কোন মূল্য নেই। বড় বড় আদর্শের কথা, সে সব শুধু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের উচ্চ আসন থেকে উপদেশ হিসাবে বিতরণ করবার জন্য। যে-জাতি এক সময়ে এত মহৎ ছিল আজ সেখানে শুধু তার অতীত আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ মাত্র।

আসল কথা—আমরা আমাদের যথার্থ সংস্কৃতির পথ হারিয়ে ফেলেছি। একটা জাতির সংস্কৃতি, শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, মোটের ওপর বলা যেতে পাবে একটা জীবন চেতনার ত্রিবিধ প্রকাশ। তাঁর ভাষায়, 'এক রয়েছে চিন্তার দিক, আদর্শের দিক, উর্ধ্বমুখী এষণা এবং অন্তরাত্মার অভীপ্সার দিক; এক সৃজনক্ষম আত্মপ্রকাশের এবং উদার সৌন্দর্যবোধের দিক, বুদ্ধি ও কল্পনার দিক: আর এক রয়েছে বাস্তব কবিৎকর্মের এবং স্থূলের দিক।' সংস্কৃতির এই তিনটি দিকের মধ্যে প্রথমটি হ'ল দর্শন এবং ধর্ম নিয়ে; শিল্প, কাব্য, সাহিত্য, দ্বিতীয়টি নিয়ে, সমাজ ও রাজনীতি তৃতীয়টি নিয়ে। কিন্তু যে মূলভাবটি ভারতবাসীর জীবন, সংস্কৃতি ও সামাজিক আদর্শসমূহ নিয়ন্ত্রণ করছিল তা হ'ল মানুষের সত্যকার আধ্যাত্মিক সত্তার ও জীবনের সার্থকতার অন্বেষণ। এই মহান আদর্শ থেকে আমরা সরে গিয়েছি। আজ আমাদের সমস্ত কাজকর্মের প্রেরণা যোগায় একটা রক্তমাংসের ক্ষুধা, এমন কি সংস্কৃতির প্রথম দুটি ক্ষেত্রেও আমরা একে ছাড়িয়ে যেতে পারছি না। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার—আর্ত মানুষ যেখানে এসে শিখবে জীবনের শাশ্বত সত্য সব বিশেষ সার্থকতা রয়েছে। আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ তো এই। আর শ্রীঅরবিন্দের নামের সঙ্গে তার যোগ থাকা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্তই হয়েছে। আর তার শান্তিনিকেতনের সহোদরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সে-ও যে ভারতেরই রূপ নিল তা-ও ঠিক যথাযথ হয়েছে, কত মানব কত সভ্যতা এখানে এসে মিশল, আশ্রয় পেল। এই সমন্বয়, এই মিলনের ভাষা উপনিষদের তিনটি কথায় রূপ নিয়েছে—শান্তম্, শিবম্,

অদ্বৈতম্। শ্রীঅরবিন্দ এই কথাই বলেছেন। তিনি আরো এগিয়ে গিয়েছেন, বলেছেন ভারতের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির এই সমন্বয় স্পৃহা 'শুধু বেদনাস্তের দুর্গম শিখরগামী সাধক গুণী এবং মনীষীদের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকেনি, তা জনসাধারণের মনেও ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছে।'

এখানে, এই পুণ্য ভারতভূমিতেই, প্রথম সমন্বয়ের বাণী উঠেছিল, এখান থেকেই তা গিয়ে বিশ্ব জয় করেছিল, আর এখানে এই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে পণ্ডিতেরা মিলিত হবেন এবং ভারত তথা বিশ্বের সাংস্কৃতিক পুনর্জন্মের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় খুলে দেবেন। এ পর্যন্ত ভারতীয় সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক অবদানের কথাই আমি বললাম, যদিও এই অবদান এখনকার বোধির কর্ণে হয়ত প্রবেশ করবে না। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক আভ্যন্তরীণ মুক্তিই মানুষের জীবনে সত্যকার পূর্ণাঙ্গ শৃঙ্খলা গ'ড়ে তুলতে পারে। তবে তার এই মুক্তি মানুষের নিম্নতম শরীর, প্রাণিক এবং মানসিক, প্রকৃতিকে এড়িয়ে যেতে চায় না, যেতে পারে না। আধ্যাত্মিক যুগে এসে পৌঁছতে হ'লে উপরোক্ত তিনটি স্তরের তিন যুগের ভিতর দিয়ে আসতে হবে। তৃতীয়টি পৌঁছায় অন্তর্মুখীনতার যুগে। মধ্যবর্তী স্তরগুলি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে মানবজাতিরই বিপদ ডেকে আনা হবে, তা সম্ভব শুধু বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে। মানুষের আধ্যাত্মিক অভিযানে দেহ মন শরীরকে পূর্ণ মর্যাদা দিতেই হবে। তবু, পূর্ণতম সিদ্ধি হয়ত কয়েকজনের জন্যেই থাকবে, তবে যে অনুশীলন-প্রণালীর নির্দেশ তাঁরা দেন তা সর্বজনের জন্য, তাদের অজ্ঞান প্রকৃতি থেকে আধ্যাত্মিক জীবনে উঠে যাবার জন্য। এই অপরূপ প্রয়াস শ্রীঅরবিন্দের জীবনে কী রকম মূর্ত হয়ে উঠেছে। শ্রীঅরবিন্দের জীবন শুরু হয় ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার উদ্দীপনা নিয়ে। তার থেকে এক বিস্ময়কর ঘটনার সূত্রপাত—কারাগারে তিনি পেছেন ভগবৎদর্শন। রুদ্ধ বাতায়ন খুলে গেল—তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। যে অদম্য উৎসাহ নিয়ে

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়েছিলেন তিনি, সেই একই সমান উৎসাহ নিয়ে চললেন আত্মার মুক্তি-সন্ধানে। দুই অরবিন্দ তখন পরস্পর মিশে গেল—এক অরবিন্দ কর্মবীর যোদ্ধা, অন্য অরবিন্দ যোগী। তা' হ'লেও তাঁর প্রথম জীবনের দেশপ্রেমকে মণ্ডিত করেছিল একটা আধ্যাত্মিকতার সৌরভ। অরবিন্দ খাঁটি ভারতীয়। আমরা যখন তাঁর বই পড়ি তখন মনে হয় যেন তাঁর মূর্তি আমাদের শুচি-শুভ্র শাস্ত্রগ্রন্থের পৃষ্ঠা থেকে ভেসে উঠছে, সেখানে সঞ্চিত সমস্ত জ্ঞানের প্রতিমূর্তি যেন তিনি, এক যুগসন্ধিক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে সে-জ্ঞান হয়ে উঠেছে আরো জীবন্ত। আমি নিশ্চিত জানি এই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে দাঁড়াবে পৃথিবীর আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক—হিংসা-দ্বেষ, সন্দেহহীন সংঘাতে আকীর্ণ ঊষর মরুভূমিতে শ্যামল মরূদ্যানের মতো।

১৯৫১ সালে পণ্ডিচেরীতে 'অরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রের' প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ।

শিক্ষাবিদ শ্রীঅরবিন্দ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

শ্রীঅরবিন্দ যে-যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে-যুগকে গৌরবান্বিত করিয়া দিয়াছেন, সেই যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের তিনি অন্যতম। শিক্ষাবিদ রূপে তিনি বরোদায় কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং কলকাতায় তাঁহার ছাত্রদিগকে আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিবার অধিক সুযোগ লাভ করিবেন মনে করিয়াই তিনি শিক্ষাবিদের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বরোদা ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সংগ্রাম কেবল অর্থনীতিক ও রাজনীতিক নয়, পরন্তু মনস্তত্ত্বসম্পর্কিতও বটে।

…তিনি ভবিষ্যৎ পৃথিবীর দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। সেই ভবিষ্যতে তিনি যে নূতন পৃথিবী দেখিয়াছিলেন আধ্যাত্মিকতাই যে তাহার রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিতে পারে সে বিশ্বাস তাঁহার মর্মে দৃঢ় হইয়াছিল। ইতিহাসের শিক্ষায় তিনি বুঝিয়াছিলেল…ভারতবর্ষ এখনও জীবিত আছে—তাহার আধ্যাত্মিকতাই তাহাকে মৃত্যুঞ্জয়ী করিয়াছে।…

রাজনীতিক স্বাধীনতা মুখ্য লক্ষ্য নহে—উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তাহার প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে মনুষ্যত্বের পূর্ণ-বিকাশ। আজ দেশে যে শিক্ষা প্রচলিত তাহা সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল নহে। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, 'আমরা শিক্ষার নূতন উদ্দেশ্য কেবল বুঝিতেছি। শিক্ষার্থীকে তাহার মানসিক, শৌর্যবিষয়ক, আবেগসম্পর্কিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তা ও সামাজিক জীবন, তাহার স্বভাব ও শক্তি অনুসারে পুষ্ট করিতে হইবে।' তাহার সহিত বর্তমান শিক্ষার প্রভেদ সপ্রকাশ—বর্তমান শিক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রতিরোধকারী মস্তিষ্কে অবিচলিত জ্ঞান এবং তাহার বিরোধী প্রবলভাবে স্থিতিস্থাপকতা-বর্জিত নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করাই উদ্দেশ্য।

…শিক্ষাপদ্ধতি শ্রীঅরবিন্দের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে

হইবে। সেইজন্য প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, তাহা কেবল বিদ্যাই দিবে না, পরন্তু শিক্ষার্থীকে উন্নত জীবনের পথে অগ্রসর করিবে।...যে নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়াছিলেন তাহাবই উপযুক্ত সমাজ সৃষ্টি করিবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি। জাতিধর্মনির্বিশেষে পৃথিবীর যে-কোনও ভাগ হইতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া জ্ঞানের যে-কোনও বিভাগে শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে।

এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ সাধারণ নহে—কিন্তু কিন্তু ইহার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহারই ন্যায় অসাধারণ পুরুষের উপযুক্ত।

...ব্যথিত পীড়িত ও হতাশ পৃথিবীব পুনরুজ্জীবিত করিবার—প্রাচী-র পক্ষাঘাতগ্রত শিরায় শোণিত সঞ্চারিত কবিবাব ও প্রতীচীর জড়বাদ-বিড়ম্বিত ব্যাধি প্রাচী-র আধ্যাত্মিকতার দ্বাবা আরোগ্য করিবাব জন্য যে মহাসত্যের পাবনীধাবাব প্রয়োজন—এই শিক্ষা-কেন্দ্রের উৎস হইতে তাহা উদ্‌গত হইবে। তাহা হইলেই উদ্ভূত হইবে নবধরণী।

আমরা আশা করি, সেই বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষার বিস্তার সাধন করিয়া যে প্রশস্ত দিবা-র সূচনা করিবে, তাহা নূতন উষার কনককিরণে সমুজ্জ্বল হইয়া মানবজাতিকে অভূতপূর্ব উন্নতির রাজ্য লইয়া যাইবে।

আমরা যে দেশমাতৃকার পূজা করি—যাহার মন্দিরে শ্রীঅরবিন্দ পূজারী ও পুরোহিতেব কাজ করিয়াছেন—সেই দেশমাতৃকার আশীর্বাদে এই পরিকল্পনা পূত। আজ শ্রীঅরবিন্দের কণ্ঠ নীরব—লেখনী স্তব্ধ; কিন্তু তিনি যেন তাঁহার সমাধির অন্তরাল হইতে তূর্যনাদে মানবসমাজকে বলিতেছেন :

When all the temple is prepared within,
Why nods the drowsy worshipper outside ?

আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের (পণ্ডিচেরী) প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের একটি ভাষণ।

মহাপ্রয়াণ নলিনীকান্ত সরকার

…২২ নভেম্বর [১৯৫০ সাল] বোম্বাই থেকে আশ্রমে ফিরেছি। এসে শ্রীঅরবিন্দের অসুস্থতার খবর শুনতে পাই নি কারও কাছ থেকে। ২৪ নভেম্বর দর্শনের দিনে সর্বপ্রথম শুনলাম তাঁর অসুখের কথা। অন্যান্য বারের তুলনায় এবারের দর্শন শেষ হয়েছিল খুব তাড়াতাড়িতে। তাহ'লেও প্রায় তিন ঘণ্টা ধ'রে অন্যূন আড়াই হাজার দর্শনার্থীকে তিনি দর্শন দিয়েছিলেন। প্রতিবারে যেমন তাঁকে দর্শন করি, এবারেও তেমনি দর্শন করলাম। রোগাক্রান্ত ব'লে মনে হয় নি। আশ্রমবাসী দু' একজন বন্ধুর কাছে শুনলাম—শ্রীঅরবিন্দ অসুস্থ—কিড্‌নীর অসুখ। পরদিন অর্থাৎ ২৫ নভেম্বর প্রাতঃকালে তিনি পূর্বব্যবস্থানুযায়ী মাদ্রাজের প্রদেশপালকে বিশেষ দর্শন দান করলেন। শুধু ক্ষণিকের দর্শন নয়—সস্ত্রীক প্রদেশপাল মহোদয়ের সঙ্গে আধঘণ্টাকাল আলাপ ও অলোচনা। সুতরাং বুঝে দেখ, রোগ যেমনই হয়ে থাকুক, তাঁর কাছে সে-রোগের গুরুত্ব বিশেষ কিছু ছিল না।

রোগ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা বড়-একটা শুনি নি। কয়েকজন সাধক,—যাঁরা শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিগত পরিচর্যার জন্য নির্দিষ্ট—তাঁরা অনেকেই প্রত্যহ আসতেন খেলার মাঠে। বেশ উৎসাহভরেই তাঁরা ব্যায়ামাদি শরীরসাধন করতেন, কোনদিন কোন একটি মুহূর্তের জন্যও তাঁদের মুখে উদ্বেগের চিহ্নমাত্রও দেখি নি বা তাঁদের কাছ থেকে অসুখের গুরুত্ব সম্বন্ধে কোন কথা শুনি নি। ১লা ডিসেম্বর আশ্রমের স্কুলের প্রতিষ্ঠাদিবস। সারা বৎসরের মধ্যে এই দিনটি আশ্রমের আনন্দোৎসবের একটি বিশেষ দিন। এই প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে ১ ও ২ ডিসেম্বর নৃত্য, গীত, অভিনয়, আবৃত্তি

প্রভৃতি আমোদপ্রমোদ এবং মার্চ, ড্রিল ও নানা প্রকার দৈহিক ক্রীড়া কৌশলের অনুষ্ঠান করেন আশ্রমের ছেলেমেয়েরা। এ দুটি দিনের অনুষ্ঠানে আনন্দ ও উৎসাহের আদৌ অভাব ছিল না। ৪ ডিসেম্বর সোমবারেও খেলার মাঠে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত খেলাধূলা চলেছে। সেই রাত্রেই (ইংরেজি মতে ৫ ডিসেম্বর) ১টা ২৬ মিনিটে শ্রীঅরবিন্দ মহাসমাধিলাভ করেন।

খবরটি পেলাম ৫ ডিসেম্বর ভোরবেলায়। আমাদের কাছে এ সংবাদ অকস্মাৎ বজ্রঘাতের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কিন্তু এ আঘাতের বেদনা স্থায়ী হয়েছিল অতি অল্পক্ষণ। খবর পেয়েই গেলাম শ্রীঅরবিন্দের দেহ দর্শন করতে। প্রথম দর্শনে বিস্ময়-বিমূঢ় হ'যে গেলাম। পালঙ্কে শায়িত সে দিব্যদেহ। ধ্যানস্তিমিত নেত্রে যোগনিদ্রায় সমাহিত মহাযোগী,—সারা দেবে প্রবহমান সুস্নিগ্ধ কান্তি, সারা দেহে বিচ্ছুরিত হিরণ্যপ্রভ দিব্যদ্যুতি—সকল মিলে এক বিরাট মহিমময় দৃশ্য, স্বচক্ষে দর্শন ক'রে উপভোগ করবার এ দৃশ্য ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যায় না এ অসম্ভাবনীয় দৃশ্যের।

সকালবেলাতেই সারা দেশে শ্রীঅরবিন্দের মহাসমাধির সংবাদ প্রচারিত হ'লো। পণ্ডিচেরি ও আশেপাশের অঞ্চলের ভিড় জমতে লাগলো ক্রমে ক্রমে। আশ্রম অবারিত দ্বার। লক্ষপতির পশ্চাদ্বর্তী হ'য়ে চলেছে ভিক্ষাপাত্র হস্তে পথচারী নগ্নপ্রায় ভিখারী, এইরূপ সহস্র ব্যক্তি—আবালবৃদ্ধবনিতা—দলে দলে অবিরাম গতিতে চলেছে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাদের মৌন শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। দর্শনের পিপাসা তাদের যেন মেটে না,—বারংবার দর্শনের জন্য ছুটে আসে একই ব্যক্তি। দ্বিতীয় দিনে শ্রীঅরবিন্দের দেহ সমাধিস্থ হবার কথা। কিন্তু দ্বিতীয় দিবসে শ্রীমা আশ্রমে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেন যে, শ্রীঅরবিন্দের দেহে অতিমানস-জ্যোতি সঞ্চারিত হ'য়ে আছে ব'লে এ দেহ বিকৃত হচ্ছে না, যতদিন দেহ অবিকৃত অবস্থায় থাকে, ততদিন তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে না। এ সংবাদ সংবাদপত্রে প্রচারিত

হওয়া মাত্র ছুটে এলেন দূরের যাত্রীরা এ অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখবার জন্য। কিন্তু প্রমাদ গণলেন ফরাসি সরকার। ফরাসি আইনে কোনও শবদেহ আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশি অসমাহিত অবস্থায় রাখা অবিধেয়। ৭ ডিসেম্বর ফরাসি সরকাবের ডাক্তার এই বে-আইনী ব্যাপারের তদন্ত করতে এলেন। আটচল্লিশ ঘণ্টা পরেও প্রাণহীন দেহের কোনও বিকৃতি নাই,—নির্বিকার, নির্মলিন, রোগনির্মুক্ত জ্যোতিরুজ্জ্বল দেহ। কৃতবিদ্য ডাক্তার তাঁর শারীরবিজ্ঞানের অধ্যায়ে এ রহস্যের কোন প্রকার কূলকিনারা না পেয়ে দেহ-সংরক্ষণের অনুমতি দিয়ে চলে গেলেন।

আরও যাট ঘণ্টা কেটে গেল। ৯ ডিসেম্বর বেলা বারোটার সময় আমরা খবর পেলাম যে, সেইদিন অপরাহ্নে দেহ সমাধিস্থ করা হবে। আমরা দেহ দর্শন করতে গেলাম বেলা আড়াইটায়। তখনও সে-দিব্য-আলোকের শেষ-রশ্মি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নি,—দীপ্তি যেন কমে এসেছে। ১১২ ঘণ্টা পরে সেই দিনই দেহ সমাধিস্থ করার আয়োজন হ'তে লাগলো আশ্রমের অঙ্গনে। দেহের অনুপাতে অধিকতর লম্বা চওড়া এবং উঁচু একটি বৃহদায়তন কাষ্ঠাধারের ভিতরের দিকটা রূপোর পাত দিয়ে মোড়া;—সেই আধারে সংরক্ষিত হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের দেহ। ভূ-নিম্নে একটি সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠ খনন ক'রে সেই দেহাধার সেখানে সযত্নে স্থাপন করা হ'ল। দেহাধারের ঊর্ধ্বভাগে অনেকটা স্থান শূন্য রেখে ভূ-গর্ভের মুখ বন্ধ করা হয়েছে একটি আবরণীর দ্বারা। তার উপরে সিমেণ্ট ও কংক্রীটের প্রলেপ। ভূ-গর্ভস্থ এই কক্ষটির পার্শ্বে ক্ষুদ্রতর আর একটি কক্ষ খনন ক'রে সেটিকে পূর্ণ করা হয়েছে মাটি দিয়ে। দুইটি কক্ষই পরস্পর-সংলগ্ন—একই পরিবেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত। ৯ ডিসেম্বর অপরাহ্ণ পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের দেহ সমাধিস্থ হ'য়ে গেল।

অনেকে প্রশ্ন করেছেন, শ্রীঅরবিন্দ কি আগে থেকে তাঁর এই মহাসমাধির কোন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন? তিনি কি স্বেচ্ছায় দেহরক্ষা

করলেন? শ্রীমা কি পূর্বে কোন আভাস দিয়েছিলেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।—না, তাঁরা এ সম্বন্ধে পূর্বে কিছু বলেন নি। তাঁরা কিছু না বললেও পূর্বের কতকগুলি ঘটনা আমাদের অনুসন্ধিৎসু মনে একটু চিন্তা জাগিয়ে দেয় বৈকি। সেই কথাই বলছি।

তোমরা হয়তো জান, শ্রীঅরবিন্দ ইদানীং তাঁর ফটো তুলতে দিতেন না ইদানীং বলতে কোন স্বল্প সময়েব ব্যবধান নয়,—অন্তত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর। বর্তমানে যে-সব ফটো দেখতে পাওয়া যায়, সে-সব সেই সেকালের তোলা। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কারও পক্ষে তাঁব ফটো নেওয়া সম্ভবপর হয় নি। কিছুদিন পূর্বেও আশ্রমের মধ্যে ফটো-ক্যামেরা নিয়ে কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। ফটো তোলা সম্পর্কে এত সতর্কতা, এত বাধা-নিষেধ, এত কড়াকড়ি। সেই বন্ধন শিথিল হ'য়ে গেল গত এপ্রিল মাসে। একজন বিদেশী ফটোগ্রাফার-সাংবাদিক ২৪ এপ্রিলের দর্শনে এসে শ্রীঅরবিন্দের ফটো তোলবার বাসনা জানালেন। বাসনা পূর্ণ করবার জন্য তাঁকে আদৌ কষ্ট করতে হ'লো না। দর্শনের সময় তিনি মা ও শ্রীঅরবিন্দের ফটো তুললেন। শোনা গেল, আলোকের অল্পতার জন্য ফটোর সাফল্য সম্বন্ধে চিন্তিত হ'য়ে ফটোগ্রাফার আবেদন করেছেন, আলোকোজ্জ্বল কক্ষে তিনি আবার শ্রীঅরবিন্দের ফটো তুলবেন। পরদিন সকাল-বেলায় তাঁব মনোবাসনা পূর্ণ হল। কে জানে, এবারে এই ফটো তোলার বাধানিষেধ-প্রত্যাহারের পিছনে কোন অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল কি-না।

আর একটি ঘটনা গত বিজয়া-দশমীর দিনে। শ্রীমা প্রতি বৎসরে বিজয়া-দশমীর রাত্রে আশ্রমবাসীদের বিশেষ আশীর্বাদ দিয়ে থাকেন। এবারে বিজয়া-দশমীতে মা যে বাণীটি দিয়েছিলেন, এ জাতীয় বাণী তিনি পূর্বে কখনও দেন নি। বাণীটি এই: 'It is the devil of depression and despondency that we shall slay to-night—so that all those who have the sincere

will to get rid of this disease will receive the necessary help to conquer.' আমাদের আরও বড় বড় অসুর বা রিপু আছে, সেগুলিকে ছেড়ে মা সর্বাগ্রে depression আর despondency-কে বধ করতে উদ্যত হলেন কেন, সেটা তখন বিশেষ চিন্তার কারণ হ'য়ে উঠেছিল। ঐ দুটি অসুরই যে আমাদের আক্রমণ করবার জন্য অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে, সেদিন তা বুঝতে পারি নি। আজ সে চিন্তার নিরসন হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের মহাসমাধির পরে আশ্রমবাসীদের চিত্তে হতাশা বা অবসাদের চিহ্নমাত্রও নাই আজ।

এবার শ্রীঅরবিন্দের মহাকাব্য 'সাবিত্রী'-র কথা শোন। তিনি 'সাবিত্রী' সম্পূর্ণ করে রেখেছেন কেবলমাত্র একটি canto ছাড়া। এই একটি canto ছাড়া বাকি সমস্ত গ্রন্থই তিনি ভালো ক'রে সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করেছেন : কেবল সেই canto-টির নামকরণ করে রেখেছেন মাত্র, একটি লাইনও লেখেন নি। Canto-র নাম Book of Death, জানি না, এ অলিখিত কাণ্ডটি লিখে 'সাবিত্রী' পূর্ণাঙ্গ করবে কে এবং কবে?

এই ঘটনাগুলির সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের মহাসমাধির কোন যোগসূত্র আছে কি না, ভেবে দেখো। এ রকম আরও দু-একটি ঘটনা আছে, যার সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তার উদ্রেক হয়।

আর একটি প্রশ্ন এসেছে বন্ধুদের কাছ থেকে যে, তিনি তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ রেখে গেলেন কেন? এ প্রশ্ন করা যেমন ভুল, প্রশ্নের উত্তর দিতে যাওয়াও তেমনি আমাদের পক্ষে অনধিকার চর্চা। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা শ্রীঅরবিন্দেরই সানা। ধরণীর বক্ষে অতিমানবের অবতরণ এবং দেহমন-বুদ্ধি রূপান্তরিত হ'য়ে মানবের অতিমানবে বিবর্তন,— এ সত্যের সাধনা একমাত্র শ্রীঅরবিন্দই করেছেন। মানবজাতির ইতিহাসে এ সাধনার কোনও উল্লেখ নেই। সুতরাং এ সাধনার কথা বলবার অধিকারী তিনিই। এই সাময়িক তিরোধান তাঁর দিব্যরূপান্তর সাধনারই অঙ্গীভূত হওয়াও অসম্ভব নয়। আমাদের শ্রীমা বলেছেন,

'যা-কিছু তিনি বলেছেন সবই সত্য এবং সত্য র'য়ে যাবে। সময় এবং ঘটনার ধারা এ কথার পূর্ণ প্রমাণ দেবে।'

আশ্রমের কথা জানতে চেয়েছ? আশ্রম যেমন পূর্বে চলছিল, তেমনি চলছে। আশ্রমবাসীদের চিত্তে বিশেষ কোন বৈকল্য দেখা দিয়েছে বলে মনে হয় না। এর কারণ আছে। শ্রীঅরবিন্দ তো আশ্রমবাসীদের কাছে বরাবরই অন্তরালে থাকতেন। প্রায় আটশো আশ্রমবাসীর মধ্যে মাত্র ৫।৬ জনের সঙ্গে চাক্ষুষ সম্বন্ধ ছিল। বাদবাকি সকল আশ্রমবাসীর কাছে তিনি ভগবানেরই মতন ছিলেন অন্তরালের দেবতা। বৎসরে মাত্র চারটি দর্শন-দিবস বাদে বাকি তিনশো একষট্টি দিনের যে অবস্থা, আশ্রমের বর্তমান অবস্থা ঠিক সেই রকম। শ্রীমা বরাবরই আছেন সকলের পুরোভাগে। আমাদের আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক—ত্রিবিধ সমস্যারই সমাধান পূর্বেও করতেন তিনিই। মায়ের সঙ্গেই আমাদের আন্তর ও বহির্জীবনের সম্বন্ধ। শ্রীঅরবিন্দ ও মা আমাদের কাছে অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি;—দুইয়ে এক বা একই দুই। একের বর্তমানে দুইয়েরই অস্তিত্ব। সুতরাং আমাদের কাছে শ্রীমায়ের উপস্থিতির সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের উপস্থিতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হ'য়ে আছে। তাই আমাদের আশ্রমে নাই অভাবের অনুভূতি, বিষাদের ছায়া, শোকের অশ্রু।

শ্রীঅরবিন্দ-কথা

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দকে আমরা দেখি নি। আজকের স্বাধীন বাংলার যারা তরুণ-তরুণী, তারা রূপকথার গল্পের মতন শুনেছে, উনিশশো পাঁচ-এ বাংলাদেশে এসেছিল যে প্রাণের জোয়ার, তার কথা। রূপকথার গল্প শুনতে ভাল লাগে, প্রতিদিনের জীবনের বাস্তবতায় তা যোগাতে পারে না চলৎ-শক্তি, প্রাণরস। সে হলো সুদূর। আজকের বাঙালী তরুণ-তরুণীদের কাছে তার ইতিহাসের সেই অতি-নিকটবর্তী স্বর্ণযুগ পড়ে আছে সুদূর রূপকথার মতনই। সে-যুগ থেকে এ-যুগে যাতায়াতের যে পথ, একান্ত বেদনার বিষয়, তা গিয়েছে হারিয়ে আজকে আমাদের কাছে।

আমাদের যৌবনে, আমাদের জাগরণ-লগ্নে, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভয়-ভাবনায় আমাদের উন্মীলিত চেতনায় আমরা দেখেছি গান্ধী-মহারাজকে, দেশবন্ধুকে, সুভাষচন্দ্র আর পণ্ডিত নেহরুকে, আমরা শুনেছি সত্যাগ্রহের বাণী, অহিংসার মন্ত্র, অসহযোগের নিরুপদ্রব সংহিতা, কংগ্রেসের বিজয়-দুন্দুভি। আমাদের যৌবন, কংগ্রেসের যৌবন। আমাদের বাস্তবতা, কংগ্রেসের বাস্তবতা। একটা সম্পূর্ণ নতুন সংগ্রামের মধ্যে, একটা সম্পূর্ণ নতুন চেতনার মধ্যে আজকের তরুণ-তরুণীদের চেতনা গড়ে উঠেছে।

আমাদের চেতনায় চোখের সামনে জাগতে দেখেছি কংগ্রেসী ভারতবর্ষকে, চোখের বাইরে দেখেছি লেনিন-স্টালিনের সোভিয়েট রাশিয়াকে। আমাদের ইতিহাস-পুরুষ হলো দেশে গান্ধী-মহারাজ, দেশের বাইরে লেনিন-স্টালিন। আমাদের চেতনার আকাশকে পরিব্যাপ্ত করে আছে গান্ধী, লেনিন আর স্টালিনের ব্যক্তিত্বের দ্যুতি। এবং এই দ্যুতির বাস্তবতার আড়ালে সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে

গিয়েছে বাংলাদেশে সেই যুগ, যাকে এনেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ, ধারণ করেছিলেন বিবেকানন্দ, পোষণ আর পালন করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ।

গান্ধী-মহারাজকে আমরা দেখেছি জয়ী হতে, দেখেছি কংগ্রেসকে নিতে ইংরেজের হাত থেকে দেশের শাসনভার, দেখেছি গান্ধী-মহারাজের জীবনের অপূর্ব এপিক অবসান।

দেশের বাইরে দেখেছি জগতের বিরোধিতার বিরুদ্ধে স্টালিনকে জয়ী হতে, দেখেছি চোখের সামনে কম্যুনিস্ট রাশিয়াকে এক যুগের মধ্যে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হতে,...দেখেছি জগতে অজেয় বলে ঘোষিত হিটলারের শক্তির বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট বাশিয়ার এপিক সংগ্রামের গৌরব।...তাই আমাদের যৌবনের সমস্ত বীরপূজার ক্ষুধা মিটিয়ে আমাদের চেতনার আকাশকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন গান্ধীজী, স্টালিন আর নেতাজী...আমাদের সমস্ত তত্ত্বপিপাসাকে কেন্দ্র করে রয়েছে গান্ধীবাদ আর মার্কসবাদ, সেখানে শ্রীঅরবিন্দের স্থান কোথায়? শ্রীঅরবিন্দ যে-জীবন-তত্ত্বের বাহক, সেখানে কি মূল্য সে-তত্ত্বের?

আজ বাংলাদেশে, আমার চারদিকে অসংখ্য অগণিত লোক রয়েছেন, যাঁরা জানেন না বাংলার ইতিহাসে এবং মানব-সভ্যতার ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দের স্থান কোথায়। অধিকাংশ লোকের কাছে শ্রীঅরবিন্দ হলেন, অতি-দুর্জ্ঞেয় অতি-মানসনামধেয় কোন এক রহস্যময় তত্ত্বের ততোধিক রহস্যময় প্রবর্তক, বিপ্লব-আন্দোলনের ভূতপূর্ব একজন নেতা,—ভারতবর্ষের জল-হাওয়ার গুণে যিনি কর্মবিমুখ হয়ে সংগোপন-সন্ন্যাসের মধ্যে শিষ্য-সামন্ত নিয়ে নিশ্চিন্ত আশ্রমতরুর জীবন-যাপন করে গেলেন। এবং পাশ্চাত্য সাইকোলজীর ছাত্র হিসাবে কোন কোন বিজ্ঞ মনে করেন, আজকের এই কর্মমুখর যুগে শ্রীঅরবিন্দের এই সংগোপন-সন্ন্যাসজীবন হল, বিজ্ঞ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের ভাষায়,

এস্কেপিজিম্, অর্থাৎ আমাদের দেশেব গেঁয়ো লোকেরা যাকে বলে, পালিয়ে বাঁচা।

কেউ কেউ অত বিচার-বিবেচনার মধ্যে না গিয়ে, অন্তরের সহজ শ্রদ্ধায় তাঁকে একজন চিরাচরিত মহাযোগী বলে ধরে নিয়েই সন্তুষ্ট, যিনি পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে আমাদের প্রাচীন ভাবধারাব একটা সমন্বয়-চেষ্টা করেছিলেন। আর একদল আছেন যাঁবা দক্ষিণেশ্বব আর পণ্ডিচেরীকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান মনে করেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যাঁরা চিরাচরিত প্রথায় কোন্-দেবতা-বড় সেই ঝগড়ায় আসর গরম কবে রাখতে চান। এবং সর্বশেষে আমাদের দেশে এমন লোকও আছেন, যাঁরা শ্রীঅববিন্দ সম্পর্কে প্রকাশ্যে অতি হেয় উক্তি করতেও লজ্জিত হন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণেব জীবদ্দশায় যেমন এই দেশেরই এক শ্রেণীব লোক অবজ্ঞায় তাঁকে বাতুল বলে উপেক্ষা করতো।

এই পরিস্থিতিব মধ্যে সহসা শ্রীঅরবিন্দ এমনভাবে দেহরক্ষা করলেন যে, তাঁর সম্বন্ধে সাধারণ লোকের রহস্যবোধ আরো বেড়েই গেল।...

আজও দেখছি সেই এক দৃশ্য, পরশ-পাথরের সন্ধানে ক্ষেপা জনসমুদ্রের কূলে কূলে নুড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে...আজও সে জানে না, নুড়ি মনে করে সে পরশ-পাথরকেই কখন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সমুদ্রের অতলে।

মহাবেদনায় তাই আজ ভাবি, মানবসভ্যতার ইতিহাস কি অনাদিকাল ধরে হয়ে থাকবে সেই একই ভুলের নিত্য নব পুনরাবৃত্তি?...তার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা-বিজ্ঞান সত্ত্বেও কি বার বার সে সোনার মূল্যে রাঙতা কিনেই চলবে? যে অমূল্য বস্তুকে সে মনে মনে খুঁজছে, বাইরে বার বার মূল্যহীন বলে তাকেই কি করবে প্রত্যাখ্যান? ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ বার বার কি মানুষের কাছে এসে ফিরে যাবে মানুষের উপেক্ষা আর অনাদর নিয়ে? কত বুদ্ধ,

কত যীশু, কত শঙ্কর, কত চৈতন্য, কত রামকৃষ্ণ, কত বিবেকানন্দ, কত শ্রীঅরবিন্দের প্রয়োজন, শুধু একটা সহজতত্ত্ব মানুষকে বোঝাতে ? যে দেশের মাটিতে আজও পড়ে আছে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর বিবেকানন্দের পায়ের চিহ্ন, সে দেশের লোকের কাছে কেন থাকে শ্রীঅরবিন্দ অপরিচিত ?

যে বেদনায় বিবেকানন্দকে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল, যে বেদনায় মহাত্মা গান্ধীকে সজ্ঞানে মৃত্যুকে আহ্বান করতে হয়েছিল, হে তরুণ ভারত, তুমি যদি আজও তা উপলব্ধি না কর, তা হলে কে তা উপলব্ধি করবে ?

আজও কি তুমি উপলব্ধি করতে পারলে না, সেই একই মহাবেদনায় তোমার ভারতবর্ষের আর একজন মহা-ঋষি মৃত্যু-উত্তীর্ণ হবার মহাসাধনায় স্বেচ্ছায় মৃত্যুর তলদেশে অবগাহন করলেন ?

মানবসাধনার এত বড় পরীক্ষা তোমার সামনে সংঘটিত হয়ে গেল, অথচ তুমি নির্বিকার, নিশ্চেতন ! এই ঐতিহাসিক অন্ধতার অভিশাপ থেকে কবে মুক্ত হবে, হে আমার তরুণ ভারত !

ভারতবাসী হিসাবে আমার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিশ্বাস হলো, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ভারতবর্ষের একটা বিশেষ স্থান আছে, মানবচেতনার একটা বিশেষ সত্যকে জন্ম দেওয়াই হলো ভারত-ইতিহাসের নিগূঢ় সার্থকতা এবং মানব-সভ্যতার প্রথম থেকেই একটা বৈজ্ঞানিক অনিবার্য ধারাবাহিকতায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই মহাসত্যের ক্রমবিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। এই বিশ্বাস কোন অন্ধ ভক্তির ফল নয়, কোন জন্মগত দেশপ্রীতির উন্মাদ নিদর্শন নয়, যুক্তি ও জ্ঞানের বাস্তব পন্থায় জগতের সমস্ত সাহিত্য আর ইতিহাস অনুশীলনে এই সিদ্ধান্ত অঙ্কশাস্ত্রসম্মতভাবে আজকের যুগে প্রকট হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন দেশের সমস্ত চেতনাকে এক করে বিংশ-শতাব্দীর ইতিহাস আজ মানবচেতনাকে যেখানে এনে উপস্থিত করেছে, সেখানে

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, বিশ্বমানব-চেতনায় আজ ভারতবর্ষ নবজন্ম লাভ করছে, এইটেই হলো আজকের ইতিহাসের চরম লক্ষ্যণীয় ব্যাপার। এবং এ-ভাবতবর্ষ শুধু নেহরু আর প্যাটেলের ভারতবর্ষ নয়, এ ভারতবর্ষ রেশন আব অন্নাভাবের ভারতবর্ষ নয়, এ ভারতবর্ষ হলো এই দৈন্যময় খোলসের উর্ধ্বে শাশ্বত এক ভাবতবর্ষ, যার গান গেয়ে গিয়েছেন বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ আর শ্রীঅরবিন্দ। বিবেকানন্দের পরিকল্পনা ছিল, এই ভারতবর্ষের ইতিহাস তিনি রচনা করে যাবেন এবং তার জন্যে তিনি একটা খসড়াও তৈরী করেছিলেন। সেই অপূর্ব পবিকল্পনার মধ্যে বিবেকানন্দ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন, এই ভারতবর্ষকে কেউ পরাজিত করতে পাবে নি, এই ভারতবর্ষকে কোন দৈন্য, কোন গ্লানি, কোন অপঘাত স্পর্শ করতে পারে নি। অন্তরেব চিবসম্রাজ্ঞী, অপরাজেয় এই ভাবতবর্ষ। এই ভারতবর্ষকে আজ ধীরে ধীবে পাশ্চাত্য জগৎ চিনতে আরম্ভ করেছে এবং একদিন পশ্চিম তার একনিষ্ঠ জ্ঞানসাধনায় এই ভারতবর্ষের কাছেই এসে পৌঁছবে। আজকের সভ্যতাব ইতিহাস হল সেই নবপরিচয়ের সূচনার ইতিহাস...মহাজ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্ব আব পশ্চিমের ইতিহাস। তার সূচনা হয়ে গিয়েছে। চাবিদিকের রাজনৈতিক ভাঙাগড়া আর রাজনৈতিক মাতামাতির আড়ালে মানব-ইতিহাসের সেই মহাসৌধই গড়ে উঠছে যেখানে একদিন মহামানবেব মিলনতীরে মানুষ তার দীর্ঘযাত্রাপথের শেষে এসে মিলিত হবে। আজকের বাইরের জগতের বেদনাবিক্ষুব্ধ শত চাঞ্চল্যের আড়ালে মানবের সেই চিরন্তন স্বপ্নই দেখেছি ধীরে ধীরে সত্য হয়ে উঠছে। এবং আজকের রাজনীতিকরা জগতের যে ইতিহাস রচনা করছে, সে-মিথ্যা-ইতিহাসের বিরাট ভগ্নস্তূপের পাশে সেদিন মাথা তুলে উঠবে, আজকে যাদের বা যেসব ঘটনাকে আমরা রাজনৈতিক বাস্তবতার কুৎসিত ব্যস্ততায় অবজ্ঞা করে চলেছি। মানব-সভ্যতার সভ্যকারের ইতিহাস অলিখিতই রয়ে যাচ্ছে। আগে যেখানে থাকতো রাজা-রাজড়া আর বিজয়ী

সেনাপতিদের নাম, এখন সেখানে থাকছে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক নেতাদের আর তাঁদের নিযুক্ত সেনাপতির নাম। অথচ আমরা সবাই জানি, সেদিনের রাজা-রাজড়ারা বা সেনাপতিরা পারেন নি, আজকের রাজনীতিকরাও পারবেন না অনাগত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আজকের দিনের সুরভিকে, আজকের দিনের সূর্যের আলোকে। অনাগত মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে আজকের দিনের সুরভিকে রবীন্দ্রনাথের কবিতারই একটি লাইন, আজকের দিনের সূর্যের আলোর আশীর্বাদকে অনাগত মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে ঠাকুর রামকৃষ্ণের একটি কথাই, বিবেকানন্দের একটা উক্তিই, শ্রীঅরবিন্দের একটা আশ্বাসবাণীই। তাঁরাই পারেন, তাঁদের জীবন দিয়ে সংযুক্ত করতে পলায়নপর আজকের সঙ্গে অনাগত অনাদি কালকে। তাঁদের জীবনই হল সেই অলক্ষ্য স্বর্ণরজ্জু যাতে বিধৃত হয়ে আছে অখণ্ড মহাকাল। তাঁরাই হলেন মানব-ইতিহাসের নিত্যসম্পদ। মহাকালের অন্তঃপুরবাসী। মানব-ইতিহাসের ধারক ও বাহক। মহাদেব তাঁর জটায় যেমন ধারণ করেছিলেন গঙ্গার উন্মাদ গতি-তরঙ্গ, তেমনি এঁরাই এঁদের জীবনে ধারণ করে আছেন নিত্যবহমান কালতরঙ্গের উন্মাদ-গতিবেগকে। শ্রীঅরবিন্দ হলেন সেই কালতরঙ্গ-বাহী ধূর্জটীরই শেষতম অবতার।

তাই উনবিংশ-শতাব্দীতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে নি শুধু গঙ্গার ধারে বাংলার ছোট্ট একটা গণ্ডগ্রামে, তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল উনবিংশ-শতাব্দীর বিশ্বের বিরাট প্রাঙ্গনে। মানব-ইতিহাসেরই অন্তঃস্থলে। আজ সময় এসেছে, এই ঘটনাকে তার প্রকৃত পটভূমিকায় উপলব্ধি করবার। কারণ এই ঘটনার অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতায়ই শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব ঘটে।

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে সাধনার সূচনা করেছিলেন, তার সঙ্গে শুধু তাঁর গুটিকতক শিষ্যের জীবনেরই সংযোগ ছিল না, কিংবা বাংলার সামাজিক জীবনেই তা সীমাবদ্ধ ছিল না, সে-সাধনার

সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ছিল বিশ্বমানবের চিন্তাধারা। তাঁর আবির্ভাব উনবিংশ-শতাব্দীর পৃথিবীর সর্বোত্তম ও সর্ব-প্রয়োজনীয় ঘটনা। এবং তাঁর আবির্ভাবের তাৎপর্যকেই সম্পূর্ণ করে গেলেন শ্রীঅরবিন্দ।

উনবিংশ-শতাব্দীতে নবলব্ধ বিজ্ঞানের সহায়ে পাশ্চাত্য জগৎ যখন একটা বিরাট নতুন শক্তির মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো, সেই নতুন শক্তির প্রবল তেজে যখন পুরাতন পৃথিবীর জরাজীর্ণ মানসিক সম্বলের যা-কিছু অবশেষ ছিল সমস্তই পুড়ে ছাই হয়ে যাবার মতন হলো, সেই সময়ে মানবধর্মের মর্মান্তিক প্রয়োজনই ভারতবর্ষে পুনরায় প্রকট হয়ে উঠলো ঠাকুর রামকৃষ্ণকে আশ্রয় করে মানুষের চিরন্তন আত্মিক শক্তি, যা ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাইরে বিশ্বজগতে মানুষের অনাচারে, আলস্যে ও কদাচারে জীর্ণ, পঙ্গু ও নিষ্ক্রিয় হয়ে এসেছিল।

পাশ্চাত্য জগতে বিজ্ঞান তার প্রত্যক্ষবাদকে নিয়ে জড়কে যে চরম মূল্য প্রদান করলো, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জাগতিক কল্যাণের যে সব বাস্তব সুবিধা যাতুকরের মতন তার সামনে উপস্থিত করলো, সুবিধাবাদী মানুষ বিজ্ঞানের সেই প্রত্যক্ষ বরদাত্রীরূপে সম্মোহিত হয়ে, তার নির্দেশ অনুযায়ী জড়কেই জীবনের একমাত্র সত্যরূপে গ্রহণ করলো। মানুষের সমস্ত মূল্যমান গেল বদলে। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে মহাকল্যাণের মূর্তিতে দেখা দিল এক মহাসংকট। বিপন্ন হয়ে উঠলো আত্মার অস্তিত্ব···মানুষের সংজ্ঞা গেল বদলে···মানুষের চাওয়া ও পাওয়ার সমগ্র রূপ গেল পরিবর্তিত হয়ে···বিজ্ঞান অস্বীকার করলো মানবের আত্মিক শক্তিকে···মানুষ হল শুধু গোণা-যায় এমন অসংখ্য জীবাণুকোষের সমষ্টিমাত্র···তার শক্তির সীমানা নির্ভর করে সেই জীবাণুকোষের শক্তির আর বৃদ্ধির ওপর। সেই জীবাণুকোষের সমষ্টির বাইরে মানুষের মধ্যে নেই আর কোন শক্তি। বেদে, পুরাণে, উপনিষদে, জগতের বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার ধর্মগ্রন্থে, অসংখ্য ঋষি আর সাধকদের জীবনে যে অদৃশ্য আত্মিক-শক্তির কাহিনী উল্লিখিত

আছে যুগ-যুগান্ত ধরে মৃত্যুশীল মানুষের যে অমরত্ব-প্রয়াস···এই মর্ত্যজীবনে ভগবানের মতন ষড়ৈশ্বর্যশালী হওয়ার মানুষের যে দিব্যসাধনা, সে শুধু মানুষের কল্পনাবিলাস। বিজ্ঞান তার যন্ত্রপাতি নিয়ে, তার অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে, তার ল্যাবরেটরীতে প্রমাণ করে দেখালো ঈশ্বব মৃত-বস্তু, আত্মা শুধু কল্পনা, ধ্যান-ধারণা-যোগ-সাধনা শুধু পুরোহিতদের আবিষ্কৃত মানুষের অজ্ঞতা আর ভয়ের সুযোগে নিজেদের ধর্মব্যবসাকে বিস্তার করবার সুচতুর কৌশল। উনবিংশ-শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য জগৎ এতদিন পরে ধ্বংস করতে উদ্যত হল ভারতবর্ষকে, শাশ্বত ভাবতবর্ষকে যে-ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী বাইরের জগতের শত লাঞ্ছনাকে সহ্য করেও সংগোপনে বাঁচিয়ে রেখেছিল মানুষের অমরত্ব-স্বপ্নকে, আত্মার অমিত সম্ভাবনাকে। বিজয়ী পশ্চিমের সংস্পর্শে ভারতবর্ষ নিদারুণ লজ্জায় নিজের দিকে চেয়ে দেখলো, দেখলো সে আজ কত ক্ষুদ্র হয়ে গিয়েছে, শিক্ষাহীন, অন্নহীন, অর্থহীন, পরাধীন, জগতের অবজ্ঞেয় এক জাতি। এবং বিজয়ী পশ্চিম তার এই বিক্ষুব্ধ মনের সামনে তার এই হীন অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করে দেখালো, অতিরিক্ত আত্মিকতাই ভারতবর্ষের এই অধঃপতনের মূল, পরলোকের দুশ্চিন্তায় সে হারিয়েছে ইহলোকের সম্পদ, তার ধর্মই হয়েছে তার কাল। দুর্বল স্নায়ুগ্রস্ত লোক যেমন প্রবলের যে কোন হুমকিকে চরম যুক্তি বলে গ্রহণ করে, পরাজিত মুমূর্ষু দুর্বল ভারতবর্ষও বিজয়ী পশ্চিমের এই ব্যাখ্যাকে ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করলো এবং তার আত্মিক শক্তির যা কিছু অবশেষ পড়ে ছিল, তাকে লজ্জায় অস্বীকার করে কোমর বেঁধে বৈজ্ঞানিক পশ্চিমের অনুকরণে বস্তুগত ও রাজনীতিগত শক্তি অর্জনের দিকেই দৃষ্টি দিলো এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-সত্যই হলো তার কাছে একমাত্র আরাধ্য-সত্য। ভারতবর্ষ ভুলে গেল তার ইতিহাসের সুমহান দায়িত্ব; তার বাস্তব পরাধীনতা আর দুর্বলতার লজ্জায় সে মুখ ফুটে আর স্বীকার করতে পারলো না, মানব-সভ্যতাকে তার সুমহান ভবিতব্যতায় পৌঁছে

দেওয়াই হল ভারতবর্ষের ইতিহাসের একমাত্র তাৎপর্য এবং সেই সুনিশ্চিত সম্ভাবনার আদর্শ-ই শত শত যুগ ধরে ভারতবর্ষের সাধনার ইতিহাসে অভিব্যক্ত হয়ে আছে ; পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শক্তির প্রত্যক্ষ দীপ্তিতে পরাধীন হীনবল ভারতবর্ষ ভুলে গেল তার ইতিহাসের আদর্শকে, ভুলে গেল তার চিরাচরিত মূল্যমানকে ; পরাজিতের লজ্জায়, দুর্বলের অক্ষমতায় সে বিজয়ী পশ্চিমের প্রত্যক্ষবাদের সামনে মাথা নত করে আত্মসমর্পণ করলো, পশ্চিমের মূল্যমানকে ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করলো, এবং পশ্চিমের অনুকরণে বাইরের শক্তিকে অর্জন করে পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে রাজনৈতিক সমকক্ষতা অর্জন করাই হলো তার একমাত্র লক্ষ্য। উনবিংশ-শতাব্দীতে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ভারতবর্ষের এই আত্মবিস্মরণ হলো, বর্তমান যুগের সভ্যতার চরম সংকট এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের চরম অধঃপতন। বাইরের দিক থেকে ইংরেজের কাছে ভারতবর্ষের পরাধীনতা হলো সেই বিরাট সংকটের একটা লক্ষণ মাত্র।

মানব-সভ্যতার এবং ভারভবর্ষের সাধনার ইতিহাসের এই মহাসংকটের বুকেই জন্মগ্রহণ করলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ···ভারতবর্ষের অবিনাশী আত্মার প্রতীকস্বরূপ। মানব-সত্যতার যে চরম পরিণতিকে সত্য করে তোলবার প্রতিশ্রুতি ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে, তার চরম সংকটের লগ্নে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনিবার্য ধারাবাহিকতায় আবির্ভূত হলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই মহাসত্যকে বাইরের দীনতার অপঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের আগমনের পূর্ণ তাৎপর্য সেদিন আমরা উপলব্ধি করতে পারি নি ; শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরাচরিত একজন ধর্মসাধকরূপেই তাঁকে আমরা গ্রহণ করি। কিন্তু আজ পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক সভ্যতার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা যতই প্রকট হয়ে উঠছে, ততই আমরা বুঝতে পারছি, মানব-সভ্যতার কোন নিদারুণ সমস্যার সমাধান করবার জন্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাই সেদিন বলেছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে যে

বিরাট সাধনার সূত্রপাত হয়েছে, এখনো তা সম্পূর্ণ হয় নি। এবং সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে বিরাট সাধনার সূত্রপাত করেছিলেন, বিবেকানন্দের পর, শ্রীঅরবিন্দই তার পরিপূর্ণ সম্ভাবনাকে প্রকট করে গেলেন। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে মানব-সাধনার চরম সংকটের লগ্নে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মানব-সভ্যতার গতির যে পথনির্দেশ করে গেলেন, তাঁর প্রিয়তম শিষ্য সেই পথ অনুসরণ করে সেই আদর্শকেই বিশ্বমানবের চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট করে দিয়ে গেলেন, বিবেকানন্দের সেই অসমাপ্ত কাজকেই সম্পূর্ণ করে গেলেন শ্রীঅরবিন্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ থেকে আরম্ভ করে বিবেকানন্দ—শ্রীঅরবিন্দের জীবনে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা বিশেষ অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহণ করলো। ভারতের ইতিহাসের মধ্যে মানবতার চরম অভিব্যক্তির যে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ছিল, এই তিনজন মহাপুরুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতায় তা অখণ্ডভাবে পরিপুরিত হয়েছে। বাইরের হীনবল অসহায় ভারতবর্ষের বাস্তবতার আড়ালে যে অবিনাশী শাশ্বত ভারতবর্ষ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, ভারত-ধর্মতত্ত্বের ত্রিমূর্তির মত এই তিনজন মহাপুরুষ সেই শাশ্বত ভারতবর্ষকে আবার বিশ্বচেতনার মানচিত্রে চিরদীপ্যমান করে দিয়ে গেলেন। এবং একদিন সমগ্র জগৎকে যে ভারতবর্ষের কাছে মাথা নত করে আসতে হবে, আমাদের চরম সৌভাগ্য, আমাদের চোখের সামনে দেখলাম, শ্রীঅরবিন্দের জীবনে সেই অমর ভারতবর্ষের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্রবাণীতে শুনলাম, সেই ভারত-যজ্ঞে বিশ্বমানবের আমন্ত্রণলিপি—বেদে উপনিষদে ছিল ভারত-ঋষির অমৃতত্বের যে প্রতিশ্রুতি, শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনে পেলাম তার পরিপূর্তি।

শ্রীঅরবিন্দ বর্তমান বিশ্বসভ্যতার আভ্যন্তরিক ইতিহাস লিখে গিয়েছেন; তাঁর সেই অমর গ্রন্থগুলি* ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের কাছে

---

*1. The Ideal of Human Unity 2. Human Cycle 3. The Riddle of this World 4. Ideal & Progress

মানবসভ্যতার দিগ্‌দর্শন হয়ে থাকবে, তাতে তিনি আমাদের দেখিয়েছেন, আজ সমগ্র বিশ্বে একদিকে প্রবল হয়ে উঠেছে আত্মনিয়ন্ত্রণ-অক্ষম এক মহা-আসুরী-শক্তি, সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন বিচিত্রতাকে লৌহশৃঙ্খলিত করে যে শক্তি আনতে চাইছে নিষ্পেষিত ধূলির একতা, আব একদিকে ধীরে ধীরে জাগছে মানবের চিত্তগুহায় অন্তর্লীন দৈবশক্তি, বহু বিচিত্রকে স্বীকার করে যে আনবে মানবমনের অন্তর্গূঢ় আলোর একতা—মৃত্যুতে নয়, অমরত্বে করবে মানুষকে এক। এটা কবির অনুমান নয়, ঐতিহাসিকের কল্পনা নয়, সাধনালব্ধ সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এবং সে-সাধক হলেন স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ—যিনি আজকের এই অবিশ্বাসী যুগে প্রত্যক্ষভাবে নিজের জীবনে সেই দৈবশক্তিকে করলেন রূপায়িত, বিজ্ঞানের অগোচর সেই শক্তিকে দুষ্কর তপস্যায় নিজের জীবনে করলেন ধারণ, প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বকর্মে করলেন তাকে প্রয়োগ। ভারতবর্ষের যে যোগ-বিজ্ঞান সাধনহীনতার অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, শ্রীঅরবিন্দ অপরূপ মানবীয় সাধনায় দিয়ে গেলেন তাকে দিব্যজ্ঞানের মর্যাদা—তপস্যায় উত্তীর্ণ হলেন মানবীয় ক্রমবিবর্তনের অনিবার্য পরবর্তী স্তরে—মনের ঊর্ধ্বে অতিমানস-লোকে এবং সেই অতিমানসের বিচ্ছুরিত আলোর ইঙ্গিত দৈব-অনায়াসে রচনা করে গেলেন, মানবমনের মহাকাব্য, "সাবিত্রী"—বিশ্বের সাহিত্যের বিস্ময়।

"সাবিত্রী"র প্রত্যেক অক্ষরে রয়ে গিয়েছে সেই অতিমানসের দীপ্তি—দৈব মহাসত্যের স্বতঃ উৎসারিত আলো। মনের ঊর্ধ্বে সেই অতিমানসের আলোকের নির্দেশে লেখা এই অপরূপ মহাকাব্য—মহাবিশ্বের অন্তর্গূঢ় চিত্র—পুরাকালে যে বিশ্ব-রহস্যের দ্বারপ্রান্ত থেকে পরিভ্রমণ করে ফিরে এসেছিলেন একমাত্র নচিকেতা। এই মহাকাব্যের রচনা তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি, একটি মাত্র সর্গ বাকি ছিল লেখা। সে সর্গের শুধু নামকরণ করে রেখেছিলেন, মৃত্যুর সর্গ। জানি না, সেই অলিখিত সর্গের সঙ্গে তাঁর

মহাপ্রয়াণের কি যোগ। শুধু এইটুকু আজ আমরা জানি, মহাপ্রয়াণের আগে তিনি "সাবিত্রী"র যে অধ্যায় লিখেছিলেন, তার মধ্যে ছিল একটি সর্গ, The Book of Fate…অমোঘ মহা-ভবিতব্যতা যার দ্বারপ্রান্ত থেকে অসহায় মৌনতায় ফিরে আসে মানুষেব সমস্ত জ্ঞান-বুদ্ধি-জিজ্ঞাসা। এই সর্গে আছে নারদের সঙ্গে সাবিত্রীর জনক-জননীর কথোপকথন। সাবিত্রী ঘোষণা করেছেন, মৃত সত্যবানই তাঁর পতি, সেই মৃতকেই তিনি বরণ করবেন পতিত্বে। এই নিয়ে নারদের সঙ্গে হচ্ছে সাবিত্রীর জনক-জননীর, মানবের ভবিতব্যতা এবং মৃত্যু নিয়ে আলাপ। এবং যাঁরাই সাবিত্রী পড়েছেন, তাঁরাই জানেন যে এই পৌরাণিক কাহিনীর আড়ালে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মানসিক তপস্যার কথাই, তাঁর সাধনার সত্যকেই রূপ দিয়ে গিয়েছেন। এই মহাকাব্যই হল তাঁর প্রকৃত জীবন-ইতিহাস। Book of Fate সর্গেব প্রতি ছত্রের আড়ালে আজ দেখছি, মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি তাঁর শেষ-সংগ্রামেরই ইঙ্গিত। সেই অন্তর্গূঢ় ঘটনার ইতিহাস আমাদের জ্ঞানের বাইবে। শ্রীঅরবিন্দ তাই বলেছিলেন, তাঁর জীবনের যা ঘটনা, তা তো লোকচক্ষুর আড়ালে, তাঁর অন্তর-লোকের ঘটনা, সেখানে আমাদের প্রবেশের কোন পথ নেই। তাই আজ "সাবিত্রী"র প্রত্যেক লাইনের ফাঁকে ফাঁকে আমরা খুঁজছি সেই অপরূপ অন্তর্গূঢ় ঘটনার দেশে প্রবেশ করবার পথ। সেখানে Book of Fate সর্গে যে অপরূপ ভাষায় তিনি মৃত্যুরহস্যকে বিশ্লেষণ করেছেন, আমার সাধ্য নেই অনুবাদে তার শতাংশের একাংশকেও পরিস্ফুট করি,—কারণ নিগূঢ় মন্ত্রের মতন সে-ভাষা এসেছে তাঁব মনের ঊর্ধ্বলোক থেকে—যেখান থেকে আসে মহাসত্যের সব দিব্য-প্রকাশ। সেখানে তিনি বলেছেন,

Men die that man may live and God be born.

যে-মানুষ এসেছে ভগবানের দূত হয়ে, যে-মানুষ এসেছে মানুষকে মুক্তি দিতে মৃত্যু আর বেদনার বন্ধন থেকে।

He too must carry the yoke he came to unloose.

সেই বিশ্বমানবকে নিজের মনে বইতে হয় নিখিলের বেদনার ভার,

He carries the suffering World in his own breasts··

* * *

Earth's ancient load lies heavy on his soul···

* * *

The weeping of the centuries visits his eyes···

* * *

He is the victim in his own sacrifice···

বাইরের জগৎ যখন নিশ্চিন্ত সুখনিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে, তখন মহা-নিঃসঙ্গতায় একাকী মানুষের মুক্তিদাতাকে সংগ্রাম করতে হয় প্রবল শত্রুর সঙ্গে, সে-শত্রুকে আমরা সাধারণ লোক বাইরে চোখ চেয়ে দেখতে পাই না। আমাদের হয়ে আমাদের মুক্তিদাতাকেই সেই সংগ্রামে দিতে হয় মৃত্যুর মূল্য।

He dies that the world may be new born and live···

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মহাপ্রয়াণে ঘোষণা করে গেলেন, সেই নব-পৃথিবীর জন্ম। "সাবিত্রী" হলো সেই অনাগত উষার বন্দনা।

‘কারাকাহিনী’

অমিতাভ বসু

অরবিন্দ। একটি নাম।

উচ্চারণের সংগে সংগে যেন তিনখণ্ড দিগন্ত একখণ্ড আকাশে একই সংগে ফুটে ওঠে। তাব মানে যিনি যোগী তিনিই রাজনীতিবিদ—আবার তিনিই সাহিত্যিক। আর ইনিই হচ্ছেন শ্রীঅরবিন্দ।

আজকে এখানে অবশ্য আমি শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্যের দিক নিয়েই কেবল আলোচনা করবো। আবার সেই আলোচনাও কেন্দ্রীভূত রাখছি কেবল তাঁর লেখা ছোট্ট একখানি গ্রন্থের মধ্যে, যার নাম “কারাকাহিনী”। অবশ্য কারাকাহিনী তাঁর সমাপ্ত প্রবন্ধ পুস্তকের মধ্যে পড়ে না। কারণ কারাকাহিনী ১৩১৬ সালে যখন তদানীন্তন ‘সুপ্রভাত” পত্রিকাতে প্রতি মাসে ধারাবাহিকভাবে বেরুচ্ছিল, তখন হঠাৎ তাঁকে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়। সেই হেতু এই গ্রন্থখানি শ্রীঅরবিন্দের সব বক্তব্যের শেষ নিয়ে পরিণত নয়। সুপ্রভাতে যে ক’টি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল এই গ্রন্থ তারই সংকলন। তবুও এই গ্রন্থে কেবলমাত্র সাহিত্যিক নয়, রসিক-সাহিত্যিক শ্রীঅরবিন্দকে আমরা খুঁজে পাবো।

শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজী রচনার সংগে আমাদের অল্পবিস্তর পরিচয় অনেকেরই আছে। এবং তিনি যে একজন প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী রচনাকার ছিলেন সে-কথাও সুবিদিত। শুধু তাই নয়, শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজী রচনা অনেক ইংরেজ লেখকের চাইতে সাবলীল এবং শুদ্ধ ছিল। তাঁর ইংরেজী লেখা ইংরেজকেও লজ্জা দিয়েছে। অবশ্য এর কারণও ছিল যথেষ্ট, শ্রীঅরবিন্দের বয়স যখন ছয় কি সাত বছর তখন তাঁকে শিক্ষালাভের জন্যে বিলেতে পাঠানো হয়। বিলেতে

যাওয়ার আগের সেই অল্প ক'টি বছরও তাঁর মেশে কেটেছে বিলেতি আবহাওয়ায় আর সেই আদপ-কায়দার মধ্যে। তারপর বিলেতে একটানা চৌদ্দ বছর বাস। সুতরাং ইংরেজীতে তাঁর পারদর্শী হয়ে ওঠা এবং ইংরেজী ভাষায় কাব্য-সাহিত্য সৃষ্টি করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাঁর বাংলা রচনার সংগে মুষ্টিমেয় উৎসাহী পাঠকের পরিচয়ের বাইরে সাধারণের পরিচয় খুব কম বলেই মনে হয়। এমনও শোনা যায়, প্রথমে বাংলা ভাষায় তিনি খুব পরিষ্কার করে কথা পর্যন্ত বলতে পারতেন না। তাঁর বহু উচ্চারণ অশুদ্ধ ছিল। কিন্তু সেই মানুষ শেষ পর্যন্ত বাংলা কেবল বলতে নয়, কত সরস বাংলা লিখতে পারতেন তারই কিছুটা প্রমাণ এই কারা-কাহিনীকে কেন্দ্র করে আমি এখানে তুলে ধররার চেষ্টা করবো। আর এর মধ্য দিয়ে পাঠক তাঁর সাহিত্যকৃতির খুব বড় কিছু একটা পরিচয় না পেলেও, এটা অনুমান করতে পারবেন যে বেশি বয়সে বাংলা শিখতে আরম্ভ করেও তিনি সেই বাংলাভাষাকে কত সুন্দর-ভাবে আয়ত্ত করে সেই ভাষাতেই কত সুন্দর "হিউমার" বা স্যাটায়ার করে গিয়েছেন।

সেটা ১৯০৮ সাল। বোমার মামলায় জড়িয়ে পড়ে শ্রীঅরবিন্দকে এক বছর আলীপুর জেলে হাজতবাস করতে হয়। আর এই জেলের অভিজ্ঞতার কথাই প্রধানতা তাঁর এই কারাকাহিনীতে স্থান পেয়েছে।

এই কারাকাহিনী গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি জেলের সাজ-সরঞ্জাম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যে থালাখানি এবং বাটিটি ব্যবহার করতেন তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন, 'উত্তমরূপে মাজা হইলে এই আমার সর্বস্ব স্বরূপ থালা-বাটির এমন রূপার ন্যায় চাক্‌চিক্য হইত যে, প্রাণ জুড়াইয়া যাইত এবং সেই নির্দোষ কিরণময় উজ্জ্বলতার মধ্যে "স্বর্গজগতে" নিখুঁত ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের উপমা পাইয়া রাজভক্তির নির্মল আনন্দ অনুভব করিতাম। দোষের মধ্যে থালাও তাহা বুঝিয়া আনন্দে এত

উৎফুল্ল হইত যে, একটু জোরে আঙুল দিলেই তাহা আরবীস্থানের ঘূর্ণমান দরবেশের ন্যায় মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে থাকিত, তখন এক হাতে আহার করা এক হাতে থালা ধরিয়া থাকা ভিন্ন উপায় ছিল না। নচেৎ ঘুরপাক খাইতে খাইতে জেলের অতুলনীয় মুষ্ট্যান্ন লইয়া তাহা পলাইয়া যাইবার উপক্রম করিত। থালা হইতে বাটিটাই আরও প্রিয় ও উপকারী জিনিস ছিল। ইহা জড় পদার্থের মধ্যে যেন ব্রিটিশ সিভিলিয়ান। সিভিলিয়ানের যেমন সর্বকার্যে স্বভাবজাত নৈপুণ্য ও যোগ্যতা আছে, জজ, শাসনকর্তা, পুলিশ, শুল্ক বিভাগের কর্তা, মিউনিসিপ্যালিটির অধ্যক্ষ, শিক্ষক, ধর্মোপদেষ্টা, যাহা বল, তাহাই বলিবামাত্র হইতে পারে,—যেমন তাঁহার পক্ষে তদন্তকারী, অভিযোগ-কর্তা, পুলিশ, বিচারক, এমন কি সময়-সময় বাদীর পক্ষের কৌঁসিলীরও এক শরীরে এক সময়ে প্রীতি-সম্মিলন হওয়া সুখসাধ্য, আমার আদরের বাটিরও তদ্রূপ। বাটির জাত নাই, বিচার নাই, কারাগৃহে খাইয়া সেই বাটিতে জল নিয়া শৌচক্রিয়া করিলাম, সেই বাটিতেই মুখ ধুইলাম, স্নান করিলাম, অল্পক্ষণ পরে আহার করিতে হইল, সেই বাটিতেই ডাল বা তরকারি দেওয়া হইল, সেই বাটিতেই জলপান কবিলান এবং আচমন করিলাম। এমন সর্বকার্যক্ষম মূল্যবান বস্তু ইংরাজের জেলেই সম্ভব।'

জেলে জলের অভাব ও তার ব্যবহার সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি বলছেন—'ইংরাজেরা বলে ভগবৎপ্রেম ও শরীরের স্বচ্ছন্দতা প্রায়ই সমান ও দুর্লভ সদগুণ, তাহাদের জেলে এই জাতীয় প্রবাদের যাথার্থ্য রক্ষণার্থ অথবা অতিরিক্ত স্নানসুখে কয়েদীর অনিচ্ছা-জনিত তপস্যায় রসভঙ্গ ভয়ে এই ব্যবস্থা প্রচলিত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।'

এই কারাকাহিনীর আর এক জায়গায় জেলের রান্না শাক সম্পর্কে বলছেন—'এই শাকের বিমর্ষ গাঢ় কৃষ্ণমূর্তি দেখিয়াই ভয় পাইলাম, দুই গ্রাস খাইয়া তাহাকে ভক্তিপূর্ণ নমস্কার করিয়া বর্জন করিলাম।'

সুন্দর শব্দ নির্বাচনে এখানে জেলখানার অখাদ্য বস্তু শাকের বিরুদ্ধে রচনাকারের ব্যঙ্গটি বড়ই চমৎকার ফুটে উঠেছে।

জেলে কয়েদীদের ফেন মেশান এক প্রকারের ভাত দেওয়া হতো। যাকে বলে "লফ্ সী"। এই লফ্ সীর বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় বলছেন—'লফ্ সীর ত্রিমূর্তি বা তিন অবস্থা আছে। প্রথম দিন লভ্ সীর প্রাজ্ঞভাব, অমিশ্রিত মূল পদার্থ, শুদ্ধ শিব শুভ্র-মূর্তি। দ্বিতীয় দিন লফ্ সীর হিরণ্যগর্ভ, ডালে সিদ্ধ খিচুড়ি নামে অভিহিত, পীতবর্ণ, নানা ধর্মসঙ্কুল। তৃতীয় দিনে লফ্ সীর বিরাট মূর্তি অল্প গুড়ে মিশ্রিত, ধূসর বর্ণ, কিয়ৎ পরিমাণে মনুষ্যের ব্যবহার-যোগ্য।' এখানেও শব্দচয়নগুলি লক্ষ্যণীয়। 'শুদ্ধ শিব শুভ্র মূর্তি বা হিরণ্যগর্ভ অথবা নানা ধর্মসঙ্কুল।' ছোট ছোট এক একটি বিশেষ্য-বিশেষণ প্রয়োগে জেলের লফ্ সীর ধর্ম, কর্ম আর চরিত্র—এর সব যেন আমাদের কাছে পরিষ্কার ছবির মত ফুটে ওঠে। আর এর মধ্য দিয়ে জেলের অব্যবস্থা, কর্তাপক্ষের কীর্তিকলাপের কথাও আমরা কি কিছু জানতে পারিনে ?

এই গ্রন্থের আর এক জায়গায় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সেই বোমার মামলার ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লি সাহেবের রূপের বর্ণনা দিচ্ছেন—'বার্লি সাহেব দেখতে আদৌ ভাল ছিলেন না। রোগা চেহারা, তার উপর খুব ফর্সা। লম্বা দেহের ওপর মাথাটি ছিল তার অপেক্ষাকৃত বেশ কিছুটা ছোট।' তিনি বলছেন—'বার্লি সাহেব বোধ হয় স্কচ।…তাঁহার চেহারাটা স্কটল্যাণ্ডের স্মারক চিহ্ন। অতি সাদা, অতি লম্বা, অতি রোগা, দীর্ঘ দেহযষ্টির উপর ক্ষুদ্র মস্তক দেখিয়া মনে হইত যেন অভ্রভেদী অকটার-লোনী মনুমেণ্টের উপর ক্ষুদ্র অকটারলোনী বসিয়া আছেন, বা ক্লিয়-পাত্রার OBELISK-এর চূড়ায় একটি পাকা নারিকেল বসান রহিয়াছে।' কী অপূর্ব কৌতুকপূর্ণ উপমা!

আবার উক্ত বোমার মামলারই অন্যতম কৌঁসিলী মাদ্রাজী নর্টন সাহেবের বিচার ব্যর্থতার ব্যঙ্গ করে তিনি আর এক জায়গায় বলছেন

—'নর্টন সাহেব কখন মাদ্রাজ কর্পোরেশনের সিংহ ছিলেন কিনা, বলিতে পারি না, তবে আলীপুর কোর্টের সিংহ ছিলেন বটে। তাঁহার আইন অভিজ্ঞতার গভীরতায় মুগ্ধ হওয়া কঠিন—সে যেন গ্রীষ্মকালের শীত।'

আশ্চর্য সুন্দর উপমা 'গ্রীষ্মকালের শীত'। আর এই নর্টনের কাছে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন এক বিরাট সমস্যা এবং তাঁকে নিয়ে নর্টনের অবস্থাটা তখন কেমন হয়েছিল কারাকাহিনীর এক জায়গায় শ্রীঅরবিন্দ সেই কথা বলতে গিয়ে বলছেন—'উৎকৃষ্ট ও তেজস্বী ইংরাজী লেখা দেখিবামাত্র নর্টন লাফাইয়া উঠিতেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন, অরবিন্দ ঘোষ…আমার নাম কোনও ছেঁড়া কাগজের টুকরায় পাইলে নর্টন মহাখুশী হইতেন, এবং সাদরে এই পরম মূল্যবান প্রমাণ ম্যাজিষ্ট্রেটের শ্রীচরণে অর্পণ করিতেন।' এর পরেই শ্রীঅরবিন্দ বলছেন—'দুঃখের কথা, আমি অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই। নচেৎ আমার প্রতি সেই সময়ের এত ভক্তি ও অনবরত আমার ধ্যানে নর্টন সাহেব নিশ্চয় তখনই মুক্তিলাভ করিতেন।'

কারাকাহিনীতে এমনি আরো অনেক উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে যেখানে শ্রীঅরবিন্দ সহজ সরল কৌতুকের, ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে অনেক অধিক সত্যের উল্লেখ আর বিভিন্ন অবস্থার ওপর তির্যক কটাক্ষপাত করেছেন, আর এর সমস্ত কিছুই সাহিত্যরসে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাছাড়া আগেই উল্লেখ করেছি, কারাকাহিনী তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। কারণ এ সময় তাঁর জীবনে হঠাৎ এলো এক অন্য জগতের আহ্বান।, তিনি চলে গেলেন পণ্ডিচেরীতে। এখানে এসে বিপ্লবী-সাহিত্যিক হলেন ঋষি।

বাংলাভাষা শ্রীঅরবিন্দ কেবল বেশি বয়সেই শিখতে আরম্ভ করেননি, তিনি যে কত ছেলেখেলায় বাংলা শিখেছিলেন, সে কথা তাঁর এক সময়কার বাংলা শিক্ষক সুসাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়, তাঁর লেখা "অরবিন্দ প্রসঙ্গ"-গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন—'তিনি

[শ্রীঅরবিন্দ] কোনোও সপ্তাহে দুই-একদিন বাংলা পড়িতেন, আবার দশ-পনের দিন ধরিয়া বাংলা পুস্তক খুলিতেনই না।'

আর শ্রীঅরবিন্দের অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার পিছনে কোথায় ছিল তাঁর গুপ্ত-রহস্য, সেই রহস্য হয়ত আমাদের কাছে চিরদিন রহস্য হয়েই থাকবে। কারণ অনেক কথার মাঝেও তিনি নিজের কথা বলেছেন সব সময়ই কম। তবুও আমাদের ভাগ্য ভালো যে কারাকাহিনী গ্রন্থে রসিক শ্রীঅরবিন্দকে আমরা দেখতে পাই।

সমস্ত পৃথিবীতে যখন সাড়া পড়ে গেছে, সকলের কৌতূহল ও আগ্রহ জন্মেছে তাঁকে জানবার, তাঁর কাজ ও উদ্দেশ্যের সাথে নিকট যোগস্থাপনের, তখনই শ্রীঅরবিন্দ সরে দাঁড়ালেন এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ হতে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদের ভাষায়, যখন তাঁকে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেই সময় এই অঘটন ঘটল। অদৃষ্টের পরিহাস বটে, কিন্তু তাঁর জীবন আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই এই রকম অপ্রত্যাশিত ঘটনাই বার বার ঘটে এসেছে, যেন তাঁরই ইচ্ছায়। যশঃ ও খ্যাতির চূড়ায় উঠে বার বার তার পিছনে আত্মগোপন করা ছিল তাঁর স্বাভাবিক প্রকৃতি। এই শেষ আত্মগোপন তারই স্বতঃসিদ্ধ পরিণতি। সেজন্যে এর মাঝেও পাই একটা সামঞ্জস্য যা ছিল তাঁর জীবনের মূলে ও বহিঃপ্রকাশে। সৃষ্টি-সমস্যার গোড়ার কথা Life Divine-এর প্রথম বাক্যে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'All problems of existence are essentially problems of harmony', তারই সুষ্ঠু সমাধান দেখতে পাই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে, এমন কি এই বিশ্ব-বিক্ষোভকারী অন্তর্ধানে। কৃতিত্বের সহিত I. C. S. পাশ করে তিনি সকলের প্রশংসা পেলেন, কিন্তু বৃটিশ রাজ্যের লোভনীয় চাকরি তুচ্ছ করে নিলেন তখনকার অজ্ঞাত, অখ্যাত স্বাধীন বরদা-রাজ্যের নগণ্য পদ। কিন্তু ছাইচাপা আগুন ক'দিন ঢাকা থাকতে পারে? তাঁর তেজ যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, লোকজন বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে নিল তাঁর সান্নিধ্য, আবার তিনি সরে পড়লেন। চলে এলেন রাজনীতির অপ্রাপ্তবয়স্ক যোধনক্ষেত্রে, গোপনে অক্লান্ত সেবায়, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির সমন্বয়ে যখন দেশকে চিনিয়ে দিলেন তার স্বরূপ ও স্বাধিকার, আর দেশও তাঁকে

চিনল, তখনই এল আত্মগোপনের অন্য অধ্যায়, কারাগারের অন্ধকার কুঠরীতে। সেই নির্জনবাসে লাভ করলেন ভগবৎ-দর্শন, বের হয়ে এসে দেখলেন দেশনেতৃত্বের মুকুট নিয়ে দেশবাসী তাঁর দুয়ারে উপস্থিত। আবার ভগবানের আদেশে অদৃশ্য হলেন মুষ্টিমেয় সঙ্গী নিয়ে সুদূর পণ্ডিচেরীর 'পাণ্ডব-বর্জিত' দেশে। তাঁর দেশ, এমন কি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা তাঁকে ভুল বুঝল, আস্তে আস্তে তাঁকে ভুলে গেল, এমন কি তাঁর অস্তিত্বে পর্যন্ত সন্দিহান হল; কিন্তু ভ্রূক্ষেপহীন দুশ্চর তপস্যায় তিনি নিমগ্ন রইলেন দেশের মঙ্গলের জন্যে। যখন উপলব্ধির শিখরে উঠে দেখতে পেলেন আরও উচ্চ শিখর, তখন অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের হতাশ ও হতভম্ব করে একদিন তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমার সাধনা এখনো শেষ হয় নি। পরম সত্যকে নামিয়ে আনবাব জন্যে আমায় আরো গভীরে ডুবতে হবে। মা'র উপর রইল তোমাদের সাধনার ভার। যতদিন সাধনা পূর্ণ না হয়, ততদিন আমার নির্জনে থাকা প্রয়োজন।'

যখন এই সাধনার বয়স্কাল পূর্ণ হবার মুখে, আর সবার প্রাণ উদ্দীপ্ত অদূর ভবিষ্যতে স্বর্ণ-সমুজ্জ্বল অতিমানস সত্যের আশায়, তখনই এল সেই আত্মগোপনতার ইতিহাসের শেষ-অধ্যায়। দিশাহারা হল সবাই, কিন্তু বরাবরই যিনি অন্তরালী, গোপনে কাজ করাই যাঁর ধর্ম, সেই গোপনতলচারী গহনবাসী মহামানবের জীবন যে জটিল রহস্যময় হবে তাতে সন্দেহ কি? সেজন্যেই তো তিনি বলেছেন, 'My life has not been on the surface.' কিন্তু এই অন্তরালে সাধনালব্ধ সমস্ত অপূর্ব সম্পদ তিনি বিলিয়ে দিয়ে গেছেন মানুষকে, দেশকে, সারা জগদ্বাসীকে। শেষ মুহূর্তে যা দিয়ে গেলেন তা মানুষ দেখে গেল—আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিৎ নয়, দলে দলে, দিনের পর দিন আর নিয়ে গেল সেই স্পর্শমণির স্পর্শ।

কিন্তু এই ইচ্ছাকৃত আত্মবিলুপ্তি কেন? আর সাধারণ যন্ত্রণাপূর্ণ বহিক্রমণের পথেই বা কেন, যখন যোগীদের মত দেহত্যাগ ছিল তাঁর

আয়ত্তে? বিনা উদ্দেশ্যে, বিনা প্রয়োজনে শ্রীঅরবিন্দের একটি কথাও ফোটে না; বিনা লাভের আশায় একটি পা পর্যন্ত পড়ে না। কখনও কখনও তাঁকে কার্যক্ষেত্র হতে পলায়ন করতে হয়েছে, 'পলায়ন' তাঁর গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের সহায় হবে বলে। যিনি অমানুষিক সাধনায় জীবনের ও ঊর্ধ্বলোকের সমস্ত দুয়ার খুলে দিয়েছেন, যোগেশ্বর বলে যাঁকে যোগীরা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে, তাঁর কাছে মৃত্যু কি? বিভীষিকা নয়, রহস্য নয়, এমন কি অবশ্যম্ভাবীও নয়; সংসারচক্র হতে নির্গমের নরকদ্বার মাত্র। মৃত্যুর পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে হলে জনসাধারণের মত দেহের এই যন্ত্রণাপূর্ণ পথ ছাড়া নান্যপন্থা, তাই সে পথ নিলেন বেছে। নতুবা তাঁর জীবনের শেষ দারুণ অভিজ্ঞতা, এমন কি তাঁর যোগের সমগ্রতা থেকে যেত অপূর্ণ। তাছাড়া, তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেলেন তাঁর উদ্ভাসিত দেহে মৃত্যুকেও কি করে অমর সৌন্দর্যের বিভূতি করা যায়। তাঁর বিরাট আত্মত্যাগের একটি ফল স্বচক্ষে দেখলাম, সমগ্র কারণ আমাদের বুদ্ধির অগোচরে। কিন্তু মা'র উক্তিতে আমরা জেনেছি যে আমাদের জন্যেই তাঁর এই বিলুপ্তি। নিজের হিত যিনি কোনোদিন চান নি, নির্বাণের নির্বিচল প্রশান্তি তুচ্ছ করেছেন জগতের মহাকল্যাণ উদ্দেশ্যে; দুঃখ, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করলেন, তাঁর জয় অবশ্যম্ভাবী; তার পুনরভিষেক অনিবার্য। বর্তমানে অপ্রত্যাশিত কঠোর আঘাতে আমরা মুহ্যমান হয়েছি বটে; নিদারুণ বজ্রপাতে পৃথিবীর বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু উঠে না কি তার অতল হতে গভীর প্রস্রবণ?

* * *

এই অতুলনীয় ত্যাগের ইতিহাস লিখবার যখন আদেশ পেলাম, ভাবলাম এত বড় গুরুভার বইতে পারব তো? মনের বিপর্যস্ত অবস্থায় চাপা পড়ে গেছে কত কথা! কিন্তু স্মৃতির দুয়ার খুলে দিয়ে দেখলাম তাঁর জীবনরহস্যের শেষ ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঘটনা, ছোটখাট

কথা কে যেন সযত্নে সাজিয়ে রেখেছে পর পর, আঁধার আকাশে দীপ্যমান তারার মত। তখন যেসব কথা অবোধ্য ছিল, এমন কি অর্থহীন, এখন কালের পটে মনে হচ্ছে কত সহজ ও স্বচ্ছ অথচ গভীর। মনে পড়ে বছর দুই আগেকার কথা; সদ্য একটা Accident হতে সেরে উঠেছেন, দেখা দিল তাঁর শেষ-ব্যাধির প্রথম লক্ষণ; সামান্য উপদ্রব, ঈশানকোণে ছিন্ন কালো মেঘের টুকরো। কারো বিশেষ নজরে পড়ল না, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ জানতে চাইলেন তার পরিচয়। মেঘ বড় হল। তার শিষ্য কলিকাতার প্রসিদ্ধ সার্জন ডাঃ সান্যাল বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী,—তখনই বুঝতে পারলেন, কালবৈশাখীর এই মেঘ, অবহেলা করা চলবে না। বললেন 'Prostatic enlargement দেখা দিয়েছে।' মা'ও শ্রীঅরবিন্দকে তার উৎপত্তি, পরিণতি ও পরিণাম, প্রতিকার ইত্যাদি খুলে বললেন। আমাদের উপদেশ দিয়ে গেলেন সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে। কিন্তু এতে তাঁর বা আমাদের মনে কোনই আতঙ্কের সৃষ্টি হয় নি, কেননা, আমরা জানতাম শ্রীঅরবিন্দের যোগশক্তি প্রভাবে এই টুকরো মেঘ কোথায় উড়ে যাবে, যদিও কথা-প্রসঙ্গে মা একবার বলেছিলেন যে, অন্যদের কঠিন ব্যাধি সারান তাঁদেব পক্ষে সহজসাধ্য, কিন্তু তাঁদের নিজেদের কোন রোগ সারান ভয়ানক শক্ত। মস্ত লাভ হল যে রোগের সূত্রপাতেই তার নাড়ী-নক্ষত্র জানা গেল, ছদ্মবেশে আক্রমণের কোন সুযোগ রইল না। যুদ্ধ চলবে জ্ঞানের আলোয়। ফলে আসুরশক্তির হল পবাজয়, বোগেব লক্ষণ একেবারে অদৃশ্য হল। কয়েক মাস পরে ডাঃ সান্যাল যখন দর্শনে এলেন, শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "অসুখ আর নেই, আমি রোগ সারিয়ে ফেলেছি।" আমাদের প্রত্যয় দৃঢ় হল।

"সাবিত্রী" মহাকাব্যের কাজ চলতে লাগল পূর্ণ-উদ্যমে; দুই-তিনটি সর্গ মুখে মুখে বলে গেলেন, প্রায় ৪০০ লাইন। ভাব ও ভাষার অপূর্ব সমাবেশ, স্বয়ং বীণাপানি যেন তাঁর কণ্ঠে বসে বিহার

করছেন। বইয়ের পর বই যাচ্ছে শেষ হয়ে, এই গতিতে চললে পুরো কাব্য শেষ হতে বেশি দিন নেই। সবার মুখে সাগ্রহ প্রশ্ন, "সাবিত্রী" আর কতদূর?

কিন্তু "সাবিত্রী"ই তাঁর একমাত্র কাজ নয়। বিশ্বের ধারণা, শ্রীঅরবিন্দ সংসারত্যাগী নিষ্ক্রিয় যোগী; মহাতপস্যায় নিমগ্ন বটে, কিন্তু সে তপস্যা পৃথিবীর কোন কাজে আসবে না তাঁর এবং তাঁর শিষ্যদের মুক্তিলাভ ছাড়া। এ ভ্রান্ত ধারণা অনেকের ভেঙে গেছে; যাঁদের ভেঙে গেছে, যাঁদের ভাঙে নি তাঁরা শুনলে আশ্চর্য হবেন যে এতগুলো 'Epoch making' বই লেখা ছাড়া আশ্রম-সম্পর্কিত সম্পাদকের পরিচালিত পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈ-মাসিক কাগজের প্রবন্ধ শোনা চার-পাঁচটা ভাষায়, নানা চিঠি-পত্রের উত্তর, ভক্তদের ও বাইরের লোকের বিপদে-আপদে সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়া, তাঁর নিজের ও পরের বইয়ের পাণ্ডুলিপি ও প্রুফ সংশোধন ইত্যাদি বহুবিধ কাজ ছিল তাঁর দৈনন্দিন তালিকাভুক্ত; এ সমস্ত ভারী বোঝা বইবার সময় ছিল মাত্র দেড় কি দু'ঘণ্টা। অথচ সবারই দাবী জরুরী। ভগবান সব কিছু করতে পারেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশত একটা জিনিস পারেন না, সময় সংক্ষেপ কি দীর্ঘ করা, নেহাৎ শ্রীকৃষ্ণের মত সুদর্শনচক্র-সাহায্যে সূর্যের মুখ না ঢাকলে। অনেকে অবাক হয়ে ভাবত এত অল্প সময়ের মধ্যে কলের মত দ্রুত-গতিতে কাজের স্তূপ নিঃশেষ হতো কি করে। কলের মতও বটে, শ্রীকৃষ্ণের যাদুশক্তির মতও বটে। কারণ, এ সময় তাঁর কার্যক্ষমতার একটা অদ্ভুত নিদর্শন চোখে পড়ে। যখন কোন প্রবন্ধ পড়তে আরম্ভ করেছি, কিছুক্ষণ পরেই তিনি বলতেন, 'এ লেখা আগে পড়া হয় নি?' 'না তো!' 'সত্যি?' অবাক হয়ে বললাম, 'আজকেই তো পেলাম লেখাটি, পড়লাম কখন?' 'অথচ এর প্রত্যেকটি কথা যেন আগে শুনেছি,' বললেন হেসে, 'আচ্ছা, আর একটু পড়...হ্যাঁ, প্রত্যেকটি কথা পরিচিত, ভারী অদ্ভুত!' এরকম দৃষ্টান্ত একটা নয়। এসব

কর্মকৌশল—যোগঃ কর্মসু কৌশলং—আমরা দেখতে পাই, বুঝতেও পারি কিছু, কিন্তু অদৃশ্য-জগতে তাঁর মহাশক্তির লীলাখেলা বুঝবার ক্ষমতা কোথায় আমাদের? "সাবিত্রী"তে, চিঠিপত্রে, কথাবার্তার ইঙ্গিতে যদি বিন্দুমাত্র আভাস মেলে, আমাদের ক্ষুদ্র চেতনায় তাঁর বিশ্বচেতনার সমগ্র কর্মজালের ছায়া পড়ে কতটুকু? নীলজলধির গভীর জলে আনন্দে মীনের মত সঞ্চরণ করেছি, কিন্তু একদিনও কি ধরতে পেয়েছি তার স্বরূপ, মাপতে পেরেছি তার গভীরতা? মনে পড়ে তাঁর হাস্যকৌতুক যার আকর্ষণে তাঁকে সবাই ঘিরে বসতাম; বরাবরই স্বল্পভাষী, প্রত্যেকটি কথা বলতেন তিনি আস্তে আস্তে যেন এক- একটি ফুল মন্দ হাওয়ায় মাটির বুকে ঝরে পড়ছে, আর আমরা কুড়িয়ে নিচ্ছি সাগ্রহে। নানা-প্রসঙ্গের আলোচনা অপ্রচুর বাক্য-বিনিময়ে এবং কথার সংযত ব্যবহারে, কাব্য হতে আরম্ভ করে জিহ্বার স্থূল রসাস্বাদন পর্যন্ত ছিল বৈঠকের বিষয়-সামগ্রী। স্বল্পবাক, কাজেই গম্ভীর অথচ 'রসো বৈ সঃ'—এই পরিচয় সাধারণ্যে প্রকাশ পেল স্বনামধন্য দিলীপ রায়ের গুণে। অন্তঃসলিলা রসের ফল্গু তিনিই বের করে আনলেন প্রকাশ্যে, আমরা সবাই পরে উপভোগ করলাম পুরোমাত্রায়। সে ফোয়ারার শুভ্রফেননিভ উচ্ছ্বাসে ইন্দ্রধনুর বর্ণমেলার পরিচয়ও দিচ্ছেন তিনি পাঠকদের। অন্যান্য ভ্রান্তির মত এই ভ্রান্তিও তাদের ভাঙবে যে শ্রীঅরবিন্দ শব্দরসগন্ধবর্জিত কঠোর পাষাণ। তাঁর স্বভাবের এই বৈপরীত্যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম একবার, কি করে এটা সম্ভব হল। উত্তরে বললেন, 'রসো বৈ সঃ'। সেই রসিক-সুজনের সাথে আমরা রঙ্গ করেছি বন্ধুর মত, তর্ক করেছি, ঝগড়া পর্যন্ত করেছি। কত জিনিস শিখেছি, কত শিখতে পারি নি, হেলায় নষ্ট করেছি সুবর্ণ-সুযোগ স্বীয় প্রকৃতির বিরোধে। কিন্তু তাঁর হাত বরাবরই প্রসারিত, হৃদয় চির-উন্মুক্ত। অসুখ-বিসুখে সজাগ সতর্ক দৃষ্টি ও বিরুদ্ধশক্তির প্রভাব ও আঘাত হতে সব সময় আমাদের রক্ষা করা—এ সমস্ত

ছিল আমাদের সহজ উত্তরাধিকার। নিজেদেরই বা বলি কেন? আমাদের বন্ধু-বান্ধব পর্যন্ত তাঁর করুণা-স্পর্শ হতে বঞ্চিত হয় নি; পরীক্ষা-পাশে সাহায্যে, তাদের বিয়ের আশীর্বাদ-দানে পর্যন্ত। মনে পড়ে এক বন্ধুর কথা; বন্ধুও বটে, গুরুভাইও। দেশে বসন্ত মহামারী, লোক মরছে চারধারে, শেষে মা শীতলা ঢুকলেন তার নিজের বাড়িতে, তার প্রিয় চাকরের উপর দেখালেন কৃপা। বন্ধু চিঠি ও জরুরী তার পাঠাল গুরুর কাছে চাকরকে বাঁচাতে। প্রভুভক্ত চাকরকে সে ফেলে দিতে পারে না, এতবড় অমানুষী তার পক্ষে অসম্ভব, কারণ মা শীতলা কৃপার মাত্রা ঠিক রাখতে পারলেন না। ফলে দেবীর অসীম কৃপায় চাকর যখন চির-শান্তি লাভ করল, বন্ধু হল শোকে মুহ্যমান। শত্রু-পরিবৃত রাজ্যে—বলে রাখি বন্ধুটি মুসলমান হলেও তার সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা, চানচলন হিন্দুর মতই—একমাত্র বিশ্বস্ত পরিজন তার মারা গেল। গুরু বললেন হেসে, 'I was all the time busy protecting him. Both could not be saved. The servant had to be sacrificed for the sake of the master.' ক্ষুদ্র ঘটনা; ক্ষুদ্র ঘটনাতেই মানুষের এমন কি অবতারের, ভগবানের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। এখন একটি বড় ঘটনার উল্লেখ করি। তখন তাঁর ব্যাধির পরিণত অবস্থা। তাঁর কোন এক শিষ্যা সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত; কোন ডাক্তার রোগনির্ণয় করতে পারছেন না। কেউ বলছেন Coronary thrombosis, কেউ Cancer, কেউ Cervical rib। নানা মুনির নানা মত: রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। অবশেষে মরিয়া হয়ে শিষ্যা গুরুকে লিখলেন যে তিনি একমাত্র তাঁর শরণ নিলেন, তাতে মৃত্যু হয় হোক। প্রত্যেকদিন খবর আসতে লাগল চিঠিতে, টেলিগ্রামে। হঠাৎ ২।৩ দিন কোন খবর নেই। গুরু চিন্তিত হয়ে বললেন, 'ব্যাপার কি? খবর নেই যে?' আমি বললাম, 'ওদের জায়গা বদলাবার কথা, নূতন জায়গায় গেছে বোধ হয়।' 'কিন্তু তা তো ওরা লেখে নি,

পরিষ্কার করে লিখেছে কি?' 'না লিখলেও এটাই তো বুঝা স্বাভাবিক।' 'কেন? চিঠি না লিখবার অন্য কারণ থাকতে পারে না? তুমি তো জান ওদের কি রকম বিরুদ্ধ আত্মীয়-স্বজন?' তবুও গুরুর কথা মেনে না নিয়ে আমি তর্ক করে চললাম, শেষে বললাম, 'হয়তো ওরা লিখেছে, আমার ঠিক মনে পড়ছে না।' 'আমার যতদূর মনে পড়ছে ওরা তা কিছু লেখে নি। আর জায়গা বদলালে নিশ্চয় জানাত।' 'ওদের নীরবতা থেকে আমরা বুঝে নেব, এই ভেবেছে বোধ হয়।' তখন গুরু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'all right, all right; But how am I going to save her if I don't get the news?'

রূঢ় ধাক্কা খেয়ে তার পরদিনই খবর এল; দেখা গেল গুরুর কথাই ঠিক; অন্য কোন বিশেষ কারণে ওরা দু'দিন সংবাদ দিতে পারে নি। রোগী এখন আস্তে আস্তে সেরে উঠতে লাগলেন। সুখের বিষয় সে রোগী এখন সুস্থাবস্থায় আশ্রমেই আছেন। সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে যারা তাঁদের শরণ নিয়েছে, তাদের কি ভয়? এই যে নির্বিকার মহত্ত্ব, নির্লিপ্ত উদারতা, হৃদয়ের অবারিত দাক্ষিণ্য যা নিজেকে আত্মভোলা শিবের মত নিঃশেষে দান করে গেছে, পান করে গেছে পৃথিবীর গরল, তা কি মানুষের দ্বারা সম্ভব? আর যারা তাঁর সেই বিশাল অন্তরের ও সান্নিধ্যের কণামাত্র স্পর্শ পেয়েছে, চিরজীবনের মত ধরে রাখবে তার দুর্লভ স্মৃতি হৃদয়ের গভীরে।

কিন্তু কোথায় চলে গেল সে আনন্দের দিনগুলি! গত বছরের মাঝামাঝি রোগ ফিরে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল তাঁর ভাবান্তর। সেই লীলাসাহচর্যের অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলি আস্তে আস্তে তিনি গুটিয়ে নিলেন; দিনের পর দিন গেছে গম্ভীর নীরবতায়, অনেক চেষ্টায় সে আবরণ ভেদ করতে পারিনি। কোন-কোনদিন বড়জোর হ্যাঁ কি না অথবা তারই নামান্তর ঈষৎ হাসি ছাড়া আমাদের নিপুণ ছলাকলার কোন উপযুক্ত পুরস্কার মিলত না। একের ব্যর্থ চেষ্টায় অন্যে মুখ

টিপে হাসতাম। কিন্তু এ নিয়ে আমাদের জল্পনা-কল্পনারও অন্ত ছিল না। কেউ ভাবত, 'পৃথিবীর দুরবস্থা তাঁর গাম্ভীর্যের জন্যে দায়ী; হয়ত তিনি এই সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত।' (একবার বলেও ছিলেন যে পৃথিবীর অবস্থা সঙ্কটজনক।) অন্য কেউ ভাবত, 'রোগের বিষয় ভাবছেন না তো?' অন্যরা ভাবত Inconscience-এর সাথে প্রবল যুদ্ধে তাঁর সমস্ত শক্তি এখন নিযুক্ত ইত্যাদি নানা কল্পনা আমাদের উর্বর মস্তিষ্কে ঢেউ খেলে যেত। কিন্তু সবই হতো ব্যর্থপ্রয়াস। কোথায় যেন তিনি চলে গেছেন, কাছে অথচ বহুদূরে!

কিন্তু এতে তাঁর দৈনন্দিন কাজের কোন ব্যাঘাত হল না; বরং বাইরের কাজ এমন বেড়ে গেল যে শেষকালে তিনি বাধ্য হলেন বলতে, 'আমার আসল কাজের জন্য সময় পাচ্ছি না।' "সাবিত্রী"র কাজ এখন অগ্রসর হতে লাগল ধীরে ধীরে। দুটো Canto-র revision চলছে, প্রায় ২০০।৩০০ নূতন লাইন যোগ হয়েছে। কী revision! তাঁর অসীম মনোযোগ, ধৈর্যের ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পেয়েছি আগে, Life Divine লিখবার সময় দেখেছি কী তন্ময়ভাবে লিখে যাচ্ছেন। হাতে এক-গ্লাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে বা অন্য কাজে, আস্তে আস্তে মা কখন এসে দাঁড়িয়েছেন টেরও পান নি; অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ মুখ তুলে দেখেন, মা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। এদিকে, ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে চারধারে। পাখার হাওয়া পাখির পালক-বীজনের মত নিষ্ফল। এক একবার রুমাল নিয়ে ছোট ছেলের গা মোছার মত একটুখানি মুছে আবার লিখছেন। তিন-চারখানা বড় রুমাল, কাপড়, বিছানা, গদী পর্যন্ত ভিজে একাকার, কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এই তন্ময়তাও দেখেছি, আবার তেমনি অন্যদিকে দেখেছি কবিতার প্রতি অনুরূপ দরদ ও প্রত্যেক লাইনের নিখুঁত রূপের আদর্শ ছবি ফোটান, এমন কি punctuation-এর প্রতি তীব্র মনোযোগ। মনে পড়ে একটা preposition বদলান ৫।৬ বার, punctuation-ও তদ্রূপ; এমনও হয়েছে যে একটা comma, semicolon বদলাতে

গিয়ে canto-ব অর্ধেক হয়েছে পড়তে। এসব যেন নূতন দৃষ্টি খুলে দিত, কিন্তু ভুল হতো একটি জায়গায় বাব বার, নিজের মাঝে। তাঁর এই পূর্ণতাব আদর্শের সাথে তাল রেখে চলা দুর্বল মরচেতনার পক্ষে সম্ভব হতো না। সেজন্যে হয়তো কাজ বয়ে গেল অপূর্ণ, নানাস্থানে শিখরচ্যুত।

এই সময় এল প্রকাশকেব তলব, নূতন বই চাই। পুরানো বচনা Future Poetry নেওয়া হল, একটা নূতন অধ্যায়ও কিছু লেখা হল। কিন্তু Modern Poetry সম্বন্ধে যখন বই আলোচনার প্রয়োজন হল, তখন বললেন, 'এখন থাক, আবার "সাবিত্রী" নাও।' সেই দুই canto-র সাথে যুদ্ধ! এদিকে রোগের লক্ষণ কিছুমাত্র কমে নি। প্রস্রাব তেমনি ঘন ঘন হচ্ছে; তবে সৌভাগ্যবশত অন্য উপসর্গ দেখা দেয় নি। সেদিকে তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ "সাবিত্রী'র কাজে, অথচ হাতে সময় মাত্র দেড় ঘণ্টা। তার উপব, অন্যের দৃষ্টির সাহায্যে নির্ণয় করতে হতো তাঁব গতিবেগ। এই দুটো প্রতিবন্ধক কবির পক্ষে কত মারাত্মক মরমী ভুক্তভোগীরা বুঝবেন। বুঝেছিলেন নিশ্চয় কবিবর Milton, শ্রীঅরবিন্দ শুধু কবি নন, যোগী, ঋষি, কাজেই দৃষ্টিক্ষীণতার ব্যথা এতখানি না বাজলেও অসুবিধা ভোগ অনিবার্য। কতবার বহু চেষ্টা করেও যখন জায়গায় জায়গায় তাঁর হাতের লেখা উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি, নলিনী গুপ্তের মত সিদ্ধহস্তও যখন হার মেনেছেন magnifying glass-এর সাহায্যে দশগুণ জোরালো দৃষ্টিক্ষমতা লাভ সত্ত্বেও, তখন তিনি বলতেন, 'দাও তো আমায় একবার, শেষ চেষ্টা করে দেখি।' আমি মনে মনে হাসতাম; প্রথমত নিজেকে নিজের লেখা উদ্ধার করবার চেষ্টা দেখে, 'আপন লেখার ফাঁদে, ব্রহ্মা পড়ে কাঁদে।' দ্বিতীয়ত, আমাদের মত পাকা লোক যেখানে ঘোল খেয়ে গেল, সেখানে magnifying glass দিয়ে তিনি ১০।১৫ বছরের আগেকার লেখা উদ্ধার করবেন। অথচ মুক্তার মত ছিল তাঁর হস্তাক্ষর। কিন্তু যখন ঘণ্টায় ১০।১২ খানা চিঠি

লিখতে হতো তখন লেখা প্রায় তার সৃষ্টির আদি অক্ষরে যেত ফিরে। দু'একবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে বলতেন, 'নাঃ, অসম্ভব! ও কথাটা বাদই দাও তাহলে।' কাজ চলল এইসব বাধা অতিক্রম করে। কিন্তু গতি মন্থর; কেন যে তাঁর সাবলীল স্রোতস্বিনী এই দুই canto-তে এসে বার বার বাধা পাচ্ছে, কোথাও punctuation-এর উপলখণ্ডে, কোথাও ভাবের নিমজ্জিত প্রস্তরে, আর কোথাও বা উপমার বালুচরে বুঝতে পারলাম না। এই canto-তে ঠেকেন তো অন্য canto নেন; অন্যতম প্রবাহ শিথিল হয়ে আসে তো এটার মোড় ফেরাতে চেষ্টা করেন।

এসময় এল আবার জরুরী ডাক, Bulletin-এর জন্যে লেখা চাই। কোথায় "সাবিত্রী"র কাব্যরস আর কোথায় Bulletion-এর জন্যে ফরমাসী গদ্য রচনা। চন্দ্রলোক হতে একমুহূর্তে পৃথিবীর ঊষর বক্ষে নামা! ২।১ দিন বৃথা চেষ্টার পর তৃতীয় দিনে যখন স্রোত নামল, দু'দিনের মধ্যে লেখা হল শেষ। শ্রীঅরবিন্দের মত মহাকবি ও লেখকেরও পাথর কাটতে হয় দেখে অবাক লাগত। ভাবছি, এখন কি নেবেন, Future Poetry না অন্য কিছু; হঠাৎ অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, 'Take up "Savitri". I want to finish it soon.' শেষ কথাটা কানে ভীষণ বাজল, 'Finish it soon!' কেন, এত তাড়া কিসের? মনে মনে ভাবলাম; একবার আড়নয়নে তাকালামও, কিন্তু তেমনি নির্বিকার মুখের ভাব, তেমনি বহির্দৃষ্টি।

নেওয়া হল সেই দুই canto; সুরু হল ফের যুদ্ধ, বিশেষ করে দু'একটা জায়গায়। যত কাটাকুটি, তত গোলযোগ। কত 'কালো রক্ত' ক্ষয় হল, পাণ্ডুলিপি ক্ষত-বিক্ষত হল, মনের মত ছবি ফুটল না। এবার যেন সেই উৎসাহ নেই, নেই সেই আবেগ, বরং পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার তাড়া, যেটা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। প্রকৃতিতে যিনি চিরপ্রশান্ত,. আচারে-ব্যবহারে যাঁর আত্মার কৌলীন্যের অভিব্যক্তি, আহার-বিহার যাঁর অন্তর-দেবতার পূজা, প্রতিটি বাক্য সুষমামণ্ডিত

সঙ্গীতের বিরতি, প্রতিটি পদক্ষেপ মায়ের বুকে সোনার শিশুর কোমল স্পর্শ, সাম্যের ও ধৈর্যের যিনি ভাস্বর মূর্তি, দুর্জয় অভিযানে কি সাময়িক পশ্চাদগমনে যাঁর অনুরূপ নির্বিচলতা, তাঁর সহসা ধৈর্যচ্যুতি যে বিস্ময়কর। তিরোধানের পর তাঁর কাগজপত্র যখন ঘাঁটতে হল প্রথম চোখে পড়ল সর্বত্র ছড়াছড়ি "সাবিত্রী"র খসড়া ; এখানে সেখানে, নোট বইতে, ছেঁড়া লেফাফার পৃষ্ঠায়। কোন কোন অংশ ৩।৪ বার লেখা, কোনটা আরও বেশি, কোনটা কম, কোনটা বাকি, কোনটা মাত্র আরম্ভ। নানা অবস্থায় তারা বিরাজ করছে। কোন লাইন নীচের থেকে উপরে, কোনটা উল্টো দিকে তীরবিদ্ধ হয়ে ছুটোছুটি করছে, এই এপিক রণক্ষেত্রে। আর কোন জায়গায় ট্রেঞ্চের মত লাইনগুলো ঠাসাঠাসি হয়ে নিশ্বাস-রোধের উপক্রম। "সাবিত্রী"র প্রথম বই revision করেন দশবার ; ৫।৬ বার revision-এর পর মিলল সেই পরম বিস্ময়কর কল্পনা-বিজয়ী প্রথম লাইন,

This is the hour before the Gods awake,

এই কি genius, না, দেবতার কঠোর পরিশ্রম ? এ হেন পূর্ণতার পূজারী যখন বলে উঠেন—"সাবিত্রী" শীগ্‌গিরি শেষ করতে চাই'—তখন ভিতরটা প্রবল ধাক্কা খেয়ে নড়ে উঠে। আর সাথে সাথে যখন চোখে পড়ে স্রোতের গতি মন্দাক্রান্তা, বাধা অতিক্রমের আবেগ ও উৎসাহ শিথিল—বরং কোন কোন স্থলে কথার, ভাবের পুনরাবৃত্তি, তখন প্রশ্ন জাগে কোথায় ছন্দ কেটে গেছে ? অন্তরের মেলায় ঐকতান বেসুরা বাজছে কেন ? না হলে কোন বাধা যাঁর সিংহবিক্রমকে হার মানতে পারে নি, কোন অলক্ষ্য দ্বন্দ্ব এখন তাকে গতিভ্রান্ত করছে ? শারীরিক অসুখ ? কেনই বা তাঁর এই কষ্টদায়ক গাম্ভীর্য ? এই সব অস্বাভাবিক আচরণ ও সেই সামান্য ছুটো কথা—I want to finish it soon. কী গভীর অর্থ লুকিয়েছিল বুঝতে পারলাম বড় দেরীতে, যখন জ্ঞানের আলো অনুতাপের শিখা জ্বলে।

অবশেষে পথ মুক্ত হল। যখন বললাম, 'এবার শেষ হল canto-ছুটি,' হেসে বললেন, 'ah! it is finished?' সেই পরিতৃপ্ত হাসি এখনও চোখের সামনে ভাসছে, দীর্ঘপথ বেয়ে নিশ্বাস ফেলে যেন কূলে এসে দাঁড়ালেন। 'এখন বাকি কি?' দ্বিতীয় প্রশ্ন। 'Book of Death and Epilogue', 'oh, that? we shall see about it afterwards', বললেন শান্ত প্রসন্ন হেসে। কিন্তু তিনি প্রসন্ন হলেও আমার ভাবে ছিল অসন্তোষ; যাঁরা এই canto-ছুটো পড়েছেন তাঁদের চোখে ধরা পড়েছে স্থানে স্থানে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি পুনরাবৃত্তি কথার ও ভাবের। কিন্তু সেগুলো যে গলদ নয়, বিনা প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি নয়, তার অন্য গভীর অর্থ নিহিত আছে এ-সত্য না বুঝে নিজেকে বার বার জিজ্ঞাসা করেছি, কেন তিনি "সাবিত্রী" শেষ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন? কোথায় গেল তাঁর দেবকল্প পরিশ্রম, বিশাল স্থাপত্য-সূক্ষ্ম কারুকার্য মন্দির-পরিকল্পনার? এই ছিল অজ্ঞান যন্ত্রের অসন্তোষজনক প্রশ্ন। তার উত্তর পেলাম পরে—রাত্রি-সমাচ্ছন্ন চেতনার হাহাকারে যখন প্রতিধ্বনিত হতে লাগল "সাবিত্রী"র সেই পুনরাবৃত্ত লাইনগুলি নূতন অর্থে—

A day may come when she must stand unhelped
On a dangerous brink of the world's doom and hers,
In that tremendous silence love and lost,

* * *

Cry not to heaven, for she alone can save,
She only can save herself and save the world.

Cry not to heaven, for she alone can save—এ কি তাঁর শেষ আদেশ নয়, অন্তিম বাণী নয়? "সাবিত্রী"র চিত্রপটে নয় কি তাঁর শেষ স্বাক্ষর? মিলিয়ে গেল হাহাকার, ধীরে ধীরে মূর্ত হল তাঁর দক্ষিণহস্ত, বরাভয়া মাতৃরূপ।

তখন তা বুঝতে না পেরে মনে মনে স্থির করেছি শেষবার revi ion-এর সময় এইসব ত্রুটি তাঁর শ্যেনদৃষ্টি এড়াতে পারবে না, কিন্তু হায়, শেষ revision! Canto-দুটো শেষ হল, শীতও এল, আর সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেল অসুখ। ঘন ঘন প্রস্রাব হচ্ছে, কষ্টকরও, আবার ক্বচিৎ বেগও আটকে যাচ্ছে। এসব লক্ষণ যে পূর্বে মধ্যে মধ্যে দেখা দেয় নি তা নয়, তেমনি চলেও গেছে। কিন্তু একদিনও তিনি নিজের কাজ বন্ধ রাখেন নি। বহুবার ভেবেছি, আজ হাতে মাত্র আধঘণ্টা সময় ছুটি হলে মন্দ হয় না। কিন্তু না, সব আশা ও আলস্যের অন্তরায় চূর্ণ করে দিয়ে তিনি বলতেন, 'চলো, একটুখানি কাজ করা যাক।' কাজের প্রতি এই যে তাঁর সহজাত অনুরাগ তার শেষ পুরস্কার মিলল : "সাবিত্র"ই হল তাঁর শেষ কর্মকাহিনী। কিন্তু অসুখ এখন বাড়তে দেখে মাথায় টনক নড়ল, যদিও হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া আমাদের অন্য কর্তব্য ছিল না। কেননা, মানবদেহী হলেও সাধারণ রোগীর মত আমাদের ডাক্তারী নিয়ম ও কার্যকৌশল তাঁর উপর চলতে পারে না, যেমনি পাবে না এই জগতের আইন-কানুন ঊর্ধ্ব জগতের জীবযন্ত্রের কর্ম পরিচালনা করতে। আমাদের কর্তব্য ছিল, শুধু তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে রোগের ছদ্ম আক্রমণ, তার কুটিলগতি ও বহুরূপী প্রকাশের পরিচয় করিয়ে দিয়ে নির্ভর করে থাকা তাঁর শক্তির উপব। তাছাড়া, এই ব্যাধির যে দুটো প্রতিকার জানা আছে, অপারেশন, নয় যন্ত্র-ব্যবহার, তার কোনটাই এক্ষেত্রে চলবে না। আর এসব মহামারী অস্ত্র তাঁর কোমল পবিত্র দেহের উপর চালনা করা আমাদের ইচ্ছাও নয়, অবশ্য-প্রয়োজনীয় না হলে। সে প্রয়োজন এখনও দেখা দেয় নি আর তাঁর যোগশক্তির কার্যকারিতার উপর আমাদের বিশ্বাসও সম্পূর্ণ অবিচলিত।

ঠিক এই সময় এসে পড়লেন ডাক্তার-বন্ধু সত্যব্রত সেই F.R.C.S. (Eng.), নভেম্বর দর্শনের ১০-১২ দিন আগে। একটু জোর পেলাম। তাঁকে ডাকা হল, দেখেশুনে তিনিও বললেন, 'Prostatic

Enlargement-ই বটে; gland-টা বেশ বড় হয়েছে।' শ্রীঅরবিন্দ বললেন, 'হ্যাঁ, আমিও তা অনুভব করছিলাম, কিন্তু প্রতিকার কি?' ডাক্তার চিন্তিতস্বরে বললেন, 'লক্ষণগুলো ভাল লাগছে না; অপারেশন যদি সম্ভব না হয়, অন্ততঃ যন্ত্র-ব্যবহার দরকার হতে পারে।' শ্রীঅরবিন্দ ভয়ানক আপত্তি জানালেন, 'না, Catheter চলবে না।' আমরাও ভাবলাম, দর্শনের আগে কোন গোলমাল না হলেই ভাল। ডাক্তারও তেমন আশু প্রয়োজন না দেখে মত দিলেন। দর্শনের মাত্র কয়েকদিন বাকি; রাত্রে হঠাৎ প্রস্রাব যায় আটকে। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে ছুটলাম, যন্ত্র দেবার প্রয়োজন হতে পারে বলে। ইত্যবসরে বাধা কেটে যায়। ডাক্তার ডাকতে গেছি শুনে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, 'Why? Has he lost his head?' ফিরে এসে খবর ও তাঁর মন্তব্য শুনে বড় খুশি হলাম। ডাক্তারকে দেখে তিনি বললেন, 'কেন বেচারাকে অনর্থক কষ্ট দিলে?' তারপর স্বর নামিয়ে বললেন হেসে, 'ব্যাপারটা কত মজার শোন; তন্দ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখলাম প্রস্রাবের কষ্ট কিছু নেই, বিনা বাধায় স্রোতের মত জল বের হচ্ছে; অথচ ঘুম ভাঙতেই দেখি তার উল্টো। বুঝলে তো এখন? ভয় পাবার কি আছে এতে?' পরদিন ঘটনাটা শুনে মা'ও বললেন, 'এত বছর শ্রীঅরবিন্দের সাথে রইলে, তবুও ভয় পাও?' বললাম, 'কি করব মা? এ যে শ্রীঅরবিন্দ।' 'সেই জন্যেই তো ভয় পাবে না।' জোর দিয়ে বললেন তিনি, 'তুমি কি জানো না তাঁর কত বড় শক্তি সব সময় তোমাদের সাহায্য করছে? ভয় বড় মারাত্মক জিনিস, কিছুতেই তাকে প্রশ্রয় দেবে না। বিশেষ যারা তাঁর সেবা করছ, তাদের মাঝে ভয়ের ছায়ামাত্র যেন না থাকে।' লজ্জা পেলাম, সাহসও।

দর্শনের আগের দিন কোন এক জ্যোতিষী শ্রীঅরবিন্দের ঠিকুজি পড়ে নাকি জানিয়েছে যে, তিনি বর্তমানে সাংঘাতিক অসুখে ভুগবেন, ফলে দেহত্যাগেরও সম্ভাবনা আছে। বলা বাহুল্য, কথাটা আমরা

হেসেই উড়িয়ে দিলাম, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলে বসলেন, Find out what he has written, I feel he has caught some truth'. এর কিছুদিন আগে অন্য এক জ্যোতিষী বলেছে, 'This year will be Sri Aurobindo's self-undoing', শ্রীঅরবিন্দ জ্যোতিষে বিশ্বাস করতেন; গভীরভাবে চর্চাও করেছেন এবং প্রায়ই এ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনায় উৎসাহ সহকারে যোগ দিতেন, কতকটা কৌতূহলে। আমরাও সুযোগ বুঝে খবরের কাগজের নানা অদ্ভুত গণনার কথা তাঁকে শোনাতাম। হায়দ্রাবাদের অমুক জ্যোতিষী বলেছে, 'দু'তিন বছর বৃষ্টি হবে না।' মহীশূরের জ্যোতিষী বলেছে, 'সত্যযুগের আর দেরী নেই', 'বল্লভভাই প্যাটেল এই বছর যদি বেঁচে যান, তাহলে বহু বছর পরমায়ু বাঁধা। তবে তার জন্যে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করা চাই, দশ হাজার টাকা খরচ করে' ইত্যাদি বহুবিধ উপভোগ্য গল্প তাঁর কানে তুলতাম। কিন্তু সব কিছু একেবারে বুজরুকি বলে তিনি উড়িয়ে দিতেন না। বরং বলতেন যে, জ্যোতিষশাস্ত্র অনেক ক্ষেত্রে অতীত ঘটনাবলী অভ্রান্তভাবে গুণতে পারে। কিন্তু তার ভবিষ্যৎ বিধান সব সময় অলঙ্ঘ্য ও অভ্রান্ত নয়। কারণ যোগী ভগবৎ দত্ত শক্তিতে নিজের ও পরের ভবিষ্যৎ বদলাতে পারে। তিনি এও বিশ্বাস করতেন না যে, এই পৃথিবীর কর্মভূমিতে অনড়, অচল, স্থির predetermination বলে কিছু আছে। বরং তাঁর মতে সবই বিপরীত সম্ভাবনার খেলা। যোগী সে সম্ভাবনাকে কলের মত এদিকেও ঘোরাতে পারে, ওদিকেও। তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি তাঁর জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। কলকাতার নামকরা নারায়ণ জ্যোতিষী তাঁর ঠিকুজি পড়ে নাকি তাঁর অতীত ঘটনা হুবহু বলে দিয়েছিলেন, আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, ৬৪ বৎসর বয়সে তাঁর সাংঘাতিক, মরণাপন্ন অসুখ হবে; কিন্তু যদি যোগশক্তি-প্রভাবে সঙ্কট মুক্ত হতে পারেন, তবে তিনি পরিপক্ব বৃদ্ধ বয়সে উত্তীর্ণ হবেন। 'দেখ তাহলে' তিনি বললেন হেসে, 'এখনও আমি বেঁচে আছি।'

কাজেই জ্যোতিষশাস্ত্রের বিধান শ্রীঅরবিন্দের জীবনচক্র নিয়ন্ত্রিত করবে এ ধারণা আমাদের মনে ঘূণাক্ষরেও স্থান পায় নি। কিন্তু 'I feel he has caught some truth', তাঁর একথার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য যাই থাক, খবর নিয়ে জানা গেল, জ্যোতিষী ভয়ের কথা কিছু লেখেন নি। আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে জ্যোতিষের মুণ্ডপাত করে দর্শনের জন্যে তৈরী হলাম।

বহু লোক; হাজার দুয়েকের উপর দর্শনার্থী। দর্শন বন্ধ করে দেওয়া সমীচীন কিনা সে প্রশ্নও ওঠে, কিন্তু ভক্তদের অন্তরের ডাক তাঁরা অবহেলা করতে পারলেন না। শ্রীঅরবিন্দের অসুস্থতার কথা দূরাগত ধ্বনির মত তাঁদের কানে এসেছে; কিন্তু মর্মে পৌঁছায় নি। একে একে দর্শনার্থীরা এল; দেখল তারা অদূরে তাদের দৃষ্টির উজ্জ্বল সীমায় নয়নাভিরাম মহেশ্বর, গম্ভীর সমাহিত, উদার-ছন্দ-সমাবৃত; আর তাঁরই দক্ষিণে ধ্যানান্বিতা হাস্যামোদিতা মহেশ্বরী; যেন বলছেন, 'সম্ভবামি যুগে যুগে।' হঠাৎ প্রায় দু'ঘণ্টা পরে লম্বা জনশ্রেণী চঞ্চল হয়ে উঠল, খবর রাষ্ট্র হল শ্রীঅরবিন্দ অসুস্থ, তাড়াতাড়ি দর্শন শেষ করতে হবে। দর্শন-শেষে মনে হল তিনি ক্লান্ত।

দর্শনও শেষ হল, রোগও হল প্রবল। খারাপ লক্ষণগুলো স্পষ্ট ইঙ্গিতে জানালো তাদের অধিকার। স্থির থাকতে না পেরে তাঁদের জানালাম, 'এখন তো যন্ত্র-ব্যবহার অনিবার্য হয়ে পড়েছে।' অগত্যা তাই সাব্যস্ত হল এবং ডাঃ সান্যালকে অবিলম্বে চলে আসতে তার করা হল। তাঁকে বহু আগে সতর্ক করে রাখা হয়েছিল সঙ্কটাবস্থায় ডাক পড়লে তিনি যেন তৎক্ষণাৎ রওনা হন। ২।৩ দিনের মধ্যে এসে পড়লেন তিনি।

যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্রাবের বাধা কেটে গেল দেখে শ্রীঅরবিন্দও খুশি হলেন। ডাক্তার সান্যাল দেখেশুনে শান্তকণ্ঠে বললেন, 'ভয়ের কোন কারণ নেই।' রোগের আনুপূর্বিক ইতিহাস তাঁকে জানালাম। তিনি আশ্চর্য হলেন কি করে অসুখটা এত গুরুতর অবস্থায় এসে

দাঁড়াল। 'প্রথমবার যদি শ্রীঅরবিন্দ নিজের শক্তিতে এই রোগ সারিয়ে থাকেন, দ্বিতীয়বার কি হল? সূত্রপাতেই যদি তিনি অবহেলা না করতেন, তাহলে সেই ক্ষুদ্র বীজ এতখানি বাড়তে পারে কি? এছাড়া কোন সঙ্গত যুক্তিই তো আমি খুঁজে পাই না।' এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর নেই, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেও কোন জবাব মেলে নি। নিজের চোখে যা দেখেছি তা এই যে, তাঁর ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায় এবার প্রথম হতেই রোগ আস্তে আস্তে বেড়ে চলেছে। তাকে যেন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে আপন বক্রগতিতে বয়ে যাবার, কিন্তু একটি সর্তে যে, সে যেন তাঁর কাজে কোন ব্যাঘাত না জন্মায়। তাঁর চেতনার দু'দিকে বয়ে চলেছে যেন দুই ধারা—"সাবিত্রী"র আকাশগঙ্গা, আর রোগের পাললস্রোত। যখন আমরা একদিকে ব্যস্ত মানবজাতির ভবিষ্যৎ জীবন-স্বর্গ-রচনায়—দীর্ঘ বাক্য-তন্তুজালে, দেবতার অনুপম ভাষায় ও ছন্দে, তখন রোগ-শক্তি চলেছে ভিতরে ভিতরে তাঁর দেহের ভীত ভেঙে। তাঁর প্রধান কর্ম "সাবিত্রী" লেখাও শেষ হল আর ব্যাধিকেও যেন মুক্তি দিলেন তার সর্ত হতে। যেন বললেন, 'আমি প্রস্তুত'; হঠাৎ রোগবৃদ্ধির আর যুক্তিসঙ্গত কারণ বুঝা যায় না। যুক্তি যাই হোক, আমরা কিন্তু দীপ্ত আশায় ও নির্ভরতায় নিজেদের পাহারা দৃঢ়তর করলাম যাতে কোন অজুহাতে শনির কোপ না বাড়তে পারে। এই সময় চোখে পড়ল একটা জিনিস; তাঁর চেতনার ক্রমশ অন্তর্লীন অবস্থা, আর প্রস্রাবের কষ্ট চলে যাওয়াতে বেশি সুবিধা হল এই কাজের। এখন দেহকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলেন তার আপন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনুসারে চলতে, আর তিনি মন দিলেন অন্য কাজে যার সম্যক মর্ম উপলব্ধি আমাদের পক্ষে অসম্ভব। শরীর যদি যায়ও তাতে কি ক্ষতি, যদি তিনি বদলে পান সেই পরমবস্তু? এই দেহ দিয়ে তিনি বহু কাজ করেছেন, প্রভুভক্ত ভৃত্যের মত দেহও তাঁর সেবা করেছে। যখন যা আদেশ করেছেন, তাই মেনে নিয়েছে, দীর্ঘ উপবাস থেকে আরম্ভ করে নিজের ও ভক্তদের রোগ-

যন্ত্রণা গ্রহণ পর্যন্ত ! মা'র কথায়—'এই শরীর ভুগেছে, সহ্য করেছে, প্রচণ্ড আঘাত বুক পেতে নিয়েছে, সকল সম্পদ অর্জন করেছে আমাদের জন্য।' এখন যদি তিনি দেখেন যে, সেই শরীরই পঙ্গু জরাগ্রস্ত হয়ে তাঁর দেবোত্তর গতির প্রতিবন্ধক হচ্ছে, তাহলে সে শরীর কেন বদলাবেন না ? দেহের বাধাবিপত্তি যেমন তাঁর কাজে কোন অসুবিধা করতে পারেনি বরং তিনি সমানে কাজ করে গেছেন পুরো উৎসাহে, এখন সে কাজের শেষে যখন অন্য গূঢ়তর বিষয়ে নিযুক্ত হলেন, তখনও দেহের অন্তরায় তাঁকে সে কর্ম হতে তিলমাত্র বিচলিত করতে পারল না। শরীরের এই দারুণ বিকল অবস্থায়ও লাভ করলেন তিনি প্রচুর সম্পদ তাঁর আত্মার তপঃশক্তিতে। কোন বিরুদ্ধ অবস্থায় বিন্দুমাত্র কম্পিত হওয়া তাঁর স্বভাব নয় ; প্রয়োজনবোধে যদি কোথাও দখল ছেড়ে দিতে হয়েছে, অন্যদিকে করে নিয়েছেন ততোধিক ক্ষতিপূরণ, যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন করে থাকে সুদক্ষ সেনাপতি আর যেমন করেছেন পরম যুদ্ধবিশারদ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এই জন্যেই তো শত্রুরাও তাঁর অপ্রত্যাশিত চালে হতবুদ্ধি হয়ে যেত। এই যে দিব্যকৌশল-চূড়ামণি শ্রীঅরবিন্দ, তাঁর শেষ যুদ্ধের পরমাশ্চর্য-জনক শ্রেষ্ঠ চালের কী গভীর উদ্দেশ্য, আমাদের দেখবার বাকি আছে। আর যদি তিনি জানেনও যে তার পরাজয় অনিবার্য, তাতেও তাঁর কর্তব্যে কিছুমাত্র ত্রুটি হতো না। 'আমার Mission ব্যর্থ হবে জানলেও শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি আমার আজ করে যাব',—তাঁরই কথা। গীতার নিষ্কাম কর্ম ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। একটি পুরানো গল্প বলি, দৃষ্টান্তস্বরূপ। Cripps Mission সদ্য ভারতে উপস্থিত ; সবাই জানেন শ্রীঅরবিন্দ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দেশের নেতাদের বার বার অনুরোধ করলেন এ সুযোগ না হারাতে। কী অনুনয় ! অবাক হলাম আমরা তাঁর এই স্বভাববিরুদ্ধ আচরণ দেখে। নিজের খুব অন্তরঙ্গ ভক্ত ও শিষ্যকে ছাড়া কোনদিন কোন উপলক্ষে কাউকে এরকম অনুনয় করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এই অযাচিত

উপদেশের জন্যে দেশভক্ত অনেকে তাঁকে গালাগালি করেছে; কিন্তু তিনি তা ভ্রূক্ষেপ করেন নি। অধিকন্তু যখন একজন শিষ্য দিল্লী যেতে চাইল তাঁর প্রতিভূ হয়ে, তিনি মত দিলেন। কিন্তু তিনি যাবার পরই শ্রীঅরবিন্দ বললেন, 'কোন ফল হবে না; Mission ব্যর্থ হবে।' 'তবে এতখানি চেষ্টা করলেন যে!' হেসে বললেন, 'I have done a bit of Nishkama Karma' একটুখানি নিষ্কাম কর্ম করলাম।'

এই হল তাঁব জীবন, কোনদিকে দৃক্‌পাত না করে অবিচলিত ধীর বা ক্ষিপ্র-পদক্ষেপে নিজের নির্ধারিত কাজে কি লক্ষ্যে পলে পলে, দিনের পর দিন, বছরের পর বছব অক্লান্ত নিষ্ঠায় অসীম ধৈর্যে অগ্রসর হওয়া, কাজ ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, ফল ভাল কি মন্দ, জনমত স্বপক্ষে কি বিপক্ষে, সমস্ত বিষয়ে সর্বক্ষণ ভগবানকে স্মরণ করে, তাঁব সেবায় সমস্ত কর্মভাগ উৎসর্গ করে জীবনকে আনন্দে, জ্ঞানে, শৌর্যে-বীর্যে পূর্ণ করে —এক কথায় নিজের জীবনে ভগবানের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা, এই শ্রীঅরবিন্দ আর তাঁর যোগের আদর্শ। আজ কেউ কেউ দেখতে পাচ্ছেন তাঁর পবাজয়। শ্রীকৃষ্ণ পরাজয় স্বীকার করেন নি? যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করেন নি? ভগবান যদি প্রত্যেক পদে তাঁর সর্বশক্তিমান ক্ষমতাব অপব্যবহার করেন, তাহলে অবতারের অর্থ কি মানুষ সে অবতারের পদানুসরণ করবে কেন? এই সৃষ্টিলীলার অর্থই বা কি তাহলে? ভগবান মানুষ হয়ে আসেন তাকে শেখাবার জন্যে, তাকে তুলবার জন্যে; মানুষের সুখ দুঃখ মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করেন তাকে দেখাবার জন্যে, (তিনি আমাদেরই একজন অথচ আত্মার বলে এসব উত্তীর্ণ হয়ে পেতে পারি আমরা নিজের সচ্চিদানন্দ রূপ; তখন দুঃখ জরা মৃত্যু পায় অমৃতে রূপান্তর) এই তো দেখিয়ে গেলেন তিনি বিদায়পর্বে। তিনি কি জানতেন না তাঁর জীবনে কালপুরুষের দীর্ঘ ছায়া পড়েছে? যিনি সামান্য টেলিগ্রাম-লিপি দেখে বলতে পারতেন রোগীর পরিণাম নিজের ভাগ্যলিপি সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অজ্ঞ? অসম্ভব। একটি ঘটনা বলি, বহু আগেকার কথা। পণ্ডিচেরীর এক দুর্ধর্ষ রাজনৈতিক সর্দার

বিপক্ষ দলের হাতে আহত ; কেউ বলছে সাংঘাতিক, serious ; কেউ বলছে সামান্য জখম। শ্রীঅরবিন্দ শুনে বললেন, 'not serious ?'—বলে চুপ করে গেলেন। তার পরদিনই বোধহয় লোকটি মারা গেল। (এরই পিতৃদেব শ্রীঅরবিন্দকে বৃটিশরাজের হাতে সঁপে দিতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন।) শ্রীঅরবিন্দ বললেন, 'তাই তো আমি ভাবছিলাম ; পরিষ্কার দেখলাম লোকটি operation table-এ মৃতাবস্থায় পড়ে আছে, অথচ তোমবা বললে, not serious !' এসব জ্ঞান যে মা ও শ্রীঅরবিন্দের নখাগ্রে। যাদেব এতটুকু দৃষ্টি আছে তারা বলবে, তিনি জানতেন এই মহাকৃষ্ণাসুর ধীরপদে তাঁব দিকে এগিয়ে আসছে ; সম্মুখে বিরাট যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ফল ভগবানের হাতে, কিন্তু বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্রমেদিনী, আব যদি যেতেই হয়, ভীমের মত কাঁপিয়ে দিয়ে যাব সমস্ত পৃথিবী—এই ছিল যেমন তাঁব ধনুর্ভাঙা পণ, অন্যদিকে তেমনি তৈরী করে গেছেন প্রতিটি ধাপ। কালাতীত পুরুষ তিনি, বরাবর কালের গণ্ডী অতিক্রম করে চলেছে তাঁর চিন্তা ও কর্মের ধারা, প্রতিটি পদচিহ্নে রেখে গেছেন কালোত্তর জ্ঞান ও শক্তির ব্যঞ্জনা। আপাতদৃষ্টিবদ্ধ জীব আমবা কি করে বুঝব এই মহাকূটনীতি-বিশারদের আত্মত্যাগের অর্থ ? তবে একথা নিঃসন্দেহ যে, পৃথিবীতে এমন শক্তি নেই তাঁর কেশমাত্র স্পর্শ করতে পারে তাঁর বিনা অনুমোদনে। এক্ষেত্রে যদি সে অনুমোদন তিনি দিয়ে থাকেন তার কারণ অন্যপক্ষে পেয়েছেন বিরাট সম্ভাবনার নিশ্চিত স্বাক্ষর। দেহ-মন-প্রাণ তাঁর কাছে কি ? মূল্য কতটুকু, যদি তার পরিত্যাগে পান তাঁর দেবকল্প সাধনার প্রতিশ্রুতি ? জীবদ্দশায় যদি সে সিদ্ধি পাওয়া যায় উত্তম ; তা যদি সম্ভব না হয়, মরণ-চিতায় নিজেকে সঁপে দিয়ে যদি পেতে হয় সে অমৃতভাণ্ড, তাহলে মৃত্যুকেও বরণ করবেন সেই মহাবীর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ যুগাবতার—শ্রীঅরবিন্দ। এই হল তাঁর আত্মত্যাগের একটি অর্থ। অনেকে আমাদের জিজ্ঞাসা করছেন শেষ মুহূর্তে তিনি কোন আদেশ বা উপদেশ দিয়ে গেছেন কি না। উত্তরে 'হ্যাঁ'ও বলা

যায়, 'না'ও। 'না', কারণ আত্মনিমগ্ন অবস্থার পর অসুখ-বিসুখ-বিষয় ছাড়া তিনি অন্য কথা কিছু বলেন নি ; 'হ্যাঁ' এইজন্যে যে, এই অবস্থা-প্রাপ্তির পূর্বে "সাবিত্রী"ই ছিল তাঁর শেষ কাজ ; আর সেই শেষ কাজের শেষ উদ্ভাসিত লাইনগুলি দিয়ে আমাদের চিত্তপটে লিখে গেছেন তাঁর যোগের সারমর্ম—মা'র কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ। একবার নয়, দু'বার নয়, একই কথার বহু পুনরাবৃত্তিতে সেই লাইনগুলি ঘণ্টার শব্দের মত ঘন ঘন আমাদের কানে এসে বাজছে :

A day may come when she must stand unhelped
On a dangerous brink of the world's doom and hers
Carrying the world's future on her lonely breast,
Carrying the human hope in a heart left sole.
To conquer or fail on a last desperate verse ;

* * *

In that tremendous silence lone and lost
Of a deciding hour in the world's fate,
Alone she must conquer or alone must fall.

* * *

Cry not to heaven, for she alone can save.
She only can save herself and save the world.

এর পরে Book of Death শেষ করবার তাঁর কোন তাড়া ছিল না ; কেননা তাঁর প্রধান কাজ যখন সম্পূর্ণ হল, আর তাড়া কিসের ? তাই প্রসন্ন হাস্যে বললেন, 'We shall see about it afterwards'. বেশ ভালো করে জানতেন এ বলার অর্থ কি ; "সাবিত্রী"র সেই সারগর্ভ কথা বলার সাথে সব কথা তাঁর বলা শেষ হয়ে গেছে, তাই তিনি ডুব দিলেন গভীরে অন্য বৃহত্তর কাজে। ডাক্তার বন্ধুরা বললেন, 'এ তো Comatic Condition' ; এ সম্বন্ধে ডাঃ সান্যালের মন্তব্য উল্লেখ করি, 'ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা অন্তর যে রোগী চোখ খুলছেন, কলের

রস খাচ্ছেন, সময় জিজ্ঞেস করছেন, ডাকলে সাড়া দিচ্ছেন, তাকে বলব 'Uraemic Coma ? এত বছরের অভিজ্ঞতায় এরকম Coma তো দেখি নি কোনদিন!' এই সময়কার অবস্থা লক্ষ্য করে মা বলেছিলেন, 'যখনই আমি শ্রীঅরবিন্দের ঘরে যেতাম, দেখতে পেতাম তিনি অতিমানস আলো নামিয়ে আনছেন।' মা'র এই উক্তি হতে পরিষ্কার বুঝা যায় শ্রীঅরবিন্দের অন্তশ্চেতনায় অবস্থিতির তাৎপর্য। তাঁর দৃষ্টি এখন একাগ্রভাবে নিবদ্ধ অন্য জিনিসে, যা তাঁর শরীরের দুর্গতি-মুক্তি হতে ঢের বেশি মূল্যবান। কিন্তু সে জ্ঞান আমাদের ছিল না। আমরা ভাবতাম উল্টো যে, শরীর সারাবার কাজে তিনি ব্যস্ত। তাই যখনই বাহ্যচেতনায় ফিরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম, 'রোগ সারাবার জন্যে আপনার যোগশক্তি ব্যবহার কবেছেন তো?' কোন উত্তর মিলত না।

এখন দেখা দিল জ্বর, আরো অন্য উপসর্গ; নানাজনের মাথায় নানা চিন্তা এল, কিন্তু একটা প্রশ্ন সকলকে ব্যাকুল করে তুলল, 'রোগ এরকমভাবে বাড়ছে কেন?' ডাক্তারদের আরো ভাবনা, ওষুধ দেওয়া যাবে কি না; আর, একবার ওষুধ আরম্ভ হলে কোথায় গিয়ে থামবে চিকিৎসা? অনেকে বলবেন, 'কেন, ওষুধে কি আপত্তি?' আপত্তি এইজন্যে যে, ১৯১০ সাল থেকে—তার পূর্বের কথা জানি না,—তাঁর শরীরে কোন ডাক্তারী ওষুধ প্রবেশ করে নি। এই অনভ্যস্ত দেহে যদি তীব্র প্রতিষেধক ব্যবহার করা হয়, তার ভীষণ প্রতিক্রিয়া সম্ভব, একথা সাধারণ শিক্ষিত লোকও জানেন। তদুপরি, একাধারে তাঁর ছিল শিশুর দেহ,—কোমল, সুন্দর, স্বয়ংপ্রভ; হাত-পা নিটোল; স্পর্শ পাখির পালকের মত নরম; যাঁদের সে স্পর্শ-সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা জানেন তার স্নেহমাখা স্নিগ্ধতা। অন্যপক্ষে, মানবদেহধারী হলেও তাঁর দেহ ছিল পবিত্র সচেতন মন্দির, যার রূপ ও গঠন অতিমানস জ্যোতির-অবতরণে আস্তে-আস্তে রূপান্তর নিচ্ছে। বহুবার স্বচক্ষে দেখেছি সেই উদ্ভাসিত শরীর; টেবিলে বসে লিখছেন; অনাবৃত উদার বক্ষ; বুক-

যেন নয়, হাত যেন নয়, দীপ্ত আলোর মূর্তি, হাড়-মাংস বলে কোন স্থূল পদার্থ নেই ; স্বচ্ছ শুভ্র আলোর এপিঠ-ওপিঠ দেখা যাচ্ছে, যেন X-Ray-র ছবি। দেখেছি তাঁকে অর্ধশায়িত অবস্থায় ; সোনার শিশু, হাত দু'টি মাথার পিছনে ধরা ; নিরাভরণ দিব্য সুষমা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। চুপ করে শুয়ে আছেন, উর্ধ্বদৃষ্টি ; ঠোঁটের কোণায় আনন্দের রহস্যজনক হাসি। আমরা অবাক হয়ে বলাবলি করতাম—এ হাসির অর্থ কি ? সেই চিন্ময়রূপ স্মরণ করিয়ে দেয় একটি কবিতা :

পৃথিবীর বক্ষে ওই শিশু মাতৃহারা
একাকী নিস্তব্ধলোকে মত্ত কি খেলায় ?
দূর হতে কার মুগ্ধ জীবনের ধারা
তাহার কুঙ্কুমবর্ণ সিন্ধুমোহানায়
মিলিল আসিয়া। অলক্ত চরণ রাগে
,সুপ্তিমগ্ন বসুধার অর্থহীন ভাষা
সৃষ্টির আকাশে লিখে বন্দনা-পরাগে
আপনার সুপ্ত ইতিহাস। যে পিপাসা
এতদিন বিষকণ্ঠী মরুর প্রান্তরে
মৃতবৎসা ধেনুসম গিয়েছে শুকায়ে,
আজি কি সে নীলাক্ষের সুধার নির্ঝরে
প্রশান্তি লভিল ? নবীন বসন্ত বায়ে
কাহার চিন্ময়মূর্তি শিশুর সজ্জায়
এ বিশ্ব-তরণীখানি গোপনে চালায় ?

এ হেন দিব্য-শিশুর দেহে তীব্র ওষুধ, Injection ব্যবহার করা শুধু নিষ্ঠুরতা নয়, পাপের ভাগী হওয়া। Catheter ব্যবহারে অপরাধী হয়েছি, তাঁর কথার মূল্য দিই নি, অথচ আশানুরূপ ফল পেলাম কই ? উপায় তো নেই, আমাদের দৃষ্টি যে অতি সঙ্কীর্ণ, জ্ঞান আঁধারেরই ছায়ামাত্র। সাধারণ মানুষের ভাষা ব্যবহার করেন বলে তাদের কথার যথাযথ মূল্য দিতে পারি না, বুঝতে পারি না যে,

তাঁদের সামান্য কথারও অর্থ অসামান্য, কেননা তাঁদের জ্ঞানের উৎস আমাদের ভুলভ্রান্তিযুক্ত চিন্তারাজ্যের বহু উর্ধ্বে। আর বুঝতে পারলেও পরে আসে সন্দেহ। হলও তাই: যখন জ্বর দেখা দিল, আবার মানবীয় প্রতিকারের কথা ভাবলাম, যদিও জানতাম যে হাজার ওষুধ-পত্রে কোন ফল হবে না, যদি পিছনে না থাকে তাঁর যোগশক্তির সাহায্য। কারণ তিনি বলেছেন, It is the force that cures; medicines are only vehicles; 'রোগ সারে শক্তির গুণে, ওষুধ তার যন্ত্র মাত্র।' সমস্ত বস্তু কি ঘটনার পিছনে রয়েছে এই শক্তির লীলাখেলা ও শুভ-অশুভ শক্তির দ্বন্দ্ব। যারা এই শক্তি-সৈন্যদের ঠিক-ভাবে চালাতে পারে সজ্ঞানে কি অজ্ঞানে, যাদের যে ক্ষমতা আছে, তারাই বিশ্ব-সংগ্রামে জয়ী হয়। এই শক্তি দিয়ে যে তিনি আমাদের সাহায্য করছেন, আমরা জ্যামিতিক সত্যের মত ধরে নিয়েছি। তবুও রোগের পরিবর্তন না দেখে যখন সংশয় আসত তাঁকে বার বার জিজ্ঞাসা করতাম, 'আপনার যোগশক্তি ব্যবহার করছেন তো? রোগ যে বেড়ে যাচ্ছে!' কোন উত্তর পেতাম না। তথাপি তিনি যে রোগ-মুক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন এ সন্দেহ মনে স্থান পায় নি অথবা অন্য কোন বৃহত্তর কাজে এখন যে তিনি ব্যাপৃত রয়েছেন যার ফলাফল তাঁর শারীরিক পরিণাম হতে ঢের বেশি মূল্যবান, তাও কল্পনায় আসে নি। কাজেই যত রোগ বাড়তে লাগল, আমাদের সমস্যাও হল জটিল। প্রত্যেক গুরুতর লক্ষণ যেন আমাদের বুকে তীরের মত বিঁধতে লাগল আর বলতে লাগল, 'এখনও চুপ করে দেখছ?' অগত্যা তাঁদের জানালাম আমাদের মনের ঘোর দুশ্চিন্তা ও দ্বন্দ্ব।

অবশেষে ডিসেম্বর এল। ১লা ও ২রা স্কুলের বার্ষিকী; মস্ত আয়োজন, খেলাধূলা, ড্রামা ইত্যাদি; সবাই ব্যস্ত। শ্রীঅরবিন্দের অসুখের গুরুত্ব কেউ উপলব্ধি করতে পারে নি; স্বপ্নেও ভাবে নি কালান্তক নিয়তির সাথে আমাদের কী মর্মান্তিক নাট্যাভিনয় চলছে শ্রীঅরবিন্দের রুদ্ধ-প্রকোষ্ঠে। তাঁর অসুখের কথা বরাবরই যথাসম্ভব

গোপন রাখা হয়েছে; কিন্তু আর তা পারা গেল না; কেননা, উৎসব শেষ হবার সাথে সাথে লক্ষণগুলি ভয়ানক বেড়ে গেল, যেন এতদিনের সঞ্চিত আক্রোশ মুক্তি পেয়ে দুর্দমবেগে আক্রমণ করল তাঁর জীর্ণ দেহতট। ২রা রাত্রে যখন তাঁকে জানান হল যে, স্কুলের উৎসব সুসম্পন্ন হয়েছে, তৃপ্তির হাসি হেসে তিনি বললেন, 'Ah! it is finished? —শেষ হয়েছে?'

পুরোদস্তুর চিকিৎসা চলল, মানুষকে বাঁচাবার যত ডাক্তারীবিদ্যা আবিষ্কার হয়েছে সবই তাঁর উপর আমরা প্রয়োগ করলাম, কিন্তু সবই বৃথা। নিজের ও পরের অদৃষ্ট যিনি ভাঙেন-গড়েন নিজের হাতে, সেই হাতের আঙুলগুলি বজ্রমুষ্টিতে বন্ধ করে রাখলে মানুষের কি ক্ষমতা তাঁকে সে অদৃষ্টলিপি সংশোধনে প্রবৃত্ত করা? একটা কথা বলে রাখা দরকার—আমরা প্রত্যেক পদে, জটিল গ্রন্থিতে, বিভিন্ন অবস্থায় অর্থ তাঁদের জানিয়েছি এবং প্রত্যেক ক্রিয়ায় তাঁদের সম্মতি নিয়েছি, সাহায্য চেয়েছি; কোথাও কোন গোপনতার আশ্রয় নিই নি, চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ আচরণ করি নি। আমাদের চেতনা যেখানে নিদারুণ সত্যে সঙ্কুচিত হয়, তাঁদের চেতনা উজ্জ্বল শিখার মত পায় দূরদৃষ্টি, করে সম্প্রসারণ।

তাঁর রোগের ইতিহাস অনুধাবন করলে একটা জিনিস চোখে পড়ে। "সাবিত্রী"র কাজ, দর্শন ও উৎসব এই তিনটি ঘটনার ব্যাধির শেষ তিনটি নিম্নমুখী স্তরের সাথে নিকট সম্বন্ধ। শেষ স্তরে এসে পৃথিবীর প্রয়োজনের সাথে তাঁর মরদেহের যে যোগসূত্র অবশিষ্ট ছিল, তা ছিন্ন করে দিয়ে তিনি ডুব দিলেন গভীরে, শরীরের বিকল-যন্ত্রের প্রতি তিলমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে।

৪ঠা তারিখে সন্ধ্যাবেলা। অবিস্মরণীয় দিন, সোনার অক্ষরে লেখা আমাদের মর্মে হঠাৎ তিনি সম্পূর্ণ বহিশ্চেতনায় ফিরে এলেন; কারও কোনও আপত্তি না শুনে বিছানায়, পরে চেয়ারে ঘণ্টাখানেক বসলেন। আশ্চর্যের বিষয়, রোগের সমস্ত কষ্ট-লক্ষণ কোন্ যাদুস্পর্শে অদৃশ্য হয়ে

গেছে! বহুদিন পরে, অতি যত্নে গরম জল দিয়ে সমস্ত শরীর মুছে দিলাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বেশে, বিন্যস্ত কেশে যখন আবার তাঁকে চেয়ারে বসতে দেখলাম, তখন আনন্দের সীমা রইল না। জীবনে এ আনন্দের আস্বাদ কমই পেয়েছি। বিশ্বাস ও আশা—'the gleaming shoulder of some godlike hope' যা আমাদের দুর্বল মুহূর্তে বল দিয়েছে, সমস্ত দুশ্চিন্তার বোঝা বহন করেছে, এখন তার উপলব্ধিতে আত্মহারা হলাম। সেই শান্ত সমাহিত ছবি ভুলবার নয়। এই সুবর্ণ-সুযোগে তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'are you not using your spiritual force?' 'No!' সংক্ষেপে উত্তর দিলেন। বিশ্বাস করতে পারলাম না নিজের কানকে। সাহস সঞ্চয় করে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'No?—তাহলে এই দুরন্ত ব্যাধি কি করে সারবে?' উত্তরে দুটো কথা, 'can't explain; you won't understand.'

কোন্ আঁধারের গভীর গর্ভে ফেলে দিল এই দুটো রহস্যজনক কথা! কোথায় মিলিয়ে গেল পূর্বেকার নির্ভরতা ও দীপ্যমান আশা! শুধু কি তাই? এক নিমেষে ফুটে উঠল প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত রোগের ক্রমবর্ধমান অবস্থার ছবি, যার পরিণতি এই ভয়াবহ সীমায় এসে উপস্থিত। এই জন্যেই কি বার বার জিজ্ঞাসা করেও উত্তর পাই নি এই প্রশ্নের? তবে কি শেষ সমাধানও—চিন্তার ধারা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল, 'না, না, কিছুতেই নয়; দেখছ না সম্মুখে শান্ত জলধি? ভুলে গেলাম অন্তর্দোলা; বাহ্যিক পরিবর্তন ছবি দেখে আশায় সঞ্জীবিত হলাম। দরকার নেই বুঝবার। কথার অর্থ হতে প্রত্যক্ষ ছবি আমাদের পক্ষে ঢের বেশি মূল্যবান। কিন্তু প্রত্যক্ষ ছবি যে নির্বাণোন্মুখ শিখার ক্ষণস্থায়ী দীপ্তি তা বুঝতে পারলাম সূর্য যখন এই পৃথিবীর অস্তপারে; বুঝতে পারলাম, সেই সময়ে তিনি সমস্ত বাহ্য ক্রিয়া-কর্ম সেরে পবিত্রদেহে প্রস্তুত হয়েছিলেন দেহরক্ষা করতে।

একঘণ্টা পরে বিছানায় যখন ফিরে এলেন, দ্বিগুণ জোরে দেখা দিল সমস্ত পূর্বলক্ষণ; আর তিনিও শেষ নিমগ্ন হলেন অতলে। আস্তে আস্তে অবস্থা খারাপ হতে হতে সেই নিদারুণ ১-২৫ মিনিট উপস্থিত হল নিয়তির বিধান নিয়ে। তার আধঘণ্টা আগেও যখন জল চেয়ে খেলেন, সবাইকে দৃষ্টিবিনিময়ে শেষ আশীর্বাদ দিলেন তখনও ভাবতে পারি নি,

This is the day when Satyavan must die.

* * *

খবর ছড়িয়ে পড়ল প্রত্যূষে; বিশ্বাস করতে পারল না কেউ, কোন অশুভ ছায়া-মূর্তি এই মিথ্যা দুয়ারে-দুয়ারে ঘোষণা করে যাচ্ছে? যখন আর অবিশ্বাসের অবকাশ রইল না, শিষ্যগণ একে একে এল মহা-তমিস্রার আবরণ ভেদ করে—'ধমনী-শোণিতে যেন স্তম্ভিত বিষাদ!' কি স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে যখন উঠে এল, দেখল তারা জীবনে যা কেউ কখনও দেখে নি। দেখল অনন্তশয়নে শায়িত যোগেশ্বর, প্রত্যেক অঙ্গ সুবর্ণ-আলোয় উদ্ভাসিত, শক্তির স্ফুরণে উচ্ছ্বসিত, সৌন্দর্যের অবতরণে আনন্দিত। মৃত্যু কোথায়? এ যে মৃত্যুর অমরতায় প্রথম দীক্ষা! নির্বাণের লয় নয়, resurrection-এর পুনরভিনয় নয়, পরম-সত্যের আবির্ভাবে দেহবস্তুর স্পর্শমণিতে রূপান্তরের সামান্য নিদর্শন। মানবের ভবিষ্যৎ দেহছবির আভাস দিয়ে গেলেন তাঁর দেহে, এই বিরাট অতিমানস জ্যোতির অবতরণে। জীবনে যা পারা সম্ভব হয় নি, মৃত্যুতে তার সম্ভাবনা রেখে গেলেন আমাদের স্মৃতির ইতিহাসে। এই স্বর্ণময় কোষ, এ যেন আর দেহ নয়, হিরণ্ময় পাত্র, যা সেই পরম-সত্যকে একদিকে রেখেছে ঢেকে, অন্যদিকে দিয়েছে খুলে। সেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গিত কক্ষে দর্শকমণ্ডলী অবাক-বিস্ময়ে নতশিরে জানাল তাদের প্রণতি, হৃদয়ভরা কৃতজ্ঞতা, আর নিয়ে গেল পরমবস্তুর পাদস্পর্শ। যাদের অন্তরদৃষ্টি আছে তারা পেয়েছে সেই সত্যের উপলব্ধি, যাদের শ্রুতি আছে তারা গভীর

গুহাভ্যন্তরে শুনেছে তাঁর বাণী প্রতিধ্বনিত হয়ে বলেছে—'I am here, I am here—এই যে আমি, এই যে আমি।'

সেই জাগ্রত চৈতন্যে চলেছি আমরা গুরুর নির্দেশিত লক্ষ্যে, সমুখে জননী জগদ্ধাত্রী আমাদের দিশারী। সেই লক্ষ্য-সাধনে, দেহাবস্থার যেমন শেষ নিঃশ্বাসটুকু পৃথিবীর বক্ষে তিনি ঢেলে দিয়েছেন, বিদেহে দিলেন অমোঘ প্রতিশ্রুতি তার পূর্ণ-প্রকাশে। তাঁর বিরাট তপঃশক্তি আর অতিমানস আলোর ঐশ্বর্যে সহজ অধিকারী হয়ে মা নিয়ে চলেছেন আমাদের সেই লক্ষ্যে দীর্ঘ রাত্রির বর্ম ভেদ করে। ক্লান্তি নেই, হতাশা নেই, নেই পরাজয়ের আশঙ্কা ; বিরাট শক্তির কর্মক্ষেত্র তাঁর এই পবিত্র শুভ্র দেহ-মন-প্রাণ।

A body like a para ble of dawn,
Her mind, a sea of white sincerity.

গুরুর মন্ত্রে পূর্ণ আত্মসমর্পণে, তাঁরই কাজে সর্বস্ব আত্মত্যাগে প্রতি মুহূর্তে দিচ্ছেন আমাদের সেই রূপ ঃ তাঁর নিজের দিব্যবিভূতির অনলে মূর্ত করে তুলছেন গুরুর স্বপ্ন, মানবজাতির ভবিষ্যৎ ছবি।

In her he met his own eternity.

আমাদের আর ভয় কোথায়? দুঃখ কোথায়? যাঁরা সম্প্রতি আশ্রম পরিদর্শন করে গেছেন, তাঁরাই দেখে গেছেন, আমাদের অন্তরের জাজ্বল্যমান শিখা, দৃঢ় প্রত্যয়। শ্রীঅরবিন্দের সমাধিবক্ষ বিদীর্ণ করে আগুনের সহস্র জিহ্বা উঠছে, চতুর্দিকে পড়ছে ছড়িয়ে আশ্রমকে আবৃত করে, প্রত্যেক সাধকের হৃদয়ে জ্বলছে অনির্বাণ ঊর্ধ্বমুখী আহ্বানে। আর মা'র অন্তর-বাহির ঘিরে, চেতনায় প্রদীপ্ত হয়ে, দেহে এক হয়ে রয়েছে তার বিদেহ। শুনতে পাই আমরা তাঁর সদাজাগ্রত নিঃশব্দ পদসঞ্চার এই মাটিতে, দেখতে পাই তাঁর উজ্জ্বল স্মুবর্ণদেহ, শুনতে পাই তাঁর মৃদু-গম্ভীর ভাষা। একদিন তাঁর এই ইতিহাসাতীত আত্মত্যাগের ফল ফলবে, তাঁর কাব্য-কাহিনী সত্য হবে। "সাবিত্রী" তো তাঁদেরই জীবনবেদ। যা পেয়েছি সেই কাব্যে

তারই অভিনয় দেখলাম পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে। সেই লীলার প্রথম পর্বে পড়েছে যবনিকা, অন্তরালে চলেছে বাকি পর্বের উদ্ঘাটন। আবরণ যখন উঠবে তখন বুঝতে পারব তাঁর জীবনের অন্যান্য রহস্য-জনক বিলুপ্তির মত এই অন্তর্ধানও সাময়িক; মহাকালের দুর্গ প্রবেশের একমাত্র পথ। দুর্গে চলেছে এখন তেমনি প্রচণ্ড-যুদ্ধ শেষ অরাতির সাথে। যুদ্ধ তো থামে নি, রণক্ষেত্র পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। সেজন্য Book of Death রেখে গেলেন অসমাপ্ত। শেষ যুদ্ধ জয়ে আমাদের কানে আবার মহা নির্ঘোষে আবৃত্ত হবে সেই Book of Death আর পৃথিবীময় বেজে উঠবে তাঁর অতিমানস-দেহ-নিঃসৃত উদাত্ত বাণী: 'I am here, I am here!'

২৪শে এপ্রিল

সুধা বসু

১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল, আজ থেকে ৫০ বছর আগে শ্রীমা এসে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যোগ দিলেন, পণ্ডিচেরীতে স্থায়ীভাবে এসে থাকার জন্য আসন গ্রহণ করলেন। এই দিনটি সেই কারণেই আমাদের কাছে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীঅরবিন্দের তপস্যার মূর্তিমতী অমৃতস্বফলরূপিণী তাঁর স্বীয় শক্তি মাতৃরূপে আমাদের এই দেহপ্রাণমনের ত্রিপুটিতে বাস্তব জগতে মানুষী তনুতে আবির্ভূতা ও প্রতিষ্ঠিতা হলেন। শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় ভাবের আকাশে যে মহাশক্তি বিদ্যুতের বিদ্যোতনে অন্তরীক্ষে থম্‌-থম্‌ করছিল, সেই অপরূপ মহাভাব স্থিরা সৌদামিনী রূপে প্রকটিত হল পৃথিবীর বুকে। যে গঙ্গাবতরণের উন্মুখ প্রতীক্ষায় পৃথিবী নিঝুম হয়ে স্তব্ধ ধ্যানচেতনায় লীন হয়েছিল, সেই অক্ষীয়মান উৎস আকাশ গঙ্গার পূতপাবনী শতধারায় সারা বিশ্বে ঝরে ঝরে যেন উপচে পড়তে থাকে। সেই মহাশক্তির অবতরণের শক্তিপীঠ রূপেই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হল পণ্ডিচেরীতে। শক্তিকে আসন দিয়ে কার্যকরী করতে হলে একটি কেন্দ্রে তাকে সংহত করতে হয়। কিন্তু সে শক্তি তো আর কেন্দ্রেই আবদ্ধ থাকে না। আকাশবিহারী সূর্যের মত তার শক্তি দিকে দিকে যেমন বিচ্ছুরিত হতে থাকে, পৃথিবীতে তাপরূপে সঞ্চিত হয়ে সেই শক্তিই হয় অগ্নি—জীবন-যজ্ঞের পুরোধা একদা বীজরূপে যে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের আগমনে অল্পসংখ্যক কর্মী ও সাধকদের নিয়ে, আজ তা অহস্রশাখা বনস্পতিরূপে তার অনন্তবাহু বিস্তার করেছে। অসংখ্য বীজ শক্তিতে তার সাবিত্রশক্তি প্রচোদিত হয়ে চলেছে। এই শক্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল আশ্রমে মায়ের আগমনে। এখানে আমাদের এই ক্ষুদ্র কেন্দ্রে আমরা সেই যজ্ঞবেদী থেকে

হোমাগ্নি বহন করে এনেই জ্বালিয়েছি: সেই অগ্নি রক্ষা করে আমাদের এই জয়ন্তী উৎসব প্রতি বৎসরে আয়োজিত হয়ে থাকে। শুধু একটিমাত্র কেন্দ্রেই নয়, এই রকম অনেকগুলি কেন্দ্রেই সেই হোমাগ্নি রক্ষা করে যজ্ঞবেদী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে এই পূত অগ্নি রক্ষা করার যে মহান দায় আমরা লাভ করেছি, আজকের পুণ্যদিনে সেই ব্রত সেই সঙ্কল্প আবাব নতুন করে আমাদের দেহে প্রাণে মনে সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে। তার জন্য সেই পরমা শক্তিকেই আবার নতুন করে আরাধনা করার জন্য আমাদের পূজার বোধন শুরু করেছি।

"আবিরাবীর্ম এধি"—হে স্বপ্রকাশ! তুমি আমাতে আবির্ভূত হও, প্রকটিত হও। এই স্বপ্রকাশ অন্তর্যামীরূপে আমাদের হৃদয়ে গূঢ় থেকেও অপ্রকট হয়ে আছেন আমাদের কাছে। তাঁকেই তো প্রকাশ করতে হবে। ঊর্ধ্বতম সত্যকে আমাদের জানতে হবে, ধ্যানযোগে সেই পরম সত্যের সঙ্গে আমরা এক রস হয়ে গভীরে মিলিত হয়ে তবে তাকে জানতে পারব এই হল আমাদেব সত্তাব আসল লক্ষ্য। আর আমরা যা হয়ে আছি সেখানে সর্বত্র সর্বভাবে সব অভিজ্ঞতায়, জ্ঞানে ও কর্মে সমভাবে সেই পরমসত্যকেই প্রকাশ করতে হবে এই হল আমাদের জীবনের আসল দায়িত্ব। এখন এই কথাটাই আমাদের ভাল করে বুঝে দেখতে হবে, ধ্যানযোগে জানতে হবে।

মা ও শ্রীঅরবিন্দের চেতনা যে এক, একথা আমরা অনেকবার শুনেছি। এ সম্বন্ধে মা নিজে একবার বলেছিলেন, 'Without him, I exist not; without me, he is unmanifest'—শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া মায়ের কোন অস্তিত্বই নেই। পরমপুরুষের স্বীয়া শক্তিই আমাদের মাতৃশক্তি। শ্রুতি বলেছেন হিরণ্যরক্ষা অদিতিরূপে যিনি দ্যুলোকে পরমব্যোমে অধিষ্ঠিতা, তিনিই তো জননী জীবধাত্রী এই পৃথিবী হয়ে নেমে এসেছেন। সেই শক্তি ছাড়া পরমেশ্বরের প্রকাশ

হয় না। পরম পুরুষের অস্তিতা ভাতিতা প্রেয়তা তাঁতেই সম্ভাবিত। মা তাই বললেন তিনি না থাকলে শ্রীঅরবিন্দ অপ্রকাশিত থেকে যাবেন। সেই পরমা প্রকাশের আবেশে আমাদের সবাইকার দেহমনপ্রাণের ত্রিপুটিতে জীবভূতা সনাতনী পরমাশক্তি চৈত্যপুরুষ উন্মেষিত হয়ে এই পার্থিব আধারেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক, আজকের দিনে এই প্রার্থনা আমাদের জানাতে হবে তাঁর চরণেই। কেননা মহাপ্রকৃতিই তো আমাদের মধ্যে যোগসাধনা করে চলেছেন। তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারাই তো আমাদের সাধনা। কিন্তু আমরা কি সেই মহাশক্তির সন্তান বলে পরিচয় দেবার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছি? কি রকম করে সে শক্তিকে লাভ করে জীবনে তাকে কার্যকরী করে তুলতে হবে, সে শিক্ষায় এখনও আমরা সুশিক্ষিত হতে পারিনি। মহাপুরুষদের যুগ যুগ সঞ্চিত তপস্যার শক্তিতে আজ সে শক্তি আমাদের ঘিরে রয়েছে, প্রতিটি আধারে সে শক্তি প্রকাশিত হতে, অবতরণ করতে উদ্যত। কেমন করে তাকে বরণ করে সার্থক করে তুলব?

ভারতবর্ষ শক্তিকে যে স্বীকৃতি দিয়েছে, সারা পৃথিবীতে আব কোথাও তা সম্ভব হয়নি। শক্তি সাধনা ভারতের তথা বাংলাদেশের সনাতন ধর্ম। এই শক্তি পূজাই আমাদের জাতীয়তা, জাতীয় ভাব, জাতীয় উৎসব। কিন্তু আজ বাইরের দিকে চোখ মেলে দেখছি আমরা এখনও অক্ষম শক্তিহীন হয়ে পড়ে আছি। বীর্যহীন ক্লীবত্ব আমাদের রন্ধ্রগত শনি হয়ে আটকে রয়েছে। এ কি করে সম্ভব হল? মহাশক্তির অবতরণেও আমরা শক্তিহীন? এই বাংলাদেশের অগ্নিযুগের কথা মনে পড়ে। শ্রীঅরবিন্দের কর্মক্ষেত্র এই বাংলায় সেদিন কি বিরাট শক্তিই না কার্যকরী হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টির নেতৃত্বে। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র অসাধ্যসাধনের বীর্য দিয়ে সে যুগের তরুণদের শক্তি সঞ্চার করে উদ্দীপ্ত করে দিল এমন করে যে, তারা হাসিমুখে অনায়াসে মৃত্যুজয়ের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিল;

এই দেশের ক্লীবত্বের মূলে মোহমুদ্গরের আঘাত হেনেছিল। দলে দলে বীর যোদ্ধা সব ঘরে ঘরে তৈরী হতে পেরেছিল। এই প্রসঙ্গে সে যুগের মহীয়সী নারী নিবেদিতাকে স্মরণ করি। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা শক্তিময়ী হয়ে দেশের বিপ্লবকে সার্থক করে-ছিলেন। ধর্মযুদ্ধে যোদ্ধাদের হৃদয়ে তিনি প্রেরণা দিয়েছেন, শক্তির যোগান দিয়েছেন। 'আনন্দ মঠে'র পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে মায়ের সন্তানদের ধর্মযুদ্ধের সৈনিকরূপে দেখিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের কর্মযোগের আদর্শকে তা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি তো দেশ উদ্ধারের কাজে নেমেছিলেন, স্বদেশ তাঁর কাছে শুধু মাটির ছিল না, 'মা'টি হয়ে দেখা দিয়েছিল। গর্ভধারিণী জননী, দেশ-জননী ও আদ্যাশক্তি মহামায়া যিনি পরমা শক্তি এ তিনকেই তিনি এক করে পেয়েছিলেন ; তিনিই মা। সেই মায়ের সন্তান আমরা এই হল সর্বমানবের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। আমাদের সেই সন্তানধর্ম পালন করতে হবে। মায়ের হাতের অসিই হই আর বাঁশী হই, তিনি যেমন করে কাটেন কাটব, যেমন করে বাজান বাজব। মায়ের বীর সন্তান হতে হবে, সৈনিক হতে হবে, তার চেয়ে বড় পরিচয়ও কিছু নেই, গৌরবেরও আর কিছু থাকতে পারে না।

তাই আমাদের যেমন অন্তরের গভীরে ধ্যানে তলিয়ে গিয়ে সর্বোচ্চ উপলব্ধিতে পৌঁছতে হবে, আবার সেই পরমা সিদ্ধিকে এইখানে, এই জগতে, এই দেশে নামিয়ে দিতে হবে, প্রকাশ করতে হবে। দেহ প্রাণ মন নিয়ে এই যে আমাদের সাধারণ জীবন যা বার বার আলোর সাড়া পেয়েও ধরে রাখতে পারে না, কেবলই কুঁকড়ে যায় আর শামুকের খোলে নিজেকে আটকে রাখতে চায়, সেই দেয়াল সেই আড়াল ভেঙে নিজেকে মায়ের দৃষ্টির নিম্নে উন্মুক্ত প্রসারিত করে দিতে হবে।

আমরা পরম ভরসা পেয়ে গেছি, মায়ের শক্তিই আমাদের নিয়ে সাধনা করছেন এবং শেষ পর্যন্ত করবেনও। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব

রয়েছে সেই শক্তিকে অন্তরে আসন দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে তাকে কার্যকরী করতে হবে, তাঁরই শরণাগত হয়ে তাকে ধরে থাকতে হবে সর্বশক্তি দিয়ে প্রাণ দিয়ে হৃদয় দিয়ে। তাঁর সেই সোনার চিন্ময় আলো এসে আমাদের এই জড়ীয় লোহার শেকলের ওপর আলো ফেলে এই লোহাকে সোনা করে নেবে। চিন্ময়ী মহাশক্তি আর এই মাটির জীবন আমাদের এই দুয়ের মাঝে সেতু হয়ে যে মাতৃশক্তির আবির্ভাব হবে তিনিই দায়িত্ব নিয়েছেন এই দুরূহ ব্রত সম্পন্ন করার, এই রূপান্তর যোগের, যাতে প্রতিটি জীব প্রতিটি মানব তার নিজের পথে সেই সিদ্ধিলাভ করতে পারে। বাধা অনেক তাও জানি, সময় লাগছে, লাগবে অনেক তাও মানি, কিন্তু এক নিমেষের জন্যও যেন আমরা ভুলে না যাই যে আমরা এই মহামহিমময়ী মায়েরই সন্তান। আমরা দুর্গাপূজা করে থাকি, শক্তিকে আহ্বান করে এনে প্রতিষ্ঠা করি, পূজা করে আবার বিসর্জন দিয়ে দিই। এই মাটির বুকে তাকে চিরকালের জন্য রাখতে ভরসা পাই না। তাই যুগ যুগ ধরে নবীন উষার আবির্ভাবে যে শক্তি সঞ্চারিত হয়, প্রদীপ্ত হয় উজ্জ্বল ভাস্বররূপে মধ্যগগনে, বিরাজিত হয়েও সন্ধ্যায় আবার সে শক্তি সে আলো কমতে কমতে পরম অব্যক্তে মায়ের কোলেই আবার ঢলে পড়ে—এই দেখা যায়। কিন্তু এও আমরা জানি যে ঐ যে সৌরকিরণ তাই তো আঁধারের বুকে অগ্নি হয়ে জ্বলবে। তা তো হারিয়ে যায় না। শত সহস্র অগণিত দীপ হয়ে রাতের আকাশে তারা হয়ে ফুটে উঠবে। সেই সঞ্চিত তপস্যার অগ্নিতে রয়েছে আমার উত্তরাধিকার, আমরা সেই বীর্যে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে আজকের দিনে সকলে মিলিত হয়ে সমান হৃদয়ে সমান আকুতি নিয়ে যেন এই সঙ্কল্প নিতে পারি—'মাগো! তোমাকে পাইলে আর বিসর্জন করিব না। শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া রাখিব, এস মাতঃ, আমাদের মনে প্রাণে শরীরে প্রকাশ হও।'

সংবৎসর কাল পরে আবার যখন আজকের দিনে আমরা সকলে

মায়ের সন্তানগণ ধ্যানচিত্ত নিয়ে প্রশান্ত হৃদয়ে উৎসবের আয়োজন করব তখন যেন সত্য করে আবার বলতে পারি—'বীরমার্গ প্রদর্শিনী এস! আর বিসর্জন করিব না। আমাদের অখিল জীবন অনবচ্ছিন্ন দুর্গাপূজা। আমাদের সকল কার্য অবিরত পবিত্র প্রেমময় শক্তিময় মাতৃ সেবাব্রত হউক। এই প্রার্থনা, মাতঃ প্রকাশ হও।'

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে প্রদত্ত ভাষণ

৯৫০ সালের ২৯শে নভেম্বরের এক সন্ধ্যা—সমস্ত দিনের কর্মভার অবসানের পর বিশ্রাম করছি। আমার আরদালী এসে আমার হাতে একটি টেলিগ্রাম দিল। তাতে লেখা—'বিমানে চলে এস—জরুরী —মা।' ঐ সংক্ষিপ্ত শব্দ ক'টি কি অর্থ বহন করছিল কোনমতেই আমি তা আন্দাজ করতে পারিনি।

হঠাৎ আমার মনে তখনই বিদ্যুৎ খেলে গেল, শ্রীঅরবিন্দ কি অসুস্থ? তা না হলে শ্রীমা কেন আমাকে এই রকম টেলিগ্রাম পাঠাবেন? অন্য ভাবনাও মনে এসেছিল, কিন্তু আমি স্থির করতে পারলাম না এই কাজে আমি নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে পারি কিভাবে?

পরদিন ৩০শে নভেম্বর প্রাতঃকাল। আকাশপথে মাদ্রাজ এসে পৌঁছলাম। পৌঁছলাম বটে কিন্তু খবর নিয়ে জানলাম পণ্ডিচেরী যাবার ট্রেন সেই ৯টা ৫০ মিনিটে। তার অর্থ পরদিন সকাল ৭টার পূর্বে আমি পণ্ডিচেরী পৌঁছতে পারব না। এক হাজার মাইল পাঁচ ঘণ্টায় উড়ে এসে এখন একশো মাইল যেতে আমার কুড়ি ঘণ্টা লাগবে ভাবতেও মনে এক দংশন অনুভব করলাম। টেলিগ্রামটা পড়লাম আর-একবার, না, আমি সময় নষ্ট করতে পারব না, সুতরাং তৎক্ষণাৎ একটি মোটর গাড়ি ভাড়া করে ফেললাম।

পুলিশের অনুমতি আদায় করতে লেগেছিল একটি ঘণ্টা। আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করে তারা বুঝবার চেষ্টা করছিল আমি কোন চোরাকারবারী কিনা অথবা পাঁড় মাতাল ফরাসী-ভারতে স্ফূর্তি করতে বেরিয়েছি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমাকে তারা ছেড়ে দেওয়াই সাব্যস্ত করেছিল। মোটরচালক তার অতিরিক্ত পাওনা সম্বন্ধে

নিশ্চিন্ত হয়েই—সাদা কথায় বলা যায়—কেবলমাত্র বার দুই অপটু এবং হুটমেজাজী শুল্ক বিভাগের কর্মচারীদের হাতে তার গতি ব্যাহত হবার পর পণ্ডিচেরীর পথ বেয়ে যেন উড়ে চলে এসে একেবারে পৌঁছে দিল আমাকে আশ্রমের 'প্লে-গ্রাউণ্ডে'। শ্রীমায়ের চরণে যখন এসে পড়লাম তখন সন্ধ্যা ছ'টা। শ্রীমা তাঁর চিরন্তন সেই দিব্য হাসি ছড়িয়ে আমাকে আহ্বান করে বললেন, ঐ সন্ধ্যাতেই তিনি আমার আগমন প্রত্যাশা করছিলেন। পরক্ষণে শ্রীঅরবিন্দের পীড়ার বিবরণ দিয়ে বললেন তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্যে। আর জানালেন খেলার মাঠের কর্মসূচী শেষ করেই তিনি যাবেন তাঁর কাছে।

পথে আশ্রমে ডাঃ নীরদ এবং আমার নবীন সহযোগী ডাঃ সত্য সেন গুরুদেবের পীড়ার বিবরণ দিয়ে তাঁর বর্তমান অবস্থা আমাকে জ্ঞাপন করলেন। শান্ত অথচ দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে প্রবেশ করলাম শ্রীঅরবিন্দের ঘরে। স্থিরভাবে রইলাম তাকিয়ে গুরুদেবের দিকে—আমার স্বর্গলোকের রোগী বিছানার উপর অর্ধ-শায়িত প্রচ্ছন্ন এক উদাসীন মূর্তি ধরে। নেত্রযুগল মুদ্রিত—সে যেন মহান এক স্তব্ধ শান্তির মর্মর মূর্তি।

আমি বিছানার কাছে এগিয়ে জানু পেতে বসে তাঁর পায়ে প্রণাম নিবেদন করলাম। চম্পকলাল তাঁকে খুব মৃদুকণ্ঠে ডাক দিয়ে বললেন, 'তাকিয়ে দেখুন গুরুদেব, কে এসেছেন।' শ্রীঅরবিন্দের মুখখানা নড়ে উঠল। ভারী চক্ষুপল্লব উন্মীলিত হল একটুখানি, পরক্ষণেই আবার স্থির, শান্ত। কিন্তু চম্পকলাল আবারও ডাকলেন, 'গুরুদেব, দেখুন, ডাঃ সান্যাল এসেছেন।' এইবার তিনি তাকালেন পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে। তাঁর হাসি সমস্ত মুখের উপর পড়ল ছড়িয়ে। আহা! সে কি অপূর্ব হাসি, প্রশান্ত সৌন্দর্য-মণ্ডিত—সেই দিব্য হাসি যে কোন মানুষকে উত্তরণ করাতে পারে আনন্দসাগরে, অন্তরের নিভৃত কন্দর আলোকিত করে।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর হাতখানি আমার মাথায় রাখলেন, আমার সর্বাঙ্গে তাঁর স্নেহের স্পর্শ লাগল। মুহূর্তে সমস্ত চিন্তা দূর হয়ে আমাব কলরব-মুখর হৃদয় যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। আমার চিত্ত সংহত হল এক সুমহান শান্তি এবং স্থৈর্যে। শ্রীঅরবিন্দের চক্ষু মুদ্রিত—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঞ্চালন ছাড়া সবই স্থির—সে এক যেন বিশাল প্রমূর্ত নীরবতা। চম্পকলালের খুশিভাব তখন আর ধরে না, চুপি চুপি আমাকে বললেন, 'দর্শন, হাসি, আশীর্বাদ, গুরুদেব তোমাকেই প্রদান করলেন।' এই আশীর্বাদ এমন যে কোন ভাষাই তাকে বর্ণনা করতে পারে না। যে দেখেছে এবং জেনেছে হৃদয় দিয়ে কেবল সেই তা উপলব্ধি করতে পারে, কারণ এ যে আত্মার অভিজ্ঞতা।

আমি ডাক্তারী বিদ্যা প্রয়োগের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি তাঁর অসুবিধা এবং কোন উপশম করতে পারি কিনা আমি। আমার রোগী যে নরদেহে স্বয়ং ভগবান, সাময়িক-ভাবে তা ভুলে গিয়ে আমি তাঁকে পেশাদারী ডাক্তারী প্রশ্ন করতে থাকি। তিনি উত্তর দিলেন সংহত কণ্ঠে, 'কষ্ট? আমার কোন কষ্ট নেই। আর দুর্ভোগ? তা অতিক্রম করা যায়।' আমি মূত্র সম্পর্কিত অবরোধের উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তাই—কিছু অসুবিধা হয়েছিল কিন্তু তা চলে গিয়েছে—এখন কিছু টের পাচ্ছি না।' পুনর্বার নীরবতায় নিমজ্জন।

পাশের ঘরে এসে আমি নীরদ ও সত্যর সঙ্গে পরামর্শ করি। প্রস্রাবের রিপোর্টে শ্বেত পদার্থ এবং শর্করার ভাগ (Albumin and Sugar) অল্প বলেই উল্লেখ ছিল। sp. gr. যা থাকা উচিত তার একটু উপরে। শ্রীমা এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের ঘরে প্রবেশ করে বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে শ্রীঅরবিন্দকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। একটু পরে তিনি আমাকে ডেকে পাশের আর-একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি শ্রীঅরবিন্দের অবস্থা বুঝিয়ে বললাম যে তাঁর মূত্রগ্রন্থি সামান্য

দূষিত হওয়ার দরুন তিনি ভুগছেন। তবে রিপোর্ট বিচার করলে সে রকম সাংঘাতিক কিছু নয়।

আমাদের সকলের মনে এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা—ভগবানের ইচ্ছায়, মূত্রপ্রবাহ যদি অব্যাহত থাকে তা হলেই যথেষ্ট, কারণ antibiotics বাকি উপসর্গগুলিকে আরোগ্যের দিকে এগিয়ে দেবে।

পরদিন প্রাতঃকাল—১লা ডিসেম্বর। দিনটি আমাদের কাছে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক হয়ে দেখা দিল; আমাদের গুরুদেব সম্পূর্ণ সচেতন, সাড়া দিচ্ছেন এবং তাঁর শরীরের তাপ স্বাভাবিক। গরম জল দিয়ে তাঁকে মুছিয়ে দেবার পর তিনি তাঁর প্রাত্যহিক প্রাতঃরাশ গ্রহণ করলেন, এমন কি আমাদের সঙ্গে হাস্যপরিহাসও বাদ গেল না। আমি তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি ওতে আরাম পাচ্ছেন কিনা।

তিনি বললেন, 'আমি জানতাম তুমি ডাক্তারী বিদ্যা বৃত্তির জন্য বিলাত গিয়েছিলে—কিন্তু কোথা থেকে তুমি Massaging বিদ্যা শিখলে?'

তাঁর রক্ত নিয়ে আমরা বিস্তারিত ডাক্তারী পরীক্ষা করতে চাই তাঁকে এ কথা জানাতেই তিনি হেসে তির্যক সুরে বললেন, 'তোমরা কেবল ব্যাধি আর ওষুধের কথাই চিন্তা কর, কিন্তু তাদের বাইরে এবং উপরে রয়েছে প্রচুর ফলপ্রসূ বিদ্যা। আমার কিছুই প্রয়োজন নেই।'

তাঁর এই অভাবনীয় উন্নতিতে আমাদের সকলের মনে আনন্দের সীমা নেই। এইভাবে সেই দিনটি কেটে গেল।

পরদিন ২রা ডিসেম্বর অপরাহ্ণের দিকে দেহের তাপ বেশী হল এক ডিগ্রী, অন্য কোন পরিবর্তনও খুব কম। প্লে-গ্রাউণ্ডে বার্ষিক ক্রীড়া প্রদর্শনীর দ্বিতীয় দিন. শ্রীমা অত্যন্ত ব্যস্ত, খেলা সাঙ্গ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ ছেড়ে একেবারে গুরুদেবের ঘরে এসে উপস্থিত। দাঁড়ালেন তাঁর শয্যার পাশে, মুখ গম্ভীর, একটি কথা নেই। আমি বললাম মাকে, নির্গমন অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও যখন

মূত্রাশয়ের বিষক্রিয়া বেড়েই চলেছে তখন আমরা তাঁর দেহে রোগ-বিনাশক জীবাণুর অনুপ্রবেশ করান (Antibiotics and Infusion Therapy) বিবেচনা করতে পারি। শ্রীমা আমাকে সাবধান করে দিলেন, বললেন, শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে প্রাচীন গতানুগতিক চিকিৎসা পদ্ধতি উপযুক্ত নয়—তিনি তা পছন্দই করবেন না এবং জিনিসটি অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে তাঁর পক্ষে। তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন আমাকে যে আমার রোগী স্বয়ং ভগবান। যা তাঁর দরকার তিনি নিজেই করে নেবেন। আমি তো কেবল বাইরের লক্ষণ দেখে তাদের উপশমের জন্য গতানুগতিক চিকিৎসাই করতে পারি।

আমরা ডাক্তারবৃন্দ হতভম্ব হয়ে পড়লাম। সত্যি তো, আমাদের রোগী যে অবতার। তিনি আশ্রমে সাধকদের অনেক ব্যাধি নিরাময় করেছেন এবং অনেক সময়ে নিজেরও—এবার কি তবে তিনি নিজেকে রোগমুক্ত করবেন না? মনে জেগে উঠল এই প্রশ্ন।

কোন এক সুযোগে অনুনয় করে জিজ্ঞাসা করলেন চম্পকলাল, 'প্রভু, কেন আপনি আপনার ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন না, কেন নিজেকে রোগমুক্ত করছেন না?' প্রত্যুত্তরে তিনি স্তব্ধ হয়ে রইলেন। মনে হল, ঐ প্রশ্নে তিনি বিরক্ত।

৩রা ডিসেম্বর—অপেক্ষাকৃত নীরব ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হল রাত্রি। সকালে তাঁকে দেখে মনে হল তিনি আজ সুস্থ। প্রাতঃ-কালীন ক্রিয়াদির পর নীরদ ধরলেন ফলের রস তাঁর মুখের কাছে—সে রস পান করলেন শ্রীঅরবিন্দ। মনে হল তিনি তৃপ্ত হয়েছেন।

তাঁর শরীরের তাপ স্বাভাবিকে পরিণত, এবং আমাদের স্বস্তি এতখানি ফিরে এল যে ১১টার সময়ে শ্রীমাকে প্রণাম করে এই প্রস্তাব করতে সাহস হল—গুরুদেবের অবস্থার যখন নিশ্চিত উন্নতি হয়েছে তখন সেই সন্ধ্যায়ই আমি কলকাতায় ফিরে যেতে পারি। শুনেই শ্রীমা নীরব—মুখ গম্ভীর। তাঁর তখনকার সেই চোখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে উঠল আমার অন্তর—একটা বেদনার অনুভূতি তীব্র

হল। আমি চলে যাই, এ কি তাঁর ইচ্ছা নয়? তাঁর পক্ষ থেকে প্রত্যাবর্তনের আদেশের অপেক্ষা না করে কেন আমি নিজে থেকেই প্রস্তাব করলাম চলে যাবার? মনের ভিতরে কেবলই মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল, কেন? কেন? গভীর ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললাম তখনই, 'মা, আমি না হয় আর ক'দিন থেকেই যাব।' শ্রীমায়ের গম্ভীর মুখখানি দীপ্ত হয়ে উঠল হাসিতে। তিনি সম্মতি দিলেন।

বিকেলে দ্রুত পট পরিবর্তন, দেহের তাপ বেড়েছে ১০১° ডিগ্রীতে। শ্বাস-প্রশ্বাসের রীতিমত কষ্ট দেখা দিল। ৪টার সময়ে শ্রীমা ঘরে প্রবেশ করে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন সব। সমস্ত অপরাহ্ণ ভরে তাঁকে জল অথবা ফলের রস খাওয়াবার জন্য আমাদের বেগ পেতে হচ্ছিল রীতিমত, আমরা শরণাপন্ন হলাম শ্রীমায়ের। শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের মুখের কাছে ধরলেন চামচটি। সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব তাকালেন দীর্ঘায়িত দৃষ্টি মেলে, কয়েক চুমুক গ্রহণ করেই আবার ডুবে গেলেন নীরবতায়।

শ্রীমা আমাদের সকলকে নিয়ে এলেন পাশের ঘরে এবং আমাদের কাছে এই প্রথমবার ঘোষণা করলেন, 'ভিতরে ভিতরে শ্রীঅরবিন্দ সম্পূর্ণ সজ্ঞান কিন্তু নিজের সম্বন্ধে ভাবনা শিথিল করে দিয়েছেন।' আমরা তাঁর কথার অর্থ সামান্যই ধরতে পারলাম। তাঁকে প্রশ্ন করতে সাহস হল না আর।

আশু ফলপ্রদ কোন চিকিৎসার আয়োজন করা যাচ্ছে না দেখে সত্য চঞ্চল হয়ে উঠল। শ্রীমা শুধু বললেন, সমস্তই নির্ভর করছে শ্রীঅরবিন্দের উপর।

দিন নিভে গেল। বাইরের অন্ধকার আবৃত করল আমাদের। হৃদয়ও ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠল আঁধার ভারাতুর। কখনও নীরদ কখনও চম্পকলাল শ্রীঅরবিন্দের মুখের কাছে ধরতে লাগলেন পানীয়। তিনি নিজেও চেয়ে নিতে লাগলেন তাঁর ইচ্ছামত টমেটো

কি কমলালেবুর রস বা অন্য কোন পানীয়। তার পরমুহূর্তেই আবার স্তব্ধ, সমাহিত, এমনই চলতে লাগল।

কোন সময়েই তিনি বলতেন না বা বুঝতে দিতেন না যে তিনি অসুবিধা বোধ করছেন অথবা তৃষ্ণার্ত, কিন্তু যদি আমরা তাঁর পাশ বদলে দিতাম অথবা যদি মুখের কাছে ধরতাম পানীয় তিনি তা গ্রহণ করতেন হাসির শুভ্র কিরণ ছড়িয়ে।

শ্রীমাও যে নিয়মে আসবেন সেই রকম এলেন রাত ১১টায়। শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দকে পানীয় দিতে উদ্যত হলে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন তিনি, এবং বাধ্য ছেলের মত এক গ্লাস ফলের রস পান করেই বিশ্রামের কোলে আশ্রয় নিলেন।

বাড়তে লাগল উত্তরোত্তর উদ্বেলিত দুর্ভাবনা। হ্রাস পাবার কোনই লক্ষণ নেই। শ্রীমা আমাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না কেন শ্রীঅরবিন্দের আর নিজের উপর আকর্ষণ নেই।'

আগামীকাল থেকে intravenous চিকিৎসার কথা বলাতেই শ্রীমা, এই অবস্থায়, শ্রীঅরবিন্দকে বিরক্ত করতে নিষেধ করলেন।

পার হয়ে গেল সেই দীর্ঘ দুর্বিষহ রাত্রিটি। নীরদ ও চম্পকলালের সজাগ দৃষ্টি সর্বক্ষণ শ্রীঅরবিন্দের দিকে। ঠোঁট নড়ে উঠল একবার, মনে হল তিনি কিছু খেতে চাইছেন, হাত নড়ে উঠলে মনে হতো তিনি রুমাল চাইছেন। সেবার জন্য সেখানে ছিলেন যাঁরা তাঁদের সাধনা গুরুদেবের অতন্দ্র সেবা, কারণ তাঁদের জীবন গুরুচরণে উৎসর্গীকৃত। মনে পড়ে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একদিন বলেছিলেন, তাঁর সাধনার সেই প্রথম দিনগুলির কথা—তিনি সমস্ত রাত্রি বসে কাটাতেন। চম্পকলাল তখন বালক মাত্র, নীচের সিঁড়ির পৈঠায় শুয়ে থাকত, কি জানি কখন গুরুর কি হুকুম হয়। একবার আমি বলেছিলাম যে প্রয়োজন হলে নীরদ ওষুধ বদলে দেবে। তিনি পরিহাস করেছিলেন,—'নীরদ আমার ডাক্তারই নয়।'

মূত্র প্রবাহের উপর আমাদের লক্ষ্য অবিচল, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তার গতি ঠিকই ছিল। নীরদ বসে অরবিন্দের পাশে—কোন রকম অসুবিধা বা গোলমাল বুঝলে আমাকে খবর দেবে।

ডিসেম্বর ৪ঠা—উষাকালে তাঁর গায়ের উত্তাপ নেমে এল ৯৯° ডিগ্রীতে আর শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। মনে হল শ্রীঅরবিন্দ উৎফুল্ল, সাড়া দিচ্ছিলেন আমাদের কথায়। প্রাতঃকৃত্যাদির শেষে প্রতিদিনকার মত আজও তাঁকে বসিয়ে দিলাম বিছানায়: শ্রীঅরবিন্দ বসে আছেন—কি মহিমময় কি শান্ত স্থির মূর্তি! প্রায় ৯টার সময়ে শ্রীমা এসে তাঁকে কিছু প্রাতঃরাশ করালেন। পাশের ঘরে আমরা পরামর্শ করবার জন্য চলেছি—যেতে যেতে আমি শ্রীমায়ের দিকে চেয়ে হেসে বললাম, গুরুদেব যেন আবার আনন্দময় হয়ে উঠেছেন এবং বাইরের দিকে মনোযোগ দিতে পারছেন। শ্রীমা আমাকে নীরব হতে বলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আমি বিছানার ধারে বসে গুরুদেবের দেহে হাত বুলিয়ে দিতে থাকি, নীরদ চম্পকলাল সেবার কাজে ব্যস্ত। একটু পরে শ্রীঅরবিন্দ তাকালেন দীর্ঘায়ত চক্ষু মেলে, তারপর তিনি জানতে চাইলেন ক'টা বেজেছে। আমি বললাম, 'দশটা'।

মনে হল তিনি যেন কথা বলবার জন্য আগ্রহী, তাই সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেমন বোধ করছেন?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'আরামে আছি।'

একটু নীরবতার পর তিনি একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তারপর প্রশ্ন করলেন, 'বাংলাদেশের কি অবস্থা, বিশেষ করে বাস্তুহারাদের?' আমি তাদের দুরবস্থার বর্ণনা দিলাম, এবং প্রার্থনা জানালাম, নিশ্চয়ই ভগবান তাদের সাহায্য করতে পারেন।

প্রত্যুত্তরে গুরুদেব শুধু বললেন, 'হ্যাঁ, যদি বাংলাদেশ ভগবানকে চায়।' তারপর আবার চক্ষু মুদ্রিত করে সমাধিস্থ।

কিন্তু হায়, সে শুধুই ক্ষণিকের একটু বিরাম—আর মিথ্যা আশা।

দুপুর থেকে বাড়তে বাড়তে ক্রমশঃ শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয়ে উঠল গুরুতর। দেহের তাপ উঠল ১০২° ডিগ্রীতে। এই সময়ে মুখমণ্ডলেও প্রকট হয়ে উঠল ক্লেশের চিহ্ন। তবুও কথা নেই, প্রতিবাদ নেই।

প্রায় ১টার সময় শ্রীমা এলেন। কিছুক্ষণ অরবিন্দের দিকে তাকিয়ে রইলেন স্তব্ধভাবে। তারপর আস্তে আস্তে চললেন পাশের ঘরে আমাকে নিয়ে এবং বললেন, 'তিনি চলে যাচ্ছেন।'

দৃশ্যতঃ তিনি অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছেন মনে হলেও যখনি তাঁকে কোন পানীয় দিতে যাওয়া হতো তিনি জেগে উঠতেন, কয়েক চুমুক পান করে রুমাল দিয়ে নিজের মুখখানা মুছে ফেলতেন। আমাদের সকলের বোধে এইটিই জাগ্রত হয়েছিল, যখন তাঁর অবস্থা প্রায় স্বাভাবিক থাকত তখনি চেতনার আবির্ভাব হতো বাইরে থেকে, এবং শরীর জড়সড় হলে ক্লেশে অবসন্ন হয়ে পড়লে তাঁকে পাওয়া যেত না—তিনি কোথায় চলে গিয়েছেন।

বেলা ৫টার কাছাকাছি আবার তাঁর মধ্যে উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল। সকল বিষয়ে পূর্ণভাবে সাড়া দিচ্ছেন। তাঁকে বিছানার বাইরে নিয়ে এলাম—তিনি হেঁটে এসে বিশ্রামের জন্য আরাম কেদারায় আশ্রয় নিলেন। ক্ষণকালের জন্য মনে হল তিনি ভিন্ন এক ব্যক্তি। তিনি বসে আছেন—নিমীলিত নেত্র, শান্ত, সমাহিত, অপার্থিব চেতনার দ্যুতি বিকীর্ণ করে—দেহের গঠনে কি মহিমময় সৌন্দর্য; সেই শান্ত, অপার্থিব মূর্তি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল বৈদিক ঋষিদের। কিন্তু হায়, এ জিনিস স্থায়ী হল না বেশীক্ষণ। প্রায় এক ঘণ্টা পর তাঁর মধ্যে ফুটে উঠল অস্থিরতার লক্ষণ। চাইলেন শয্যায় ফিরে যেতে। নিঃশ্বাসের কষ্ট দেখা দিল যেন দ্বিগুণ হয়ে। প্রস্রাবের যে গতি কয়েকদিন খুবই ভাল ছিল, দুপুরবেলা থেকে বিশেষভাবে তা কমে আসতে লাগল এবং ক্লেশ প্রবল হয়ে উঠল। যদিও মনে হল তিনি অচেতন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কারণ

ওরই মধ্যে তিনি কয়েকবার চম্পকলালকে টেনে নিলেন কাছে, আলিঙ্গন করলেন এবং গভীর স্নেহে চুম্বন করলেন তাকে। শুধু তাকেই নয়, নীরদকে এবং আমাকেও সেই অপার্থিব অনুকম্পাভরা আলিঙ্গন দান করে ধন্য করলেন। এই প্রথম চোখে পড়ল তাঁর বাহ্যিক আচরণে এই গভীর হৃদয়াবেগ। অথচ সমস্ত দিন তিনি একবিন্দু জলস্পর্শ করেন নি।

খেলার মাঠে নিত্যকার কার্যবিধি সাঙ্গ করে ফিরে এলেন শ্রীমা। প্রতিদিনকার মত আজও তিনি মালাখানি রাখলেন শ্রীঅরবিন্দের বিছানার ধারে। স্থির প্রেক্ষণে দেখতে লাগলেন শ্রীঅরবিন্দকে। শ্রীমার দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠায় ভরে উঠল আমার মন। সে বয়ানে এক অদ্ভুত নীরবতা ও গাম্ভীর্য। আস্তে আস্তে বেরিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে নীরবে শ্রীমায়ের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু পরে শ্রীমা এলেন। আমি তাঁকে পূর্ণ বিবরণ দিয়ে জানাই, সত্য তাঁকে গ্লুকোজ দিয়েছে, এখন আমরা intravenous infusion ইত্যাদি দেবার ব্যবস্থা করি। তিনি স্থির, শান্ত ও অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'আমি তো বলেছি তার প্রয়োজন নেই। তিনি নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন মর্ত্যকায়া থেকে।'

শ্রীঅরবিন্দের বিছানার ধার ঘিরে বসলাম আমরা যারা তাঁর সেবায় নিযুক্ত। মনের মধ্যে কেবলই তোলপাড় করতে লাগল। কেন, কেন তাঁর নিজের প্রতি আর আকর্ষণ নেই? তিনি ইচ্ছা করলে, পূর্বে বহুবার যেমন করেছেন, এবারও তেমনি করে তো নিজেকে রোগমুক্ত করতে পারতেন। এমন তো নীরদ কত দেখেছে তিনি অন্যদের রোগমুক্ত করেছেন, কিন্তু এই এক সঙ্কটমুহূর্তে নিজের সম্পর্কে কোন আকর্ষণই রাখলেন না। তিনি কি সত্যই আত্মত্যাগ করতে চলেছেন?

রাত এগারটার সময়ে শ্রীমা এলেন। অরবিন্দকে আধ-কাপ টমেটোর রস পান করালেন, সে এক অপরূপ দৃশ্য! যে দেহ এতক্ষণ

যন্ত্রণাহত, কথায় সাড়া নেই, নিঃশ্বাসের জন্য প্রাণপাত কষ্ট—সমস্ত যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেল। দেহে হল চেতনার অভ্যুদয়, শ্রীঅরবিন্দ হলেন সুপ্তোত্থিত, জাগ্রত, সুস্থ। তিনি রস পান শেষ করলেন। পরমুহূর্তেই তাঁর চেতনা কোথায় কোন শূন্যে মিলিয়ে গেল। দেহে সেই যন্ত্রণা প্রকট হল পুনর্বার।

অর্ধরাত্রে শ্রীমা আবার এসে প্রবেশ করলেন ঘরের ভিতরে। দৃষ্টিপাত করলেন গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে। মনে হল উভয়ে নীরবে তাঁদের চিন্তা বিনিময় করলেন। তারপরই তিনি চলে গেলেন।

ডিসেম্বর পাঁচ। রাত্রি একটা। শ্রীমা পুনরায় প্রবেশ করলেন। প্রভুর বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে স্থির প্রেক্ষণে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে। শ্রীমার দিকে তাকাই, তাঁর মুখে নেই উদ্বেগ, নেই ক্লিষ্টতার লেশ, সর্ব ভয় ও অনুভব বর্জিত। সে মুখ যেন ব্যঞ্জনাহীন। চোখের ইশারায় শ্রীমা আমাকে পাশের ঘরে যাবার আদেশ করলেন। সেখানে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি বল, আমি কি ঘণ্টাখানেকের জন্য নির্জনে অবস্থান করতে পারি?' এ মুহূর্তটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ: শ্রীমা নির্জন বাসে চলেছেন, চেতনা তাঁর দেহ ছেড়ে যাবে, কেউ তাঁর ঘরে তখন প্রবেশ করতে পারবে না, কেউ পারবে না তাঁকে ডাকতে। তাঁর এই আদেশ পালন করতেই হবে। আমি অস্ফুটকণ্ঠে বললাম, 'মাগো, এ সব আমার মনের ধারণার বাইরে।' তিনি শুধু বললেন, 'সময় হলে আমাকে ডেকো।'

গুরুদেবের পিছনে দাঁড়িয়ে আমি আঙুল দিয়ে তাঁর কেশের মধ্যে চিরুণীর মত বুলিয়ে দিয়ে চলেছি। তিনি বরাবরই এতে আরাম পেতেন এবং পছন্দও করতেন। নীরদ ও চম্পকলাল বিছানার ধারে বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। আমাদের সকলের অপলক দৃষ্টি তাঁর উপরই ন্যস্ত। আর তো তখন আমাদের কারো কাছে অজানা ছিল না যে-কোন ঘটনা যে-কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে। শুধু অলৌকিক কিছুই বাঁচাতে পারে আমাদের ও পৃথিবীকে। এ সময়

অতি ক্ষীণভাবে আমার প্রতীয়মান্ হল যেন তাঁর দেহ একটুখানি কেঁপে উঠল। তিনি একবার হাত দুখানি তুললেন উপরে, তারপর বুকের উপর ন্যস্ত করলেন দুখানি হাতের অঙ্গুলিগুলি পরস্পরের মধ্যে জড়িয়ে—তারপর—তারপরই—স্তব্ধ হয়ে গেল সব।

মৃত্যু···নিষ্ঠুর মৃত্যু···বহুদিন ধরে অপেক্ষা করেছিল···আমরা আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার উপরে রেখেছিলাম, সে আজ আমাদের গুরুদেব, প্রভুর উপর নেমে এল। তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ। নীরদকে বললাম শ্রীমাকে খবর দেবার জন্য। ঘড়িতে তখন রাত্রি একটা কুড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করলেন শ্রীমা। শ্রীঅরবিন্দের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মাথার চুল অবিন্যস্ত, স্কন্ধময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এত অন্তর্ভেদী তাঁর দৃষ্টি যে সেদিকে তাকাতে পারছিলাম না। শ্রীঅরবিন্দের স্পন্দনহীন কায়ার দিকে সেই দৃষ্টি মেলে শ্রীমা দাঁড়িয়ে। একটা ছাব্বিশ মিনিটে আমি পরীক্ষা করে দেখে জানাই সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

আর থাকতে পারলেন না চম্পকলাল, শ্রীমায়ের কাছে কেঁদে পড়লেন, 'মা, মা, তুমি বল ডাক্তার সান্যাল ঠিক কথা বলে নি। আমাদের প্রভু আমাদের ছেড়ে চলে যান নি' শ্রীমা একবার তাকালেন চম্পকলালের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে যাদুমন্ত্র বলে শান্ত হয়ে গেলেন শোকে মুহ্যমান চম্পকলাল। আরও কিছুক্ষণ শ্রীমা সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমার হাত তখনও শ্রীঅরবিন্দের কপালে ন্যস্ত। মহানির্বাণ হল আমার গুরুর, ঋষি শ্রীঅরবিন্দের—নব-সৃষ্টির অগ্রদূত, নূতন ঊষার অবতার—শ্রীঅরবিন্দ এখন মর্ত্যের অতীত। কয়েক মুহূর্ত পূর্বেও আশা করেছি ঘটবে, একটা অলৌকিক কিছু ঘটবে। শ্রীঅরবিন্দ আর নেই, তিনি ছিলেন, এখন তিনি ইতিহাসে। তড়িৎবেগে আমার মস্তিষ্কে ঘুরতে লাগল কত সব চিন্তা। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম—হাজার হাজার লোক তাঁর বিছানার ধার দিয়ে যেতে যেতে

অনুচ্চকণ্ঠে বলছে, শ্রীঅরবিন্দ এইখানে থাকতেন। কিন্তু তা তো হতে পারে না, আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছি, আমার হাত স্পর্শ করে আছে তাঁকে, আমি দেখতে পাচ্ছি তিনি নিশ্বাস ফেলছেন, হ্যাঁ, প্রতিটি গতি—কিন্তু এখন সবই নিশ্চল—আমি ভাবতে পারি না আর! একটা শাণিত বেদনা ভেদ করে গেল আমার মস্তক। শ্রীমায়ের দিকে তাকাই। ধীরে ধীরে কাছে এসে তিনি স্পর্শ করলেন আমার শির —সঙ্গে সঙ্গে আমার চিন্তা স্তব্ধ, মন শান্ত, বেদনা অন্তর্হিত—আবার আসে সহজ অবস্থা। শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের কর্তব্য কি এখন? এখন তো আমাদের অবশিষ্ট কাজগুলি সম্পন্ন করতে হবে। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'তাঁর সমাধি হবে 'সার্ভিস' বৃক্ষের নীচে যেখানে বিশাল 'Maiden hair' গাছের চারাগুলি সাজিয়ে রাখা হয়েছে।' আগে থেকেই যে ঐ জায়গাটি চিহ্নিত হয়ে আছে, ভগবানের কাজ এমনই।

শ্রীমা আমাকে বলে দিলেন কি কি অনুষ্ঠান পালন করতে হবে। এখন একজন ফরাসী ডাক্তার মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেবেন। তারপর কেবল আশ্রমবাসীদের ও সর্ব সাধারণকে খবর দিতে হবে। ডাকা হল নলিনী গুপ্ত এবং অমৃতকে—তাঁরা এসে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। গুরুদেবের পায়ের কাছে পবিত্র—তাঁর দুই কপোল বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত।

আমরা গুরুদেবকে সাজানোর উদ্যোগ করতে লাগলাম। আমার অনুরোধে শ্রীমা রাজী হলেন আশ্রমের ফটোগ্রাফার (সাধক)-দের ডাকা হবে শেষ ছবি তুলবার জন্য।

হাসপাতালের ডাক্তার সুন্দরন এসে গুরুদেবের দেহ দেখলেন এবং তিনি আর আমি সই করলাম মৃত্যু-পরোয়ানায়।

এইবার আশ্রম-সাধকদের খবর দেবার পালা। উষার উদয়ে পূর্বাকাশ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে—দিগ্‌বলয়ে দেখা দিল একটি আলোর শিখা। আমি প্রধান আশ্রম ত্যাগ করি নিঃশব্দে, অগোচরে।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গোলকুণ্ডায় আমার ঘরের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দেখি—আশ্রমবাসীরা নীরবে ধাবমান আশ্রমের দিকে। শ্রীঅরবিন্দ বিদায় নিলেন—কি বেদনা, কি যন্ত্রণা আমার হৃদয় ভরে! আকাশের দিকে তাকাই—আহা, কি দেখছি, ঐ তো শ্রীঅরবিন্দ পুনরাবির্ভূত হয়েছেন—চিরন্তন সূর্য জ্বলে উঠেছেন কোটি আলোর জ্যোতিরেখা নিয়ে!

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের স্রোতও বাড়তে লাগল। চলেছে সব শান্ত স্থিরচিত্তে মহান ঋষির শেষ দর্শনের জন্য। অপরাহ্নে আবার সেই ঘরে প্রবেশ করি যেখানে বিরাজ করছেন গুরুদেব এক প্রশান্ত রাজেশ্বর মূর্তিতে। অবিরাম জনস্রোত—সাধারণ থেকে যাজক, ডাক্তার, আইনজীবি, ধনী, নির্ধন নির্বিশেষে সবাই নীরব এক অনুপ্রেরণা নিয়ে মহান ঋষিকে পরিক্রমণ করে নিতে লাগল। গোধূলিতে আশ্রমের প্রধান ফটক বন্ধ করে দেওয়া হল। শ্রীমা আমাকে আশীর্বাদ করে আসতে বললেন পরদিন প্রত্যূষে। চম্পকলাল এবং নীরদ নিযুক্ত রইলেন পর্যবেক্ষণে দিনরাত ধরে।

ডিসেম্বর ছয়। প্রত্যূষের পূর্বেই আমি শ্রীঅরবিন্দের ঘরে প্রবেশ করি। শ্রীমা ও আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি, কি অপূর্ব সে দৃশ্য! গুরুদেবের কায়া এক তপ্তকাঞ্চন বর্ণ ধারণ করেছে। আমার ডাক্তারী বিদ্যায় অর্জিত মৃত্যুর কোন চিহ্নমাত্র খুঁজে পেলাম না সেই দিব্য দেহে। একটু বিবর্ণ হওয়া বা দেহ নষ্ট হয়ে যাবার কোন লক্ষণ নেই। শ্রীমা চুপি চুপি বললেন, 'অতিমানসিক আলো নিভে না যাওয়া পর্যন্ত শরীর নষ্ট হবার কোন লক্ষণ দেখা যাবে না। দু-একদিন অথবা আরো বেশী দিন এইভাবে থাকতে পারে।' আমি একান্তে বললাম, 'আপনি বলছেন বটে, কিন্তু কোথায় সে আলো—আমি কি দেখতে পাই না?' আমি তখন শ্রীঅরবিন্দের বিছানার কাছে হাঁটু গেড়ে শ্রীমায়ের পায়ের কাছে বসেছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে অসীম অনুকম্পা মাখানো তাঁর হাতখানি আমার মাথায় রাখলেন। আর

অমনি উদ্ভাসিত হল তাঁকে ঘিরে রয়েছে যে নীলাভ সোনালী আলোর আবরণ।

প্রভাত উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল জনস্রোত—চলেছে সারি বেঁধে, স্বর্গ-দেবতাকে শেষবারের মত দেখে নেবে। (শ্রীমা আমাকে বললেন, 'পৃথিবী জানল না কি চরম ত্যাগ স্বীকার করলেন তিনি তার জন্য। এক বৎসর পূর্বে নানা আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমি অনুভব করছি যেন আমার দেহ ছেড়ে যাবার সময় এসেছে। তিনি দৃঢ়স্বরে বলেছিলেন—না, সে হতে পারে না। রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন হলে তিনিই চলে যাবেন কিন্তু অতিমানসের অবতরণ ও রূপান্তরের জন্য যোগ পূর্ণ করতে হবে আমাকেই।')

সেই রাত্রি পার হল। শ্রীঅরবিন্দের তিরোভাবের তৃতীয় দিন উপস্থিত। শ্রীমা এবং আমি তাঁর দেহ লক্ষ্য করলাম। তখনও দেহ বিকৃত হবার কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। ফরাসী ডাক্তার আমাদের সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করলেন রাজ্যের নিয়মানুযায়ী।

শ্রীমায়ের ঘরে বসে আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করছিলাম—আমার নিজের নির্বুদ্ধিতাই বলতে হবে—তাঁর ক্ষীণ শরীর নিয়ে অনেক পরিশ্রম করছেন তাই স্মরণ করিয়ে তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করাতে তিনি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে, 'তুমি কি মনে কর যে আমার সকল শক্তিই নির্ভর করছে ঐ সামান্য আহারের উপর? নিশ্চয়ই না, দরকার হলে, সমগ্র বিশ্ব থেকেই অনন্ত শক্তি সংগ্রহ করা যায়।' তিনি আবার বললেন, 'বর্তমানে আমার দেহত্যাগ করবার ইচ্ছে নেই। এখনও আমার অনেক কিছু করবার আছে। আমার দিক থেকে এটি আমার কাছে কিছুই না। আমি সব সময়েই শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে।'

শ্রীঅরবিন্দের হঠাৎ আত্মবিসর্জনের সিদ্ধান্ত আমাদের সকলকেই অন্তর থেকে নাড়া দিয়ে গেল। এ কি তাঁর পিছিয়ে যাওয়া? না,

পৃথিবীর জন্য কোন কিছু অর্জন করবেন বলেই কি এই উপায় অবলম্বন? কে উত্তর দিতে পারে?

নিজেদের সীমিত মনের যুক্তি আশ্রয় করে আমরা যা-ই বলতে চেষ্টা করি না কেন, তা হবে আংশিক সত্য অথবা ব্যত্যয়। আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তাঁর উপর চরম বিশ্বাস রাখা কারণ অনেক যুদ্ধেই দেখা যায় আপাত পরাজয় হলেও শেষ বিজয় অনিবার্য। কোন সন্দেহ নেই, শ্রীঅরবিন্দ নিজেকে আমাদের পার্থিব দৃষ্টির বাইরে নিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু শ্রীমা মহাশক্তিরূপে মানবের পক্ষ হয়ে অবিচলিত যুদ্ধ করে চলেছেন।

বিবাদে, অবিশ্বাসে, ঘৃণায় এবং লোভে বিধ্বস্ত পৃথিবী যখন হতাশে নুয়ে পড়বার মত, সে মানবের উন্নতির, তার রূপান্তরের জন্য—বিধাতার নির্দেশের অপেক্ষা করে আকাশে তার কোন রেখা পড়েছে কিনা সেদিকে তাকিয়ে আছে—আর তখনই শ্রীমা মহা আশার বাণী সম্মুখে তুলে ধরেছেন।

৭ই সন্ধ্যায় আমি শ্রীমায়ের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করলাম। আবার শেষ দেখলাম গুরুদেবের আলোকোজ্জ্বল দেহ, ভগবান মরদেহে বিরাজমান—সুন্দর, শান্ত—তখনও দেহ অবিকৃত। আমি সরলভাবে শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি আমার চিরাচরিত উপায়ে গুরুদেবকে চিকিৎসা করতে পারলাম না কেন, কেন তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হল আর কেনই-বা ডেকে আনা হল আমাকে?'

শ্রীমা সান্ত্বনা দিয়ে আমাকে বললেন, 'তোমাকেই আমরা সবাই এখানে চেয়েছিলাম—চিকিৎসা করবার জন্য নয়।'

শ্রীমা তিনবার আমাকে আশীর্বাদ করলেন। আমার সকল দুঃখ, নৈরাশ্য, সন্দেহ ঘুচে গেল, হৃদয় আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমি নত হয়ে প্রণাম করলাম তাঁর চরণে এবং উঠে যখন দৃষ্টি ফেরালাম তাঁর দিকে, দেখলাম ভগবতী জননী, মহালক্ষ্মী আমার দিকে চেয়ে হাসছেন।

ডাঃ প্রভাত সান্ন্যাল লিখিত "Call From Pondicherry"-র অনুবাদ করেছেন নিখিলকান্ত গুপ্ত।